বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

পত্রিকা

বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

চতুস্ত্রিংশ খণ্ড	শীত সংখ্যা	পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

সম্পাদক
মনসুর মুসা

সহযোগী সম্পাদক
প্রদীপ রায়

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	জনাব একরাম আহমেদ
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মনসুর মুসা
সহযোগী সম্পাদক	:	অধ্যাপক প্রদীপ রায়
সদস্য	:	অধ্যাপক মুফাখখারুল ইসলাম
		অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল
		অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান
		অধ্যাপক আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
		অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Monsur Musa, published by Professor AKM Golam Rabbani, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9576391

সূচিপত্র

রবীন্দ্র-মননে উপনিষদ ও উপনিবেশ
বেগম আকতার কামাল ১৪৭

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার দর্শনে দেহ সম্পর্কিত ধারণার নির্মাণ
মো. জহির রায়হান ১৫৭

আহসান হাবীবের কবিতা : শব্দানুষঙ্গ
মোহাম্মদ রেজাউল করিম তালুকদার ১৮১

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে রাজনৈতিক মিথ হিসেবে 'সোনার বাংলা'র ভূমিকা
মামুন আল মোস্তফা ১৯৫

শঙ্খ : পুরাণে ও সাহিত্যে
ময়না তালুকদার ২১১

***সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে বাংলার সমাজজীবন**
সাহিনা আক্তার ২২৫

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: একটি পর্যালোচনা
মোহাঃ ইমরান কবির ২৩৫

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষা
সাইফিন রুবাইয়াত ২৫৩

বৌদ্ধ জাতকের আলোকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণ
মৈত্রী তালুকদার ২৭৩

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

আবুল বারকাত, *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*
সুভাস কুমার সেনগুপ্ত ২৯৭

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

রবীন্দ্র-মননে উপনিষদ ও উপনিবেশ

বেগম আকতার কামাল*

সারসংক্ষেপ

বাল্যকাল অতিক্রমের সাথে সাথেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উপনিষদের দীক্ষা নিয়েছিলেন। বিশেষ করে উপনিষদের ব্রহ্ম ধারণাটি তাঁকে প্রাণিত করেছে যা কালের ও অভিজ্ঞতার ধারায় মানবব্রহ্মে রূপান্বিত হয়েছে। এছাড়া উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্রকে তিনি কাব্যজীবনের শুরুতেই আত্মস্থ করেছিলেন এবং ১৯১৪-এর পরে বলাকা-পর্বে এসে মন্ত্রটিকে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। উপনিষদের এইসব মন্ত্র ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হলেও রবীন্দ্রমননে যে বাস্তবজীবন সৌন্দর্যই বেশি সক্রিয় ছিল তা তাঁর সৃষ্টি কর্মেই প্রকাশিত। ব্রিটিশ উপনিবেশে জন্মালেও ক্রমে তিনি আত্মতাবোধে ও স্বাধীনতার অনুভূতিতে প্রগাঢ় হয়ে উঠেন। যুক্তি ও মুক্তি যেমন তাঁর আধেয় ছিল তেমনি প্রেম ও আনন্দাশ্রয়ী হয়ে রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করে গিয়েছেন উপনিবেশের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। এদিক থেকে তিনি ছিলেন অনন্য সত্তাই শুধু নয়, নতুন ভাবদর্শনের প্রবক্তাও। আলোচ্য প্রবন্ধে উপনিবেশের প্রভাব অতিক্রমের দিকটিকেই তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

প্রকৃতির সন্তান মানুষ প্রথমে যখন খাদ্য আহরণ ও পরে মৃগয়াযুগে বন-অরণ্যে উদরান্ন সংগ্রহের প্রথম পর্যায় অতিক্রম করে ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত হলো তখনই তার স্তোত্র বন্দনাগীত ও নানা পার্বণ কৃত্যের পর্ব শুরু হলো। বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অতিশক্তি ভেবে নিয়ে তখন তাতে প্রাণ ও দেবত্ব আরোপ করতে থাকে। প্রাচীন ঋগ্বেদের প্রকৃতি-বন্দনা তারই প্রসূন। মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি হচ্ছে প্রকৃতিকে জয় করা ও আত্মপ্রসারণের জন্যে দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়া। সেটা হতে পারে ভূমির জন্যে, হতে পারে শস্যসম্পদ ও নারী আহরণের জন্যে। এই পর্যায়েই আত্মপ্রসারণের বাণী উদ্‌গীত হলো *উপনিষদে* চরৈবেতি-চরৈবেতি-চল চল। একটি ইতিহাস-সূত্র মনে রাখতে হবে যে, অনার্যদের পরাজিত করে বৈদিক শক্তি যখন তাদের বশ্যতা স্বীকার করাতে বা আত্তীকরণ রতে লাগল তখন অনার্যদের আচার-বিধির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে বৈদিক দেবমূর্তির চিত্রায়ণও বদলে যেতে থাকে, যেমন বৈদিক রুদ্র ক্রমে হয়ে ওঠে কৃষিদেবতা শিব ও নানা কল্পকাহিনীর বা মিথের সঙ্গে এই দেবতা যুক্ত হতে থাকে। রবীন্দ্রচেতনায় শিব মঙ্গলময় দেবতা আর তাঁর নটরাজ মূর্তি কালের প্রতীক ও নৃত্যছন্দের অধিষ্ঠাতা—এই যে গতিপ্রাণতা আর নৃত্যছন্দ তা গুণান্বিত হতে থাকে সৃষ্টি রহস্যের ধারণায়, বস্তুবিশ্বের অভিজ্ঞতায় আর চেতনার সূক্ষ্মতায়। আর তার ফলেই জাগল মানুষের সৌন্দর্যবোধ। তাই আত্মসম্প্রসারণের গতিসৌন্দর্য যে সেই আদি যুগে ছিল সম্পূর্ণতই

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষিসংস্কৃতির সৃষ্টি তা ঋগ্বেদ থেকে *ব্রাহ্মণ-আরণ্যক* ও *উপনিষদকে* সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করলেই অনুভূত হয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ শতকে এসে চরৈবেতি মন্ত্র দ্বারা ভাবিত হন তখন এই প্রশ্ন উঠে যে, তিনি কি তবে কৃষি সময়ের আদি উদ্ভব যুগের গতিপ্রাণতাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন! না কি এর পেছনে প্রেরণা ছিল প্রতীচ্যের দার্শনিকদের ও বিজ্ঞানের গতি ও প্রগতির ধারণা!

ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটনকারী পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই উপনিষদ দীক্ষা পেয়েছিলেন যা আমৃত্যু তাঁকে প্রাণিত করেছে। উপনিষদের বাণী তাঁর চৈতন্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ও ক্রিয়াশীল থেকেছে, তাঁর চিত্তসংকটে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। কবি জীবনের প্রথম পর্যায়ে *মানসী* (১৮৯০) পর্যন্ত গদ্যরচনা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মন্ময় ভাবুক, আবেগের কল্পনাদীপে আলোকিত। তখনও তাঁর স্থানজগতের সঙ্গে মূল জীবনধারার মিথস্ক্রিয়া ঘটেনি। তাই মানসজগতেই ছিল যত চলাচল ও অভিসার, কখনো বা নান্দনিক প্রকৃতি-ভুবনে পরিক্রমণ। তখন কবিতায়-গানে শুধু মন্ময় আবেগ, ভাষাও নির্ভার চিত্রাত্মক উপমাধর্মী—'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে/বসন্তের বাতাসটুকুর মতো সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে- ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত'।

যখন তিনি পূর্ববঙ্গে এলেন- ১৮৯১-১৯১০—এই বিশ বছরে রবীন্দ্রনাথ ভূমি ও মৃত্তিকার বস্তুজগতের মধ্যে, জমিদারি কর্মের মধ্যে ও বিপুলা ধরণীর বুকে বিচরণের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হন। এতে তাঁর স্পেস ধারণা বসুন্ধরার অন্তঃপুর পর্যন্ত দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে, আরেক দিকে থাকে নীলাকাশ। তাঁর শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন আত্মপ্রসারণকামী ও সর্বত্র আত্মকে বিচ্ছুরিত করার ইচ্ছাবেগে তীব্রভাবে তাড়িত। আবেগশক্তি এখানে নদীপ্রবাহের মতো কখনো স্থির, কখনো অস্থির-চঞ্চল। ক্রিয়াপদের পুনঃপুনঃ প্রয়োগে তা হয়ে ওঠে খুবই উদ্বেলিত-উচ্ছ্বসিত বিলোড়িত। এই প্রসারণা-ইচ্ছা ঠিক রেনেসাঁ যুগের পৃথিবী চষে-বেড়িয়ে সম্পদ আহরণ বা অর্থ বৃদ্ধির অনুরূপ নয়। তাঁর উচ্ছ্বাসকে মনে হয় যেন *ঋগ্বেদের* স্তোত্রের অনুষঙ্গী, উপনিষদের গতিময়তায় সৌন্দর্য-চয়ন বাসনার প্রকাশক, কিন্তু তার বস্তুভূমি হচ্ছে পল্লীবাংলার কৃষিসংস্কৃতি ও ঋতু-প্রকৃতি। স্মরণযোগ্য কাব্যপঙক্তি:

আয়ি মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো, বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
শিহরিয়া, স্খলিয়া বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
সচকিয়া, আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভুলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্ত ভাগে।

('বসুন্ধরা', *সোনার তরী*)

লোকায়ত জীবন সংস্পর্শ, ফসলায়ন, নদীর প্রবাহ, ঋতুর বৈচিত্র্য—সব পরিপার্শ্ব তাঁকে স্থানজগতের বৈচিত্র্যে ও অসীমতায় বিস্তীর্ণ সত্তাময় করে তোলে। মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে এই বিস্তারণ ঋগ্বেদ-যুগের মতোই বিস্ময়মাখা, নিষ্কলুষ ও নিসর্গভূত শিল্পরচনা তথা ছন্দসুরেরও উদ্ভব ঘটে এই যুগেই যার আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে কবির শেষ পর্যায়ের কাব্য *পত্রপুট*-এ। কৃষি সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা ও মানসভুবন যে দৃষ্টি-ইন্দ্রিয়ের নিবিড়তা, সূক্ষ্মতা, অনুভূতি তীক্ষ্মতার জন্ম দেয় তার পেছনে থাকে শস্যবীজের পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত; ফসল ও ফলনক্রিয়া এবং ফসল কর্তনের পর পুনরায় বীজ থেকে আবার তার জন্ম—এই বস্তু-অভিজ্ঞাতাই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের ধারণায় নিয়ে গেছে। এই অভিজ্ঞতা মানুষকে আরও দিয়েছিল সমায়চক্রের পুনরাবর্তন বীক্ষা তথা বৃত্তাকার ধারণা। *মানসীর* পরে *সোনার তরী*, *চিত্রা*, পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এই বৃত্তাকার ধারণাই পোষণ করতেন এবং পরবর্তীকালের ঋতুবিষয়ক নাট্যগুলি, যেমন, *শারদোৎসব*, *ফাল্গুনী* ইত্যাদি রচনায়ও এই ধারণাই পল্লবিত ও রূপান্বিত হয়, শীতের পরে আসে বসন্ত, বসন্তের পরে গ্রীষ্ম প্রতিবছরেই পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, অতীতই ফিরে আসে নতুন হয়ে। কিভাবে কৃষিসংস্কৃতি এই সব বস্তুবিভাব উপনিষদের আত্মপ্রসারণের গতিসমতা ও অসীমতার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটায়!

রবীন্দ্রনাথের যে ভাবাদর্শ ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা-ধ্যান ও তার অধীত জ্ঞানের ফসল তাঁর প্রথম কাব্যিক জীবনে ফলে উঠেছিল, তা ছিল উপরিকাঠামো থেকে উৎসারিত, এ যেন পার্বত্যনির্ঝরের ভূতলে অবতরণ, যেখানে আছে লোকায়ত জীবনধারা, জনপদ, ফসলের ক্ষেত আর প্রবাহিনী নদী। এই প্রবাহ যখন ব্যক্তিচিত্তে বেগের আবেগ জাগাল ও তাতে যুক্ত হলো আত্মপ্রসারণের বাসনা, তখনই পার্বত্য নির্ঝরটি নদীস্রোত হয়ে লীন হতে চাইল সমুদ্রের সঙ্গে। এই ইমেজটি কবির চেতনায় পরমসত্তায় লীন হওয়ার আবেগ-নিবেদনকে উদ্বেলিত-উচ্ছ্রিত করেছে। আর বস্তুজগৎটি হয়ে গেছে নির্ভার কিন্তু রূপময়। এই রূপময় নির্ভারতা আর *মানসী* যুগের মন্ময়তা এক নয়। রূপময় নির্ভরতায় মিশে আছে লোকজীবনের প্রত্যহিকতাকে সংগীতে ছন্দে উত্তরণের অভিজ্ঞতা। যেমন আছে 'বৈষ্ণব কবিতা' বা 'আকাশের চাঁদ' কবিতায় যেখানে জীবনকে মধুরতায় মূল্যবহ ভাবা হয়েছে। এছাড়াও আছে বটের স্নিগ্ধ ছায়া, রাখাল, ফসলের মাঠ, বাঁশি ইত্যাদি অনুষঙ্গ। এইসব অনুষঙ্গ ও আত্মপ্রসারণ-বাসনা অব্যাহত ছিল *গীতাঞ্জলি* (১৯১০) পর্যন্ত। এসময়কার প্রেরণা ছিল একইসঙ্গে জীবনসম্পৃক্ত আর বৃহতের সাধনালগ্ন। দুইয়ের মধ্যে কবি ঐক্যবোধের সেতু গড়ে দেন যা *উপনিষদের* ভাষানুষঙ্গ থেকে অর্জিত, আহরিত। ঔপনিবেশিক পরাধীনতা আর লোকায়ত মানুষদের শোষণ-দারিদ্র-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা গ্লানিকে তিনি পদ্মার স্রোতধারায় ধুইয়ে দেন ও সৌন্দর্যময় করে তুলেন। এতে তাঁর বৃহৎ বিশ্বলোকের ভাবনাটি লাবণ্যমণ্ডিত হয়। অথচ আরেক দিকে, সৃষ্টিলীলায় কবি প্রখর ও জাগর চক্ষু মেলে পর্যবেক্ষণ করছিলেন ব্যক্তির আত্মপ্রসারণের সমাজরূপও ইতিহাসগত তাৎপর্য যেটি গোরা চরিত্রে প্রতীকায়িত। ধর্মীয় জাতপাতের সংকীর্ণতা ভেঙে গোরা সমাজগতরূপে অন্বিত হয়ে, হয়ে উঠেছিল সর্বভারতীয়, আর তার বীক্ষা যুগিয়েছিল চরঘোষপুর গ্রামের সঙ্গে গোরার সংস্পর্শ।

বস্তুত ধ্যানাদর্শ বা আদর্শ যেটাই হোক তা অবশ্যই ভূতলবাসীর জীবনাভিজ্ঞতা আর তার পরিপাঠ দিয়েই নির্মিত হয়। তাদের দৈনন্দিনতা-হৃদ্যতা-প্রাতিবেশিতা, প্রাকৃতায়নের মধ্যদিয়ে তা পরিকর্ষিত হয় এবং এর সার্থক প্রকাশ ঘটে *গল্পগুচ্ছের* প্রথম খণ্ডে।

২

উপনিষদ ও উপনিবেশ—এই দুই জগৎ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার বীজতলা, একটি পূর্বসৃষ্ট ঐতিহ্য ও ডিকশন যার প্রতিবেশে তিনি লালিত। যার নান্দনিক ব্যঞ্জনায় তিনি বিভান্বিত। উপনিষদ মন্ত্র ও অধিবিদ্যক বাণীর নান্দনিকতার সারাৎসার আত্তীকৃত করে নিয়েছিলেন *কল্পনা নৈবেদ্য* কাব্যে, ব্রহ্মসংগীত, *ভারতবর্ষ, প্রাচীন সাহিত্য,* সতেরটি *শান্তিনিকেতন* শীর্ষক গ্রন্থমালায় তপোবন-ভাবনায়, আর উপনিবেশ চেতনার প্রতিরোধাত্মক বিকল্প জগৎ তৈরি হয়েছে *সোনার তরী, চিত্রা ক্ষণিকা, স্বদেশী সমাজ* প্রবন্ধ, স্বদেশী সংগীত, ছিন্নপত্র, ঋতু ও প্রকৃতিবিষয়ক দেশজ ফর্মের নাট্যধারায়, *রক্তকরবীতে*। তাঁর *গীতাঞ্জলি* একই সঙ্গে *উপনিষদ*-প্রাণিত ও কৃষিসংস্কৃতির লোকায়ত ঐতিহ্য-সম্ভূত সৃষ্টি। উপনিষদের প্রেরণা থেকে জন্ম নিয়েছে আত্মতার হয়ে-ওঠা ও পরমসত্তার মধ্যে লীনতার বাসনাবিদ্ধ ভাবলোক অথচ তার শিকড়টি বৃহৎ মানবজীবনের সর্বস্থলের গভীরে প্রোথিত। *ভারতবর্ষ* গ্রন্থের 'নববর্ষ' (১৩০৯) প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য[১]:

> এখানে আশ্রমের নির্জন প্রকৃতির মধ্যে শান্ত হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনই চাই, দেখি সে অক্লিষ্ট অক্লান্ত, যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে। এই নিখিল গৃহিণীর রান্নাঘর কোথায়, ঢেঁকিশালা কোথায়, কোন ভাণ্ডারের স্তরে স্তরে ইহার বিচিত্র আকারের ভাণ্ড সাজানো রহিয়াছে! ইহার দক্ষিণ হস্তের হাতাবেড়িগুলিকে আভরণ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার কাজকে লীলার মতো মনে হয়। ইহার চলাকে নৃত্য এবং চেষ্টাকে ঔদাসীন্যের মতো জ্ঞান করে। ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিয়ে গোপন করিয়া, স্থিতিকেই গতির ঊর্ধ্বে রাখিয়া প্রকৃতি আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশময় রাখিয়াছে–ঊর্ধ্বশ্বাস কর্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়মান কর্মের স্তূপে নিজেকে আছন্ন করে নাই।
>
> (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭)

তিনি অবকাশ আর ধ্রুবশান্তির আবহমণ্ডল দেখেন প্রকৃতিতে যার উৎসটি কৃষিতান্ত্রিক, কিন্তু সুর ঔপনিষদিক। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, *উপনিষদ* ও *বেদের* মতোই তৎকালীন কৃষিতান্ত্রিক লোকায়ত জীবন থেকে, যেটি ছিল অনার্য শ্রেণীর নানা উৎস-নিরুক্তি—আহরণ করে দেবভাষায় উন্নীত করেছিল। আর রবীন্দ্রনাথ লোকায়তকে নিজের সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত করে নেন, ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশ বা উপনিবেশ-প্রভু ইয়োরোপের ধনবাদী কর্মচাঞ্চল্য রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেনি। তাঁর নিজ শ্রেণীগত অবস্থান আর শিল্পসাহিত্য চর্চা ও সৃষ্টির প্রতিভা ও প্রতিবেশ—দুই-ই ছিল অবকাশধন্য—অবকাশের পটেই তো শিল্পের ভাবজগৎ গড়ে তোলা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ''ভারতবর্ষের ইতিহাস'' (১৩০৯) প্রবন্ধে রাজশক্তি ও এদেশে আসা বহিরাগত

শক্তির সংঘর্ষ-যুদ্ধঘটনার ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের আড়ালে দেখেন নিত্য প্রবহমান পল্লীর গৃহে গৃহে জন্মমৃত্যু সুখ-দুঃখের জীবনস্রোত। তাঁর প্রেক্ষণবিন্দু সর্বদা সাময়িক আপাত দৃশ্যমান বাস্তবের অন্তরালে চিরায়ত একটি নিত্য বাস্তবতার মুখচ্ছবি অবলোকন করে। আধুনিকতাবাদীদের অন্তর্বাস্তবতা উন্মোচনের কাজটি যেমন অন্তর্লোকের-চৈতন্যের-অবচেতনের অবতলে প্রেক্ষিত হয়, রবীন্দ্রনাথে তা নয়, তাঁর অন্তর্বাস্তবতা বাস্তবেরই প্রকৃত মুখ এবং তিনি সে মুখকে করে তোলেন মুখশ্রী। গ্রামবাংলা নিসর্গের অপরূপ লাবণ্য আর শান্তশ্রীতে ভরে ওঠে তাঁর কবিতা-গান ও গদ্যের ডিকশন। এই বাস্তবতা সবসময়ই অক্ষুণ্ন ও জায়মান, যদিও তা পরিবর্তনশীল কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যে প্রাণবান। এই পরিবর্তনীয় সূত্রগুলিকেই তিনি ক্ষয়িত-শোষিত পল্লীর জীবনযাত্রায় অন্বেষণ করেন। এসবের মধ্যে যথাযোগ্য প্রতীক রূপে ধারণ করেন নারী, বিশেষ করে জননীর ইমেজকে, তাই তাঁর বাস্তবতা কখনো বস্তুজগৎকে অস্বীকার করে না, আবার ভেঙেচুরে নতুনভাবে নির্মাণও করে না। বাস্তবতার এই দৃষ্টিভঙ্গি ঔপনিষদীয়, *উপনিষদ* জগৎকে অপরিবর্তনীয় রূপে ব্যাখা করে। আধা-ধনতন্ত্র ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক শাসন এবং কলকাতায় নগরায়ণ যে পরিবর্তন ঘটিয়ে চলছে তা কি গ্রামবাংলাকে প্রভাবিত করেনি! রবীন্দ্রনাথ সেই প্রভাবের ছবি এঁকেছেন *গল্পগুচ্ছের* বিভিন্ন গল্পে, যেমন পোষ্টমাস্টার, দিদি ইত্যাদি; তবুও তাঁর বক্তব্য হচ্ছে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও রয়ে যায় অশেষ, নিত্য, সত্যরূপ।

কোন অর্থে কিভাবে কবি এই উপনিবেশ বাস্তবতায় যুক্ত হয়েছিলেন! প্রথম সূত্র হচ্ছে স্বদেশপ্রাণতার আবেগে। বিশ শতকের বঙ্গীয় স্বদেশীয়ানার আবহে যা তাঁর স্বদেশী সমাজ ও স্বদেশ বিষয়ক গানগুলিতে রূপায়িত, তাই স্বদেশিয়ানা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিক নয় ভাবাদর্শভিত্তিক[২]:

> তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর, নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে। আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না—তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি।

উপনিষদের মর্মবাণী তাঁর ধ্যানীচিত্তকে যে প্রেরণা দিয়েছিল তা জীবনের অস্তিত্বময়তা ও তাতে বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা ঘনবদ্ধ করেছিল, উক্ত বৃহৎ অবিচ্ছিন্ন মানবপ্রবাহকে প্রত্যক্ষতা দিয়েছিল। এই সত্যটি তাঁর ব্রাহ্মভাবনারও মৌল যে (আকতার, *রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা*, ২০১৭) এই পৃথিবী হচ্ছে হিউম্যান ওয়ার্ল্ড এং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারণশীল। এভাবে বিশ্বকে মানবায়িত করার ক্ষেত্রে প্রতীচ্যের ভাবাদর্শ হিউমেনাইজেশনের আলোকের চেয়ে বেশি ছিল উপনিষদ-আহৃত প্রজ্ঞা।

৩

শঙ্করের মতে, *উপনিষদ* হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক, *শব্দকল্পদ্রুম* অনুসারে উপণিষৎ বেদের শিরোভাগ। চারিবেদের সর্বশুদ্ধ ১১৮০ খানি উপনিষদ আছে। (*বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ*, কলিম খান

ও রবি চক্রবর্তী, ১৪১৬) এই উপনিষদ নিয়ে প্রাচীন ঋষিরাও নানা অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে বেদ—যাকে বলা যায় সনাতন বা আদি উপনিষদ তার অনেক সূত্রকে কুক্ষিগত করেই বেদ, ব্রাহ্মণ-আরণ্যকের মধ্যে সংকলিত হয়েছে। প্রথম দিকের কয়েকটি *উপনিষদ* এই আদি সনাতন অবিভাজিত বেদের কথাগুলিকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছিল। বাংলার আদি ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আদি উপনিষদকেই মান্য করেছিলেন যেখানে সৃষ্টিকর্তাকে নির্গুণ, নিরাকার বলা হয়েছে—দেবতা নয়। রবীন্দ্রনাথও এই উপনিষদের বাণীকেই নিজের বীক্ষা ও চিন্তাদর্শনে সৃজনশীলতায় সম্পৃক্ত করে যুগোপযুগী করে গ্রহণ করেন, তার *শান্তিনিকেতন* গ্রন্থগুলি এর যথাযথ উদাহরণস্থল।

আদি উপনিষদ মতে, জগৎ মায়া নয় আর বেদ সমূহে/বেদান্তে জগৎকে মায়া বলা হয়েছে। সময়গত পার্থক্য, সমাজে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় থাকা আরণ্যক ঋষিদের অবস্থান থেকেই তাঁরা জগৎকে মায়া বলেছেন। তাঁদের জন্য ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মের একাংশ মাত্র জগতে প্রকাশিত। জগৎ ব্রহ্মের প্রস্রবণ মাত্র। ব্রহ্ম জগতের সর্বস্ব আবার তিনি জগতেরই অতীত। তাই কোনো উপলক্ষ্য স্বরূপেই জগৎকে বলা যেতে পারে (তথ্যসূত্রঃ তদেব, পৃ. ৯৬-৯৭)। বস্তুত, উপনিষদের পথরেখা রহস্যময় ও জটিল, তার যৌক্তিকতাকে প্রায়ই লঙ্ঘন করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ঔপনিষদ ব্রহ্ম* (১৩০৮) পুস্তিকায় উক্ত সনাতন আদি উপনিষৎ মন্ত্রের আলোকে আচার-প্রথাহীন ব্রহ্ম-উপাসনার ব্যাখা দেন। পুস্তকাটিতে ব্যক্ত করা হয়েছে লোকাহিতকরী সত্য ও কর্মের মেলবন্ধন এবং শব্দমন্ত্রের শক্তিময়তা, এমনকি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের কথাও বলা হয়েছে।[২] উপনিষৎ কথিত সব্বার্ন্তর্যামী ব্রহ্ম আবার বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, স্রোত্রবল, ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন।' (*ঔপনিষদিক ব্রহ্ম, অচলিত সংগ্রহ ২ রবীন্দ্র-রচনাবলী*) এই যে ইন্দ্রিয় ও বাক্য তাত বাস্তব দৃশ্যমান জগতেরই বিষয়, বিশেষ করে শব্দ-বাক্যই যে জগৎ তা ইদানীংকার প্রাচ্য তাত্ত্বিকরাও বয়ান করে থাকেন। অধিবিদ্যক শব্দবাক্য-ভাষার প্রাচীন-মধ্য-বর্তমান রূপ রয়েছে। মোটামুটিভাবে উপনিষদ ও প্রতীচ্যের অধিবিদ্যক ভাবনার মধ্যে যে সাযুজ্য আছে উভয়ের দর্শনশাস্ত্র পাঠ করলেই তা প্রতীয়মান হয়। যেমন প্লেটোর অধিবিদ্যা সহজগম্য নয় এবং জটিল, পরমসত্তার গর্ভে সবকিছু দ্রবীভূত, তাঁর মতে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা জগতের প্রকৃত সত্য বা বাস্তবকে জানতে পারি না, তা রয়েছে কেবল ঈশ্বরের প্রত্যয় বা ধারণার মধ্যে। এরিস্টটলের অধিবিদ্যা শব্দ-পদান্বয়ের ভিত্তিতে অনুভাবিত। পরবর্তী দার্শনিকরাও সেটাই ভেবেছেন। বিশ শতকে এসে এই অধিবিদ্যক শব্দ-বাক্যের বিরুদ্ধেই অভিযান চালান জাক দেরিদা। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অনেকটাই এরিস্টটলের মতো; যেখানে বলা হয়েছে আত্মাই দেহের আকার, এই আকার অর্থ গঠন নয়, আত্মাই দেহকে একটি বস্তুতে পরিণত করে, এর উদ্দেশ্যের ঐক্য আছে এবং একে আমরা জীবের (Organism) বৈশিষ্ট্য বলি, এর সঙ্গে সেই 'বস্তুর' ঐক্য আছে। চোখের উদ্দেশ্য বীক্ষণ কিন্তু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চোখ আর দেখতে পায় না, আসলে দেখে আত্মা (Bertrand Russell, *History of Western Plilosophy*) এই ধারণাই দুই-আড়াই হাজার বছর যাবৎ দার্শনিকদের

চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে আসেছে। এছাড়াও বর্তমানকালের মনোবিদ্যার রূপক-প্রতীক ভাষাও যে মানবগোষ্ঠীর ভাষার উত্তরাধিকার ও অতীত-বর্তমানযুক্ত তা অবিনির্মাণ তত্ত্বের (Deconstruction) সহায়তায় আমরা জেনেছি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্পসাহিত্য, এমনকি দৈনন্দিনতার ভাষাকেও মানুষ উক্ত দুই বিদ্যার ভাষা-প্রতীকেই ব্যক্ত করে থাকে। কেননা মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, মানুষের চেতন-অবচেতনের ভাষাকাঠামো তার নিজ গোষ্ঠীভাষা দিয়ে গঠিত, তা মানুষের চেতনের গহনে থাকে না, থাকে ভাষার কাঠামোগত রূপের মধ্যে, ফ্রয়েডীয় চেতন-প্রাক্‌চেতন তত্ত্বের বাইরে গিয়ে এই ভাষাগত মনস্তত্ত্বকেই বিশ্লেষণ করেন লাকাঁ। আদি উপনিষদে ঋষিবাক্যের অনেকস্থলে মৃগয়ার উপমা-রূপক ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর *ব্রহ্মমন্ত্র* পুস্তিকায় (১৩০৭) এই মৃগয়া কর্মের উপমান্বিত ভাষা দিয়েই ব্যাখা করেন ব্রহ্মসাধনাকে। এমনকি জীবনব্যাপী যত গদ্য তিনি লিখেছেন তার মূলশৈলীই ছিল উপমাত্মক বাক্য। যেমন[৩],...

> উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে। ...তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ করো।
>
> এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুভ্র সবল তনু আর্য্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে তখনকার সেই টঙ্কারমুখর অরণ্য-নিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা, এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে।

ভাষা ব্যবহারের মধ্যেই কবির ভাবাদর্শ লুকান থাকে। শুভ্র ধবল তনু আর্য কর্তৃক পলায়মান শিকারকে তীরবিদ্ধ করা আর 'দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে, একটি প্রবলতা আছে'—এসব বাক্যে আমাদের এদেশে তখনকার উপনিবেশায়নের প্রয়াসকেই ব্যক্ত করা হলো। তিনি দস্যু বলতে অরণ্যচারী অনার্যদের বুঝিয়েছেন—এই ভূ-ভাগের যারা আদি বাসিন্দা তাদের নিশ্চিহ্ন ও পদানত করেই প্রবলতার সঙ্গে এ দেশে আর্যীকরণ ঘটেছিল। (দ্রষ্টব *বৈদিক সভ্যতা*, ইরফান হাবিব ২০০৫) এই উপনিবেশ অবশ্য ইংরেজ উপনিবেশের মতো ছিল না, আর্যরা জয়ী হয়ে বর্ণবিভাজন ও ক্ষমতায়নকে যে ভাবে স্থায়িত্ব দিয়ে মিশে গেছে ভারতবর্ষের সমাজে তা জন্ম দিয়েছিল সামন্তবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের। আর ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতের অর্থ-উৎপাদন কাঠামোকে নিয়ে গিয়েছিল পুঁজিবাদের দিকে—শেষে যে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুত আর্যদের উপনিবেশায়ন রবীন্দ্রনাথের আর্যবন্দনায় অনুপস্থিত, অথচ তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সমালোচনা করেছেন। সচেতন ভাবেই, নিজে সামন্তবাদী আধা-পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সিস্টেমের মধ্যে জন্মলাভ করেও *গীতাঞ্জলির* অধ্যাত্ম-পরিক্রমা শেষ করে ১৯১২ সাল থেকেই তিনি ছিলেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচক। তাই ১৩০৭-০৮ এ অথবা ১৯০১-এ *নৈবেদ্য* কাব্যেও রবীন্দ্রনাথের উক্ত আর্যভাবনা ও তপোবনাদর্শ প্রাধান্য পেলেও বিশের-তিরিশের দশকে এসে তাঁর পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়া ফেরৎ রবীন্দ্রনাথ *পুনশ্চ* কাব্যের (১৯৩২) 'প্রথম পূজা' কবিতায় ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনার্য নিধনের রক্তপাতের আখ্যানকে বিশেষভাবে রূপায়িত করেন। ''লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিত পত্তন করিছিলেন কোন মান্ধাতার আমলে/ ইতিহাসের পণ্ডিত

বলেন; এ মন্দির কিরাতের জাতের গড়া। এ দেবতা কিরাতের/ একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ/ দেউলের আঙিনা পূজারিদের রক্তে গেল ভেসে/ হাজার বছরের প্রাচীন ভক্তিধারণার স্রোত গেল ফিরে।/ কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশ পথ রুদ্ধ"— এই চিন্তার পেছনে তৎকালীন রাজনীতির অস্পৃশ্য বিরোধী আন্দোলনের বাস্তবতা নিহিত। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ নিম্নবর্গের মানুষদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে, ব্রাহ্মণদের নিম্নবর্গকে বুকে টেনে নেওয়ার কল্পবাস্তবায়তায় রত থাকেন। কিন্তু নিম্নবর্গের উত্থান বা বিপ্লব নিয়ে কোনো ভাবনা ব্যক্ত করেন না, অথচ গদ্যরচনায় তাদের অর্থনৈতিক অধিকার নিয়ে গান্ধীর বিরুদ্ধে গিয়ে বলেন যে, ধর্মাধিকারের চেয়ে হরিজনদের বেশি প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার অর্থাৎ রবীন্দ্র-ভাবলোকে কাব্যিক বয়ানে উদারনৈতিক মানবতাবাদই চর্চিত হয়। নিম্নবর্ণের আত্মসম্মান, শিল্পচেতনা আর ব্রাহ্মণ কর্তৃক তাদের কাছে টেনে নেবার বিষয়টাই প্রাধান্য পায়, সামন্তবাদী রক্ষণশীলতা, পিতৃতান্ত্রিকতা ও উচ্চশ্রেণীর প্রতাপ এবং ভারতের বর্ণপ্রথা, জাতপাতের কূটত্ব, পরাধীনতা, দুর্বল চিত্তের দরিদ্র মানুষ নিয়ে তাঁর চিন্তাজগতের নানা দিশাই রয়েছে। *রক্তকরবীর* বিপ্লব ও যন্ত্রবাদ-বিরোধিতা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ মন্ত্র থেকে নেমে এসেছিলেন শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবধর্মের পরিবর্তে লোকায়ত পদগানে, আউল-বাউলদের জীবনদর্শনে ও সংগীতাত্মক সুরের জগতে। ঐতিহ্য ও দেশ-সংস্পর্শ-সম্পৃক্তি তাঁকে উচ্চমন্যতা থেকে নামিয়ে এনেছিল 'ওরা কাজ করে'র জগতে, *পলাতকার* নারীর মুক্তির পরিসরে। কিন্তু উপনিষদের প্রজ্ঞা কি একেবারে লয় পেয়েছিল? তা বোধহয় নয়, অবশ্য তিনি তাঁর ব্রহ্মবাদী ঐশী ধারণাকে উত্তীর্ণ করেছিলেন মানবব্রহ্মের মধ্যে। (আকতার, *রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা*, ২০১৭) ঔপনিবেশিক মডেলের শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে তিনি তপোবন-এর আদর্শানুগ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও তাঁর আইডিয়া ছিল বিশ্বজ্ঞান ও মানুষের মধ্যে মিলন সেতু গড়ে তোলা। এছাড়া তাঁর বাংলাভাষার উপর সংস্কৃত ও ইংরেজির আধিপত্য যাকে বলা হয়ে থাকে ভাষার উপনিবেশায়ন তার বিরুদ্ধে বাংলাভাষার মৌখিক ও প্রাকৃতায়নের রূপটিকে গুরুত্ব দিয়ে তুল ধরেন। (দ্রষ্টব্য *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, মোহাম্মদ আজম, ২০১৪)[৪] তাঁর বি-উপনিবেশনায় চিন্তা ও প্রচেষ্টাকে ব্যাখ্যা করলে আমরা দেখি যে বাস্তবতা কিভাবে ভাষাকে তৈরি করে রবীন্দ্রনাথ তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* (১৪০২) গ্রন্থে আমরা *সোনার তরী* যুগেই দেখেছি উচ্চশ্রেণীর বিশ্লেষণধর্মী ভাষার পরিবর্তে তিনি ক্রিয়াপদের তথা কর্মশীল জগৎকে বেশি ধারণ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন আরোপিত তত্ত্ব ও প্রণালী-পদ্ধতির বদলে বাংলাভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিয়েছেলেন এর আভ্যন্তর বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব রীতি প্রয়োগের জন্য।

উপনিষদ-প্রাণিত কবি জীবনের শেষ পর্যায়ে যে প্রভাতসূর্যের বন্দনা করেন, তাঁর শেষ কাব্যচতুষ্কে যে সংস্কৃতভাষার ও চেতনার চর্চা লক্ষ্য করা যায়, তা কিন্তু *শেষ লেখা* (১৯৪১) কাব্যে এসে সত্তা-অস্তিত্ব আর এক ঈশ্বরী প্রতিমার জিজ্ঞাসায় আন্দোলিত এবং উত্তরবিহীন থেকে যায় তাঁর সকল প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, আর ঔপনিবেশিক পশ্চিমি সভ্যতার উপর তো তিনি

বিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু ঔপনিষেদিক বিশ্বাসের আলোকেই শুভবাদী চৈতন্যের বিকিরণে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান না। অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক জ্ঞানবত্তা ও শ্রেণীবোধে লালিত হলেও উপনিষদের ঋষিদের প্রজ্ঞাবাণীকেও অন্তর্গ্রহণের ফলে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল তা তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন—লোকায়তিক হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় পরিশ্রুত হয়ে, চেয়েছিলেন আমাদের লোক হতে।

তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নববর্ষ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৬৭
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৫৬
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অচলিত সংগ্রহ ২', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৮৩
৪. দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ আজম, *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, অক্ষর, পৃ.২১৪

গ্রন্থপঞ্জি

১. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, অচলিত সংগ্রহ, বিশ্বভারতী ১৩৪৮
২. *পুনশ্চ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, বিশ্বভারতী
৩. *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, দর্শনচিন্তা*, সম্পাদনা: সতেন্দ্রনাথ রায়, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমেটেড, কলকাতা
৪. *রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা*, বেগম আকতার কামাল, কথাপ্রকাশ ২০১৭
৫. *The Vedic Age and the coming of iron, Irfan Habib,* অনুবাদ: কাবেরী বসু, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০৫
৬. *History of Western Philosaphy,* Bertrand Russel, London, ১৯৪৬
৭. *বাংলা ভাষায় উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, মোহাম্মদ আজম, আদর্শ, ২০১৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার দর্শনে দেহ সম্পর্কিত ধারণার নির্মাণ

মো. জহির রায়হান*

সারসংক্ষেপ

উপনিবেশপূর্ব বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ভেতর দিয়ে যে বিচিত্র দর্শন-ধারার উদ্ভব হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা দেহ। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার দর্শনে, বিশেষত প্রাচীন তন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, নাথপন্থা, সুফিমত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ও বাউল দর্শনে দেহ ধারণাটির সাংস্কৃতিক নির্মাণের স্বরূপ অন্বেষণ করা। এই ধারণাটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আত্মসত্তার নির্মাণ ও আত্মমুক্তির উপায় সম্পর্কিত বিশ্বাস। বাংলার প্রাচীন দেহাত্মবাদী মতে যেভাবে দেহকে জীবনের বৈচিত্রময় রূপের উৎসভূমি মনে করা হয়েছে তেমনি দেহের বিকাশের ভেতর দিয়েই মুক্তির শর্ত নির্মাণের কথাও বলা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে কিভাবে দেহ সম্পর্কিত বিশ্বাসের ভিন্নতা আত্মসত্তা ও আত্মমুক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস-ধারার জন্ম দিয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার ভাবুক ও দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো দেহ সম্পর্কিত ভাবনাকে তাদের বৈশ্বিক চেতনার (cosmic consciousness) ভেতর অঙ্গীকৃত করেছে এবং এই ভাবনা থেকে নিঃসৃত হয়েছে তাদের সামাজিক চেতনা। সাধক ও ভাবুকদের আত্মসত্তার ধারণা গঠনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে দেহ সম্পর্কিত বিশ্বাসের। কোনো কোনো সম্প্রদায় দেহকে গ্রহণ করেছে আত্মোপলব্ধির সোপান হিসেবে। অনার্য-অধ্যুষিত বাংলায় প্রাচীন সাংখ্য, তন্ত্র ও যোগ-ধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশি। এই সম্প্রদায়গুলোর নিকট থেকেই দেহ সম্পর্কিত ধারণার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব, নাথ-যোগী, শৈব-শাক্ত, বাউল এবং এমনকি বাংলা অঞ্চলে গড়ে ওঠা সুফি সম্প্রদায়গুলো। বিভিন্ন সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত বৈষম্য ঘোচাতে রামানন্দ, মাধব, লালন প্রমুখ সাধক চেষ্টা করেছেন দেহাশ্রয়ী পরম ভাবকে অবলম্বন করে মানবিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্যের বাইরে দেহকেন্দ্রিক ভাবনার দার্শনিক গুরুত্ব এই যে, দেহ সংক্রান্ত সত্তাদর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে সাধকের আত্মসত্তা সম্পর্কিত বিশ্বাস এবং জ্ঞান ও মূল্যচেতনা বিষয়ক তত্ত্বগুলো। উল্লেখ্য যে, উপনিবেশপূর্ব বাংলায় দার্শনিক বিশ্বাস ও তত্ত্বসমূহ প্রাত্যহিক জীবনযাপন ও চর্চার ভিত্তি হয়ে ওঠায় ধর্মের সঙ্গে এসব মত ও তত্ত্বের পার্থক্য করা যায় না। উপনিবেশপূর্ব বাংলায় ধর্ম বলতে যা বোঝানো হতো তা অনেক ক্ষেত্রে নৈতিকতার সঙ্গে অভিন্ন।[১] সমস্ত জীবনক্ষেত্রকে দেখা হতো ধর্মক্ষেত্র রূপে। সংকীর্ণ অর্থে কেবল সদাচার বা সাত্ত্বিককর্ম নয়, রাজসিক কর্মকেও ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, ফলে নৈতিকতা হয়ে উঠেছে ধর্মের অঙ্গ।[২] অন্যদিকে, যে তত্ত্ব ও

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনদৃষ্টিকে আমরা দর্শন হিসেবে অভিহিত করছি, বাংলা অঞ্চলে তাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে ধর্ম হিসেবে। প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার প্রধান দার্শনিক ধারাগুলোর মধ্যে রয়েছে তন্ত্র, বেদান্ত, বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথ, সুফি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বাউল। এই দর্শন ধারাগুলোর দেহ সম্পর্কিত ধারণার স্বরূপ অন্বেষণপূর্বক আমরা এ ধারণার উপর গড়ে ওঠা আত্মসত্তা (subject) সম্পর্কিত বিশ্বাস ও আত্মসত্তার মুক্তির (salvation) বিষয়টি অনুসন্ধান করব।

তন্ত্রদর্শন

অনার্য অধ্যুষিত প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজে উদ্ভব ঘটেছে তন্ত্রমতের। বৈদিক বিশ্বাস থেকে এই মত স্বতন্ত্র। অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে অনার্যদের এই মত ও ধর্মপদ্ধতিকে বলা হয়েছে ব্রাত্যধর্ম।[৩] ব্রাত্যদের বৈদিক ধর্মানুষ্ঠান পালনের অধিকার ছিল না। তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে *সূত্রকৃতঙ্গ* নামের প্রাচীন জৈনগ্রন্থে যে আলোকপাত করা হয় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, গৌড়বাসী ও গন্ধর্বদের মধ্যে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।[৪] কৃষিজীবী সমাজের মানুষ প্রাকৃতিক উৎপাদনের পেছনে সক্রিয় ধরিত্রীশক্তি ও প্রাণরহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে জন্ম দিয়েছে একটি রূপকের, যাতে ধরিত্রীদেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মানবদেহকে। ভূমিমাতার ধারণাও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে বিরল নয়। ভূমির সক্রিয়শক্তির কারণেই প্রাকৃতিক উৎপাদনের ক্ষেত্র ভূমি এবং মানবীয় প্রজননের ক্ষেত্র মানবদেহ তুলনীয় হয়েছে। এর মূলে ছিল উর্বরতা-মূলক জাদুবিশ্বাস। যাতে মনে করা হতো মানবীয় প্রজনন ও প্রাকৃতিক উৎপাদন সমজাতীয়—এদের মধ্যে গুণগত কোনো ভেদ নেই। মানবীয় প্রজননের সাহায্যে বা সংস্পর্শে প্রাকৃতিক উৎপাদনকে আয়ত্তে আনা যাবে।[৫] প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজের মানুষ প্রাণরহস্যের সন্ধান করেছে মানবদেহে। এই প্রাণরহস্যকেই তারা জগৎ-রহস্যের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে এবং এই রহস্যমোচনে মানবদেহই হয়েছে তাদের কাছে অবিদ্যা ঘোঁছানোর প্রধান অবলম্বন। তারা ধারণা করেছে, প্রাণের রহস্যকে আয়ত্ত করতে পারলেই কারো পক্ষে নিজের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে তন্ত্র কথাটার অর্থ করা হয়েছে, 'যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের তদ্ বা তন্ যে প্রক্রিয়ায় তার পরবর্তীরূপে তারিত হয়, উত্তীর্ণ হয়, ত্রাণ পায়, সেই প্রক্রিয়াকে ধারণ করে যে ব্যবস্থা, তাকে বলে তন্ত্র।[৬] প্রাচীনকালে তন্ত্র বলতে কোনো কিছুর সারসত্তা, কোনো শাসনপদ্ধতি বা জ্ঞানের পদ্ধতি বোঝাতে ব্যবহৃত হতো[৭]। 'প্রজাতন্ত্রৈত্ব' কথাটা পাওয়া যায় কালিদাসের *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম* গ্রন্থে এতে তন্ত্র বলতে শাসন পরিচালনা পদ্ধতিকে বোঝানো হয়েছে। আধুনিককালেও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদি কথাগুলো প্রচলিত। তন্ত্র বলতে যে একটা পদ্ধতিকে (system) বোঝানো হয় তা স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থেকে বোঝা যায়। এসব প্রায়োগিক অর্থ থেকে অনুমান করা যায়, কোনো সত্তা বা দেহের মুক্তির পদ্ধতিই তন্ত্র। প্রাচীন সমাজে তন্ত্রের পরিধি ছিল ব্যাপক—কারিগরী বিদ্যা, কৃষি, পশুপালন, বয়নশাস্ত্র, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা ইত্যাদি যাবতীয়

বৈষয়িক জ্ঞানই তন্ত্রের বিষয়বস্তু ছিল।[৮] তবে, নিঃসন্দেহে বর্তমানে তন্ত্র কথাটির ব্যবহারিক অর্থের সংকোচন ঘটেছে।

তন্ত্র বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন বৌদ্ধরা, যার নাম *গুহ্যসমাজতন্ত্র*।[৯] গ্রন্থটি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে আচার্য অসঙ্গ কর্তৃক রচিত। তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

> প্রকৃতির সকল গুপ্ত শক্তি-সমূহের সহিত দেহের গুপ্ত বা সম্মূঢ় শক্তির কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বা কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায়, ইহা যে সাধনার ফলে জানা যায় বা আয়ত্তগত করিতে পারা যায়, তাহাই তন্ত্রসাধনা। এই তন্ত্রসাধনার মূল হইল দেহতত্ত্ব। তাই দেহের কথা লইয়া তন্ত্র আগাগোড়া ব্যস্ত।[১০]

তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বও দেহতত্ত্বের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। এ প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "দেহতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায় না। কারণ তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জীবদেহ—বিশেষত মানবদেহ—যে পদ্ধতি অনুসারে সৃষ্টি হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেই একই পদ্ধতি অনুসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মধ্যে পদ্ধতির কোনোরূপ বৈষম্য নাই।"[১১] এ থেকে অনুমেয় যে, দেহের বিকাশের ভেতর দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশকে চেনা ও জানা সম্ভব।

তন্ত্রমতে, মানবদেহ একটি অনুবিশ্ব (microuniverse)। বিশ্বে যা কিছু বিদ্যমান তার সবই আছে মানবদেহে। তাই মানবদেহ হলো জগৎরহস্যের আধার। দেহকে তান্ত্রিকগণ ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করেছে: ১) অন্নময় কোষ; ২) প্রাণময় কোষ; ৩) মনোময় কোষ; ৪) বিজ্ঞানময় কোষ; এবং ৫) আনন্দময় কোষ।[১২] দেহকোষের এই শ্রেণীবিভাগ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণ, মন, চেতনা ও আনন্দ দেহের সঙ্গে অভিন্ন। তান্ত্রিকগণ দেহকে ৬টি চক্রে ভাগ করেছেন। এর ৫টি চক্রকে কোনো কোনো গ্রন্থে পঞ্চভূত এবং একটি চক্রকে মনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও মন দেহেরই অনুরূপ, তা দেহেরই একটি ভাগ। মনকে তান্ত্রিকগণ দেহবিযুক্ত কোনো সত্তা হিসেবে দেখেনি। চৈতন্য যে মস্তিষ্কেরই এক স্নায়বিক ক্রিয়া একথা সর্ব প্রথম তান্ত্রিকেরাই আবিষ্কার করেন।[১৩] তাঁদের মতে, দেহ ভিন্ন কোনো অধ্যাত্মসত্তার অস্তিত্ব নেই। দেহস্থিত চক্র ও নাড়ীই তাদের সাধনার অবলম্বন।

প্রাচীন তন্ত্রের কুণ্ডলিনীতত্ত্ব দেহ সম্পর্কিত ধারণার নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে মহাকুণ্ডলিনী হলো মহাবিশ্বের শিকড়। একে অর্জন করার মাধ্যমে সাধক তার ব্যক্তিক অবস্থা অতিক্রম করে সর্বব্যাপ্ত হতে পারে। কুণ্ডলিনী বলতে তান্ত্রিকেরা এমন একটা আধার-শক্তিকে বুঝেছেন যা সমস্ত পদার্থকে আশ্রয় দিয়েও সব পদার্থের সারসত্তা রূপে বর্তমান থাকে। কোনো কোনো তাত্ত্বিক একে চিন্ময় শক্তিরূপে আবার কোনো কোনো তাত্ত্বিক একে বস্তুগত শক্তিরূপে গণ্য করেছেন। কুণ্ডলিনী শক্তি সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বলেন, 'ইহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে ইহা নিরাধার হইয়া যায়, যখন কুণ্ডলিনী নিরাধার, তখন জগতের সকল বস্তুই নিরাধার। কুণ্ডলিনী যখন নিরাধার হইয়া যায়, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই চৈতন্যময় রূপ ধারণ

করে।'[১৪] এই অবস্থাকেই বলা হয়েছে কুণ্ডলিনী জাগরণ। গোপীনাথ কবিরাজ একে ব্রহ্মময়তা অনুভবের সঙ্গে তুলনা করেন।

তান্ত্রিকেরা দেহকে অণুবিশ্ব হিসেবে দেখেছেন, তাঁই তাদের কাছে এই দেহই জ্ঞানের অবলম্বন। তন্ত্রমতে, দেহকে জানার মাধ্যমে প্রাণ ও জগৎরহস্যকে আয়ত্ত করা যায়। এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য আত্ম-অতিক্রম। ব্যক্তি আত্ম-অতিক্রমের মাধ্যমে নিজের বিশেষ অবস্থা থেকে নির্বিশেষ বিশ্বসত্তায় উপনীত হতে পারে। তাই দেহ তান্ত্রিকদের কাছে আত্মমুক্তির উপায়।

প্রাচীন তন্ত্রের দেহাত্মবাদী মত থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র অবস্থান আমরা দেখতে পাই বেদান্ত বা উপনিষদে। যদিও উপনিষদে চিন্তার নানা ধারা রয়েছে তথাপি কোনো কোনো উপনিষদে গুরুশিষ্যের আলোচনার ভেতর প্রায় বিরোধাত্মক মতের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে, উপনিষদের ঋষিদের মত অধ্যাত্মবাদী, তাঁরা দেহের বাইরে আত্মার স্থিতিকে স্বীকার করেন।

উপনিষদ ও গীতা

বেদের অন্তে বা পরে রচিত বলে উপনিষদকে বেদান্তও বলা হয়। বেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এতে প্রতিফলিত, কেউ কেউ একে বেদের সারবস্তু বলে অভিহিত করেন।[১৫] পূর্বাঞ্চলের ক্ষত্রিয় সমাজে বেদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকে অনেক উপনিষদ রচিত হয়। পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ নাথ উপনিষদ কথাটির অর্থের সঙ্গে এর উদ্দেশ্য যুক্ত করে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> উপ-পূর্বক নি-পূর্বক সদ্-ধাতুর অর্থ অবসাদনে, গতিতে ও বিনাশে। যাহা দেহাত্মবুদ্ধিকে, বা সংসারই সারবস্তু—এই বুদ্ধিকে অবসাদিত বা শিথিল করে, যা পরব্রহ্মে গতির উপায়, বা পরব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায় জানাইয়া দেয় এবং যাহা সংসারবীজভূতা মায়ার বা অবিদ্যার বিনাশ করে বা বিনাশের উপায় জানাইয়া দেয়, তাহাই উপনিষৎ।[১৬]

এই ব্যাখ্যায় উপনিষদকে দেখা হচ্ছে দেহাত্মবাদকে নাশ করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় হিসেবে। উপনিষদগুলোতে প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের যে বাক্যালাপ বা কথোপকথন বিবৃত হয়েছে, তাতে শিষ্যদের কারো কারো কথায় দেহাত্মবাদী মতের প্রকাশ খুব স্পষ্ট। উপনিষদে সেসব মতকে বিরুদ্ধ যুক্তিসন্নিবেশের মাধ্যমে অসার প্রতিপন্ন করে অধ্যাত্মবাদী মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপনিষদে আত্মাকে দেখা হয়েছে নিত্য সত্তা রূপে, দেহ হচ্ছে সেই নিত্য আত্মার বাসগৃহ।

> পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
> অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ (কঠ উপনিষদ: ২/২/১)

অর্থাৎ

> এই দেহ একাদশ দ্বার বিশিষ্ট এক নগর। যেখানে আত্মা বাস করেন। এই আত্মা অজাত, অপরিবর্তনীয়, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। সাধক এই দেহকে আত্মার সেবায় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যবহার করেন এবং তার দ্বারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তখন তিনি সকল দুঃখের পারে যান। যেহেতু তিনি অজ্ঞানতা অতিক্রম

> করেছেন, নিজেকে আর দেহ বলে মনে করেন না, সেহেতু জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন।[১৭]

উপনিষদের ভাষ্যে দেহ অনিত্য কিন্তু আত্মা নিত্য সত্তা। এই আত্মাই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সাধককে তার মুক্তির জন্য নিজের আত্মা সম্পর্কিত এ উপলব্ধি জাগ্রত করতে হয়:

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনা–
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপাশ্যন্তি ধীরা–
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ (কঠ উপনিষদ: ২/২/১৩)

অর্থাৎ

> সকল অনিত্যের মাঝে যিনি নিত্য, সকল চেতন বস্তুর মধ্যে যিনি স্বয়ং চৈতন্য এবং যিনি একমাত্র সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণে সক্ষম, তিনিই পরামাত্মা। যে সব প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি এই পরমাত্মাকে নিজ আত্মারূপে দর্শন করেন, কেবল তাঁরাই মনে অপার শান্তি লাভ করেন। অন্যেরা এই শান্তি থেকে বঞ্চিত হন।[১৮]

উপনিষদের এই উক্তিতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, পরমাত্মা নীতিবোধের উৎস এবং মানুষের ইচ্ছাপূরণের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে।

জগতের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নে উপনিষদে একটি অশ্বত্থ গাছের উপমা দিয়ে বলা হয়েছে যে, গাছের শাখা-প্রশাখা হলো দৃশ্যমান জগৎ আর তার শিকড় হলো ব্রহ্ম। কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে:

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ (কঠ উপনিষদ: ২/৩/২)

অর্থাৎ এই জগতের সকল বস্তু প্রাণ থেকে এসেছে। আবার এই প্রাণকে আশ্রয় করেই সব বস্তু সক্রিয় হয়। উদ্যত বজ্রের মতো এই ব্রহ্ম অতি ভয়ানক। যাঁরা এই ব্রহ্মকে জানেন তাঁরা মৃত্যুকে জয় করেছেন।[১৯] প্রাণ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে ব্রহ্মকে এবং এই ব্রহ্মের মায়াশক্তিকে আশ্রয় করেই সম্ভব হয় বস্তুর সক্রিয়তা। এক দেহের সঙ্গে অন্যদেহের রূপগত ভিন্নতা এই মায়ার প্রভাবেই ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন দেহে যে আত্মা বিরাজ করে তা অভিন্ন। উপনিষদে বলা হয়েছে:

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্বস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ (কঠ উপনিষদ: ১/২/২২)

অর্থাৎ, দেহহীন নিত্য আত্মা যা নিরাকার, বিভিন্ন অনিত্য দেহের ভেতর অবিকৃতভাবে অবস্থান করে। দেহস্থিত সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে যিনি একাত্মতা অনুভব করেন সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই দুঃখ-শোককে অতিক্রম করেন।

ব্যক্তির দেহে অবস্থিত আত্মাকে পরমাত্মা হিসেবে উপলব্ধিকে মুণ্ডকোপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরব্রহ্মে লীন হবার তত্ত্ব দিয়ে।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ (মুণ্ডকোপনিষদ: ২/২/৪)

অর্থাৎ, প্রণব হচ্ছে ধনুক, জীবাত্মা শর এবং ব্রহ্ম হচ্ছে সেই শরের লক্ষ্যবস্তু। প্রমাদমুক্ত হয়ে সেই লক্ষ্যকে শরবিদ্ধ করতে হবে। তাহলে জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে।

দেহই আত্মা, দেহ থেকে বিযুক্ত কোনো নিত্য আত্মার কল্পনা অলীক—তান্ত্রিকদের এ মতের সঙ্গে ঔপনিষদিক ঋষিদের মতভেদ স্পষ্ট হয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদে। আমরা এ উপনিষদে দেখতে পাচ্ছি, প্রজাপতি আক্ষেপ করে বলছেন, আত্মা সম্পর্কে তারা কিছু না জেনেই চলে গেল। ইন্দ্রের সঙ্গে আলাপ শেষে অসুররাজ বিরোচন তুষ্টমনে অসুরদের কাছে ফিরে গিয়ে একেবারেই উল্টোভাবে উপনিষদের অর্থ ব্যাখ্যা করলেন: শোনো, এই শরীরই আত্মা এবং ইহজগতে এই শরীরের পূজা ও সেবাযত্ন করাই কর্তব্য। (ছান্দোগ্য: ৮/৮/৪) অসুরদের এই দেহাত্মমত স্পষ্টতই অবৈদিক। বৈদিক ও ঔপনিষদিক ধারণায় দেহ অনিত্য আর এই দেহে বাস করে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ নিত্য আত্মা। এই নিত্য আত্মাকে পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করাই সাধকের লক্ষ্য। দেহের ভিন্নতায় আত্মার ভিন্নতা হয় না। সব মানবদেহে বিরাজ করে একই আত্মা। জড়জগৎ পরমাত্মার মায়াশক্তি থেকে উৎপন্ন, এর সমস্ত কিছুর মূল নিহিত রয়েছে পরব্রহ্মে।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় উপনিষদের অধ্যাত্ম মতেরই প্রকাশ দেখা যায়। তাতে বলা হচ্ছে, দেহ নশ্বর এবং দেহস্থিত আত্মা অবিনশ্বর, তাকে হনন করা যায় না। গীতার সাংখ্যযোগ অধ্যায়ে অর্জুনকে উপদেশ দেবার সময় আত্মা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেন:

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ (গীতা: ২/২০)

অর্থাৎ ইনি কদাচ জন্মেন না বা মরেন না; অথবা (এখন) হয়ে (উৎপন্ন হয়ে) পুনর্বার হবেন না– এমনও নয়। ইনি জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়, অনাদি; শরীর হত হলেও (এই আত্মা) হত হন না।[২০] মানুষ যেমন জীর্ণ পোশাক পরিত্যাগ করে নূতন পোশাক পরে, তেমনি আত্মাও জীর্ণ দেহ ছেড়ে নূতন দেহ গ্রহণ করে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ (গীতা: ২/২২)

গীতার এই মত উপনিষদের ঋষিদের মতের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, কিন্তু তা তন্ত্রমত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

গীতার ভাষ্য অনুযায়ী গুণ ও কর্ম আত্মার সঙ্গে জড়িত নয়। এ দুটোই প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। গুণ গুণের সঙ্গে ক্রিয়া করে, আত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই (গীতা: ৩/২৮)। তাই যারা গুণ ও কর্মে আসক্ত তারা অপূর্ণ জ্ঞানবান। গীতায় আসক্তিশূন্য কর্মের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

শঙ্করাচার্য প্রণীত বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে সত্ত্বগুণের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি
তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্।[২১]

অর্থাৎ, 'সত্ত্বগুণ জলের ন্যায় বিশুদ্ধ; আর তাহাতে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া নিখিল জড়বস্তু প্রকাশ করে। কিন্তু তথাপি তাহার অপর দুইটির সহিত জড়িত হইয়া সংসারগতির অনুপন্থী হয়'।[২২] জড়জগৎ ও সংসারের উদ্ভব প্রকৃতির গুণ ও তাদের ভেতরকার দ্বন্দ্বের ফলে। উপনিষদের সঙ্গে গীতার ভাষ্যের মিল এখানে যে, উভয় মতেই দেহ অনিত্য এবং এই আত্মাকে শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া উপলব্ধি করা যায় না। লোকজগতের কোনো গুণ কিংবা কর্ম আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না।

বৌদ্ধ সহজিয়া

বুদ্ধ অনাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মূল সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে একটি ছিল: 'জীবন প্রবাহকে দেহের মধ্যে সীমিত করা। অন্যথায় জীবন এবং তার নানা বৈচিত্র কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন না হয়ে, স্রেফ এক আকস্মিক ঘটনারূপে প্রতিভাত হবে।'[২৩] তথাপি গৌতম বুদ্ধ জড়বাদী ছিলেন না। তিনি বলেছেন, (অঙ্গুত্তরনিকায় ৩) 'যেই জীব, সেই শরীর (উভয়ে এক)—এ রকম বিচার করলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। 'জীব ও শরীর স্বতন্ত্র'— এই মত থাকলেও ব্রহ্মচর্যবাস হয় না।"[২৪] কর্মফল ও অসমাপ্ত কর্মকে সমাপ্ত করার ধারণার সঙ্গে যুক্ত জন্মান্তর বস্তুবাদ-সিদ্ধ নয়। আবার, আত্মবাদীদের মতো আত্মাকে যদি নিত্য বলে স্বীকার করা হয় তবে সেই আত্মার মুক্তির প্রশ্ন উঠতে পারে না। গৌতম বুদ্ধ কর্মফল ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন, তেমনি মানুষের মুক্তির ধারণায়ও তাঁর আস্থা ছিল। বুদ্ধ আত্মবাদের পরিবর্তে যে ধারণাকে স্বীকার করেছেন, তার নাম সৎকায়দৃষ্টি।[২৫] এতে বলা হয়েছে, আত্মা কায়াতে বিদ্যমান। কায়া বা দেহে অস্তিত্বপ্রবাহ বা যে চেতনপ্রবাহের অনবচ্ছিন্নতা এর বৌদ্ধ নাম পুদগল। বৌদ্ধমতে জীবদেহকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি উপনিষদ, গীতা ও তন্ত্র থেকে আলাদা। এই জীবদেহ নিত্য আত্মার বাসগৃহ নয়। আবার দেহ সম্পূর্ণ জড় সত্তাও নয়। এতে কর্মফল সমাপ্ত করার সম্ভাবনা বিদ্যমান। জীবদেহ ভবজীব বহনে সক্ষম। ভবজীব মানে কর্মফলকে কার্যকর করার সম্ভাবনা।

বৌদ্ধ সহজিয়া মতের উদ্ভব মহাযানী ধারা থেকে। একে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতও বলা হয়ে থাকে। এই ধারার সাধকদের সাধন-পদ্ধতি তান্ত্রিক কায়াসাধনার ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত এবং সাধনতত্ত্ব বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মিলিত উত্তরাধিকার থেকে গৃহীত হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়ারা বজ্রযানীদের আড়ম্বরপূর্ণ কৃত্যানুষ্ঠান-পূজা-অর্চনা-মন্ত্র-মণ্ডল-ধারণী-বীজ ইত্যাদি বর্জন করে গুরুমুখী কায়াসাধনাকেই চর্চার বিষয় রূপে গ্রহণ করেছে। তাদের সাধন-পদ্ধতিকে বলে অবধূতিকামার্গ। এই সাধন-পদ্ধতি দেহনির্ভর। সহজিয়াদের সাধনার লক্ষ্য যে সহজাবস্থা প্রাপ্তি তা শরীরীভাবে অনুভবযোগ্য একটি অবস্থা। সহজাবস্থাকে সহজচক্র বা মহাসুখচক্রের সঙ্গে একীভূত ভাবা হয়। অর্থাৎ, সাধকগণ এই সাধনায় আনন্দের পথে থাকেন। সহজপ্রাপ্তিতে যে মুক্তি ঘটে তা আনন্দময়।

সহজিয়া মতে, সহজ এমন একটা অবস্থা যা প্রাপ্ত হলে আত্মপর ভেদ ঘুঁচে যায়। সাংবৃতিক জগতের যে বিরোধাভাস থেকে ভাষা ও জ্ঞানের উদ্ভব, সহজাবস্থায় সেই বিরোধ বা বিকল্পাত্মক দ্বৈততারও অবসান হয়। ভাষা যেহেতু দ্বৈততাসূচক আর সহজাবস্থায় কোনো দ্বৈততা থাকে না, তাই সহজকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভাষার অতীত এই সহজকে প্রভাস্বর শূন্যও বলা হয়েছে। সব ধরনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এই শূন্যতাকে আবিষ্কার করতে পারলেই দ্বৈততার বোধ থেকে মুক্তিলাভ করা যাবে।[২৬]

বৌদ্ধ সহজিয়া মতের প্রকাশ ঘটেছে সিদ্ধাচার্যদের রচিত দোহাকোষ বা চর্যাগীতিকায়। লুই পা তাঁর একটি চর্যায় শরীরকে গাছ এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে তার পাঁচখানা ডাল বলেছেন। ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রাপ্ত সংবেদনেই চিত্ত চঞ্চল হয় এবং তা থেকে কাল বা সময়ের জন্ম হয়। লুই পা এই চর্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ তথা যোগাভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিবৃত্তির মাধ্যমে শূন্যের আবাহন করতে বলেন।

সরহ পা'র একটি চর্যায় দেহকে বলা হয়েছে নৌকা আর শুদ্ধ মন হচ্ছে তার দাঁড় বা কেড়ুয়াল। মনকে স্থির করে সহজাবস্থায় পৌঁছাতে নাবিককে দাঁড় বাইতে বলেছেন সরহ পা।

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদগুরু বঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহু রে নাঈ।
আন উপাএঁ পার ণ জাই ॥ (চর্যা: ৩৮)

বৌদ্ধ সহজিয়াগণ দেহ জাত বিকল্পাত্মক সাংবৃতিক জগৎ থেকে সাধনার মাধ্যমে যে অদ্বৈত সহজাবস্থায় পৌঁছাতে চান তাকে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে দেহের ভেতরেই পাওয়া সম্ভব। এই অদ্বৈতসিদ্ধির মাধ্যমে কাম, ক্রোধ, মোহ, ঘৃণা থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ হয়। কৃষ্ণাচার্য বলছেন:

কাহ্ন কপালী জোই পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই এককারে ॥
.....

রাগ দেশ মোনলাই অ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তিহার ॥ (চর্যা: ১১)

অর্থাৎ, কাপালিক যোগী কাহ্ন যোগাচারে প্রবিষ্ট হয়ে দেহ-নগরীতে অদ্বয়ভাবে বিহার করছেন। কাহ্ন কাম ঘৃণা এবং মোহের ভস্ম গলায় নিয়ে পরমমোক্ষের মুক্তাহার লাভ করল। কৃষ্ণাচার্য অপর একটি চর্যায় (চর্যা: ১৩) বলেন, নিজ দেহই করুণা ও শূন্যতার উৎস। পাঁচ তথাগতকে নৌকার দাঁড় করে দেহকে পার হতে হয় মায়াজালের মতো, তখন মন শূন্যতায় প্রবেশ করে। এই শূন্যতার অবস্থা আনন্দময়।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণ মোক্ষরূপ যে সহজকে লাভ করতে চান সেই অবস্থায় পৌঁছালে ইন্দ্রিয়ের গতি রুদ্ধ হয়। সিদ্ধাচার্য ভুসুকু বলেন, সহজ স্বরূপের উদ্বোধনে ইন্দ্রিয়বন্ধন ছিঁড়ে যায় এবং নিজের মনে উল্লাস জন্মে। বিষয়-বোধ থেকে মনকে শুদ্ধ করতে পারলে আনন্দকে বোঝা যায়, যেমন চাঁদ উঠলে আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে:

জাসু সুনন্তে তুট্টই ইন্দিআল।
নিহুএ ণিঅ মন দেঅ উলাল ॥
বিসআ বিসুদ্ধে মই বুজঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ॥ (চর্যা: ৩০)

অর্থাৎ, সহজ স্বরূপের ডাক শুনতে শুনতে ইন্দ্রিয়-বন্ধন ছুটে যায়, নিভৃতে নিজ মনে উল্লাস জাগে। বিষয় বিশুদ্ধির দ্বারা আমি আনন্দকে বুঝেছি, যেমনভাবে গগনকে চাঁদ উজ্জ্বল করে।

শান্তি পা সহজ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ হচ্ছে স্বসংবেদন—এতে কার্যও নেই, কারণও নেই। দেহ সম্পর্কিত ধারণার নির্মাণে স্বসংবেদন তত্ত্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে—স্বসংবেদন পদটির অর্থ চেতন হবার জন্য সচেতনতা অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ, জ্ঞান-পরিস্থিতি কোনো কার্যকারণের ফল নয়। স্বসংবেদন কোনো প্রসঙ্গের উপর নির্ভরশীল হয়ে জ্ঞান তৈরি করে না বা কোনোকিছু কারণ হিসেবে জ্ঞান তৈরির পেছনে ভূমিকা রাখে না। আচার্য শান্তরক্ষিত তাঁর *মাধ্যমিকালঙ্কার* গ্রন্থে বলেন, চেতনা উৎপন্ন হয়েছে যা অচেতন তার বিপরীত প্রকৃতির কোনোকিছু থেকে। যা অচেতন হওয়ার স্বভাববিশিষ্ট নয় তা হলো চেতনার স্বসংবেদন।[২৭] অর্থাৎ, চেতনা কেবল যা চেতনার স্বভাববিশিষ্ট তাকেই জানতে পারে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, জ্ঞান সৃষ্টি হবার জন্য জগতের শর্তসমূহ দেহের ভেতর বা চেতনার ভেতর বিদ্যমান।

অন্যদিকে, যে কার্য-কারণের বোধ দিয়ে আমরা জগতের ধারণা গড়ে তুলি বা যার আশ্রয়ে ভাষা ও জ্ঞানকাণ্ড গড়ে ওঠে সহজাবস্থায় তা লুপ্ত হয়। সে-কারণে সহজাবস্থাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভুসুকু এই অবস্থাকে বলেছেন, চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত (চর্যা: ৪৯), যা ভাষায় বর্ণনার

অতীত। লুই প্রশ্ন তুলেছেন, যার বর্ণ, চিহ্ন নেই তাকে আগম বা বেদের দ্বারা কিভাবে ব্যাখা করা যাবে?

জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥ (চর্যা: ২৯)

তাড়ক পা অদ্বৈতসিদ্ধির অবস্থাকে বলেছেন, বাকপথাতীত বা ভাষা ও বাক্যের অতীত। সহজকে বাগেন্দ্রিয়ে ব্যক্ত করা যায় না (চর্যা: ৩৭)।

দোহাকোষে চর্যাকারগণ সহজ বা প্রভাস্বর শূন্যের যে উদ্বোধন আত্মসত্তায় ঘটাতে চেয়েছেন তা দেহকে আশ্রয় করে হলেও দৈহিক সংবেদনজাত মনই প্রধান বিবেচ্য। মন বা চিত্তে দ্বৈতাভাস বা বিরোধাভাস যুক্ত হলে জগৎকে আমরা জগৎরূপে দেখি। ফলে, মনের নিরোধ ঘটলেই লাভ করা যাবে অদ্বৈতসিদ্ধি। তখন ব্যক্তি-অস্তিত্ব শূন্য হয়ে যাবে। তাড়ক পা বলছেন, তখন আপনিই নেই, কিসের আর শঙ্কা? কাহ্ন পা অদ্বৈতসিদ্ধি অর্জনের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, স্কন্ধবিয়োগে সাধকের বিষণ্ন বা কাতর হবার কোনো দরকার নেই, কেননা সাধক তখন ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন।

চিঅ সহজে সূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিসন্না ॥
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।
ফরই অনুদিন তেলোএ সমাই ॥ (চর্যা: ৪২)

অর্থাৎ, চিত্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে শূন্য দ্বারা সম্পূর্ণ। স্কন্ধের (পঞ্চস্কন্ধ বা দেহ) বিয়োগে কাতর হয়ো না। কী করে বলছো যে, কাহ্ন নেই। তিনি বিরাজ করছেন অনুদিন ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হয়ে। কাহ্নপার এই চর্যা অনুসারে, প্রভাস্বর শূন্য সাধকের অস্তিত্বের বিনাশ নয়, তা বিশেষ ব্যক্তিসত্তা থেকে নির্বিশেষ সর্বব্যাপী সত্তায় উপনীত হওয়াকে নির্দেশ করে।

বৌদ্ধমতে, আদিতে যা ছিল নির্বাণ ক্রমশ তা অর্হতত্ত্ব, বোধিচিত্ত, বোধিসত্ত্ব, বজ্রসত্ত্ব ইত্যাদি রূপ লাভ করে এবং তা বৌদ্ধ সহজিয়াদের কাছে হয়ে ওঠে সহজাবস্থা। এই শরীরী অবস্থায় পৌঁছালে বিরোধাভাস মুক্ত হয়ে জগতের গতি রুদ্ধ হয়। সাধক অদ্বৈতাবস্থায় পৌঁছেন। এই অবস্থা এবং এর আনন্দ শরীরীভাবে অর্জন ও অনুধাবনযোগ্য। কোনো কোনো চর্যায় অদ্বৈতাবস্থাকে পরম ধরে সাংবৃতিক জগৎকে মায়া, মরুমরীচিকা বা দর্পণে-প্রতিবিম্বিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রকার বিশ্বাসকে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

আইএ অণুঅনা এ জগরে ভান্তিএ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাচে কিঁ তঁ বোড়ো খাই ॥
...
মরূমরীচি, গন্ধব্বন অরী, দাপণ পড়িবিম্ব জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ (চর্যা: ৪১)

অর্থাৎ, এই জগৎ আদিতে অনুৎপন্ন। ভ্রান্তির কারণেই এ জগতকে জগৎ প্রতিভাত হয়। রজ্জুতে সাপ দেখে যে চমকায়, তাকে কি আদতেই বোড়ো সাপে খায়? এই জগৎ মরুমরীচিকা, গন্ধর্বনগরী ও দর্পণ প্রতিবিম্বের মতো। বাতাবর্তে সে দৃঢ় হলো, জল যেমন প্রস্তরবৎ।

বুদ্ধ নিজে মুক্তির অবস্থা বা নির্বাণের স্বরূপ কি, সে প্রশ্নে নীরব ছিলেন। সহজাবস্থা নির্বাণতুল্য এক স্তর, তার উৎস শরীর, কিন্তু ভাবগতভাবে ক্রমশ এই অবস্থাটি চূড়ান্ত কাম্যবস্তু হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, সাধকের কাছে লৌকিক জগৎটি তখন ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ে। সহজকেই তারা গণ্য করেন পরম বলে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এই সহজপরম দেহেরই অন্তর্গত। দেহের শর্তেই সাধক এই মুক্তির অবস্থায় প্রবেশ করেন। দেহের চক্রগুলোকে অতিক্রম করে সহজচক্রে প্রবেশের ভেতর দিয়ে সাধক মুক্তিলাভ করেন। এই মুক্তির একটা ক্রমপরম্পরা আছে যা প্রতীকীভাবে নাভিমূলকে 'প্রজ্বলন্ত করা' এবং 'চন্দ্রকান্তি বিগলিত হওয়া'র সঙ্গে তুলনীয়। নাভিমূলে আছে নির্মাণচক্র আর মস্তিষ্কে আছে সহজচক্র। সাধক দৈহিকভাবেই নির্মাণচক্র থেকে সহজচক্রে পৌঁছান এবং পূর্ণতার পথে তিনি সত্যের যে আপেক্ষিক অবস্থানে থাকেন তা দেহেরই সত্য।

নাথধর্ম

নাথধর্মের উদ্ভব হয়েছে বৌদ্ধ সহজিয়া মত থেকে। কোনো কোনো তাত্ত্বিক অবশ্য একে প্রাচীন শৈব মত বলে অভিহিত করেন।[২৮] তবে নাথধর্মের সঙ্গে তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদের সাদৃশ্য বেশি, এছাড়াও নাথগণ শূন্যবাদী ও কায়াসাধক। আদিনাথ শিবের সঙ্গে আদিবুদ্ধের ধারণার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এসব বিবেচনায় নাথধর্মকে বৌদ্ধ সহজিয়া মত থেকে উদ্ভূত বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। নীহাররঞ্জন রায় বলেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও লুইপা যদি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হন তবে নাথধর্ম সহজিয়া সিদ্ধাদের প্রবর্তিত একটি মত।[২৯] এছাড়া নাথপন্থীদের অনেকেই কোনো কোনো সিদ্ধাচার্যকে নিজেদের আচার্য বলে মনে করেন। মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ নাথপন্থীদের সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের নামানুসারেই এই ধর্মকে নাথধর্ম বলে। গোরক্ষনাথ ছিলেন ময়নামতির রাজা গোপীচন্দ্রের সমসাময়িক। নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথের ৫টি গ্রন্থ পাওয়া গেছে, যার একটির নাম *কৌলজ্ঞাননির্ণয়*।

নাথপন্থা অনুসারে, মানুষের অপক্ব দেহই তার দুঃখ-শোকের কারণ। যোগরূপ অগ্নির দ্বারা একে সিদ্ধদেহে পরিণত করতে হয়। একজন সিদ্ধা যোগাভ্যাসের মাধ্যমেই দিব্যদেহের অধিকারী হন এবং অমরত্ব লাভ করেন। নাথধর্মের কাহিনী নিয়ে রচিত গ্রন্থ *গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস*-এ কায়াসাধনা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

শুন বাছা গুপিচন্দ্র যোগের কাহিনী।
বাইন শুদ্ধ হইলে নৌকা না লইবে পানি ॥
খাকের খুটি নৌকার টাটী আবের গড়া।
পবনে গুণ টানে নৌকা আতসের মোড়া ॥
...

পাঁচ পণ্ডিত লয়া মনুরাই বৈসে হৃদয়।
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবা পরিচয় ॥
কাণ্ডারী থাকিতে কেন যাএ অন্যঘাটে।
বাছিয়া লাগাও নৌকা নিরাঞ্জনের ঘাটে ॥[৩০]

অর্থাৎ, নৌকার গাঁথুনি যদি ঠিক থাকে তবে তাতে আর পানি প্রবেশ করতে পারবে না। যোগ দিয়ে যদি দেহশুদ্ধি ঘটানো না হয় তবে তা হবে বাতাসের কাছে গুনটানার দায়িত্ব ছেড়ে দেবার মতো অবিমৃশ্যকারিতা। কায়াসাধনের মাধ্যমে এই দেহের ভেতরই মিলবে জ্ঞান, সাধ ও ধ্যানের পরিচয়। নৌকা তখন আর ভুল ঘাটে গিয়ে পৌঁছাবে না বরং নিরঞ্জনের ঘাটে গিয়ে উপনীত হওয়া যাবে। *গোরক্ষবিজয়* কাব্যে একই রকম কথা বলা হয়েছে—কেউ যদি দেহকে যোগসিদ্ধির মাধ্যমে পক্ব দেহে পরিণত না করে তবে তার অর্থ শত্রুর হাতে ধনভাণ্ডার দিয়ে রাখা, শঠের হাতে কাণ্ডার দেওয়া কিংবা উদকে মাছের প্রহরী করা, বিড়ালকে দুধের পাহারায় রাখা, বাঘের মুখে গরু, ডাকাতের হাতে ধনসম্পদ এবং সাপের মুখের সামনে ব্যাঙকে রাখার মতো। [৩১] এভাবেই নাথপন্থায় অপক্বদেহকে সিদ্ধদেহে পরিণত করতে যোগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

নাথধর্মের মূলতত্ত্ব হলো, দেহভাণ্ডে অমৃতের রক্ষণ, ভক্ষণ, তার সাহায্যে সমস্ত দেহের আপ্যায়ন ও ক্রমপরিবর্তন। ক্রমপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে সাধক প্রথমে সিদ্ধতনু, তা থেকে দিব্যতনু এবং সেই দিব্যতনু থেকে প্রণবতনু লাভ করে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে ওঠেন।

নাথপন্থীরা নিবৃত্তিমার্গের অনুসারী। নিবৃত্তিমার্গ হলো সত্যদর্শন ও দিব্যচক্ষু অর্জনের মাধ্যম। এতে অবিদ্যার নাশ হয় এবং তার মাধ্যমে তৃষ্ণা ও দুঃখময় জগতের উচ্ছেদ ঘটে। এই নিরোধের উপায়ই হলো যোগ। চঞ্চল জলে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তাকে স্থির হতে হয়, তেমনি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মনকে নিবৃত্ত করতে যোগসাধনার প্রয়োজন। *হঠযোগদীপিকা*'য় বলা হয়েছে:

মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।[৩২]

অর্থাৎ, মনকে স্থির করা গেলে বাক্য স্থির হবে, দেহে যে বায়ু চলাচল করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে দেহের বিন্দু ধারণ করা যাবে, বিন্দু ধারণ করা গেলে স্কন্ধ ঠিক হবে এবং এভাবেই সবকিছু সুস্থির হবে, গোরক্ষনাথের এমনই মত। শাস্ত্রকারগণ যোগকে সংজ্ঞায়িত করেছেন যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।[৩৩] অর্থাৎ, যোগ হচ্ছে চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায়। নাথরা বিশ্বাস করেন, দেহের সঙ্গে চেতনার সরাসরি সংযোগ রয়েছে; দেহের বিচলনে চেতনা বিচলিত হয়। বিক্ষুব্ধ চেতনায় সত্য প্রতিফলিত হতে পারে না, যেমন তরঙ্গসংকুল জলে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না

কোনো বস্তুর। যোগ দেহকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মনকে এমনভাবে স্থির করে যে তাতে সত্যের প্রতিফলন দেখা যাবে।

নাথপন্থীরা যোগের মাধ্যমে দেহে এমন একটি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চান যাতে দেহ-ই বদলে যাবে; এবং এই বদলে যাওয়া দেহে অমরত্ব লাভ ঘটবে বা সাধক মৃত্যুঞ্জয় হয়ে উঠবেন।[৩৪] এই অমরত্ব লাভই নাথ-সাধকদের সাধনার উদ্দেশ্য।

সুফিতত্ত্ব

বাংলার সুফিদের দ্বারা ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রবণতার সঙ্গে ইসলামী ভাবধারার মিশ্রণ ঘটে। ইসলামের যে রূপটি বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা সর্বাংশে শাস্ত্রনির্ভর নয়, বরং শাস্ত্র থেকে দূরবর্তী। যে অদ্বৈতভাবকে আশ্রয় করে প্রাচীন যোগ, তন্ত্র, বেদান্ত, বৌদ্ধ সহজিয়া ইত্যাদি ধর্মধারা বাংলা অঞ্চলের মানুষের মনে ও কর্মে প্রবাহিত হয়ে এসেছে সেই বিশ্বাসের নিগড় থেকে উৎসারিত আবহে সুফিমতও নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে, এই মতই সাধারণ জনগণের মধ্যে সমাদৃত হয়। মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর *বঙ্গে সূফী প্রভাব* গ্রন্থে বলেন, "বাঙ্গালায় সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এমন এক প্রকারের নূতন ইসলাম জন্ম লাভ করিল, যাহাকে 'লৌকিক ইসলাম' বলিয়া নাম দেওয়া যায়।"[৩৫] হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবে বাংলার এই লৌকিক ইসলাম বা নব-সুফি ভাবধারায় উদ্ভব ঘটেছে কায়াসাধনা বা দেহতত্ত্বের এবং এতে যুক্ত হয়েছে মোকাম-মঞ্জিল, হাল, চতুর্কায়, জ্যোতি (লতিফা), লাহুত-হাহুত, মুরাক্বিবাহ্, ফানাফিশেখ, ফানাফিল্লাহ, বাক্বাবিল্লাহ ইত্যাদি ধারণা।

বাংলার সুফিবাদে পরমের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অহংবিলোপের বা ফানাফিল্লাহর ধারণা বৌদ্ধ নির্বাণের ধারণা থেকেই এসেছে।[৩৬] তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে, এই নির্বাণের অর্থ ইন্দ্রিয়-নিরোধের মাধ্যমে বা দৈহিক প্রক্রিয়ায় দ্বৈতাভাস মুক্ত হয়ে সহজে বা প্রভাস্বর শূন্যাবস্থায় উপনীত হওয়া। বাংলার নব-সুফিবাদে বৌদ্ধ চতুর্কায়ের মতো তন লতিফু, তন কসিফু, তন ফানি ও তন বাকিউ ধারণা পরিকল্পিত হয়েছে। তন্ত্রের ষড়পদ্মের আলোকে কল্পিত হয়েছে ষড়-লতিফা। হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের শরীরী চক্র সুফিতত্ত্বে মোকাম-মঞ্জিল তত্ত্বে রূপান্তর লাভ করেছে।[৩৭]

সুফি কবি শেখ জাহিদ তাঁর *আদ্যপরিচয়* গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশে বলেন:

জ্ঞান জন্মিব যেবা করিব ধেয়ান
ধ্যান না কৈলে তার কিবা গেয়ান।
দান ধ্যান যেবা করএ সমরস
যোগতন্ত্র সিদ্ধাতন্ত্র রাখে সব হএ বশ।
লোহ মোহ কাম ক্রোধ কিছু করিতে না পারে
আপনি অনুগ্রহ তারে করেন করতারে।[৩৮]

যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ধ্যান যার মাধ্যমে শরীর-মন নিয়ন্ত্রিত হয়, একে জ্ঞানের উৎস হিসেবে দেখা হয়েছে শেখ জাহিদের কাব্যে। এই ধ্যানীব্যক্তিকে জাগতিক মোহ, লোভ বা কাম-ক্রোধ বশীভূত করতে পারে না। শেখ জাহিদের উক্ত গ্রন্থের সৃষ্টি পত্তন অংশে মানুষকে যে আল্লাহ আপনার অঙ্গ থেকে নির্মাণ করেছেন তার উল্লেখ আছে। কবীর তার গানে বলছেন:

মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে।
মৈতো তেরে পাসমেঁ।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ,
না কাবে কৈলাস মেঁ।।[৩৯]

অর্থাৎ, পরমাত্মাকে মসজিদ, দেবালয়, কাবা বা কৈলাসে খুঁজে লাভ নেই, তিনি আছেন জীবাত্মার ভেতরেই। আত্মার পরিশুদ্ধিই তার সঙ্গে সম্মিলনের উপায়। বাংলার সুফিবাদে কায়াসাধনা এসেছে আত্মিক শুদ্ধি তথা আত্মাকে বিষয়বোধ থেকে মুক্ত করে, ভক্তের অহংকে নিরোধের মাধ্যমে পরমাত্মায় লীন হবার উপায় হিসেবে।

সুফি কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর *জ্ঞানচৌতিশায়* বলছেন, দেহের ভেতর আছে পরমতত্ত্ব তথা পরমপুরুষ। বৈদিক ব্রহ্মের ধারণা থেকে এই পুরুষের ধারণা ভিন্ন। এই পুরুষের অবস্থান দেহে। দেহের ভেতর সন্ধান করলে তাঁর হদিস পাওয়া যায়। দেহের ভেতর অবস্থিত এই পুরুষকে জ্ঞানগোচর করতে না পারার কারণ কর্মদোষ, অর্থাৎ, দেহের সঠিক করণ নির্বাচনের ব্যর্থতা। আমরা *জ্ঞানচৌতিশায়* নিচের পঙক্তিগুলো দেখতে পাই:

প্রথমে প্রণামি তত্ত্ব পুরুষ পুরাণ
ব্রহ্মা ইন্দ্র যার না পাইল সন্ধান।
...
কায়াতে আছএ তত্ত্ব কায়া গুণনিধি
কায়া লক্ষে লক্ষিলে পাইবা তার শুদ্ধি।
কায়ানলে দহিতে আছএ সেই কাএ
কর্মদোষে পাপ ফল চিনন না যাএ।[৪০]

সৈয়দ সুলতান বর্ণিত এই পুরুষ স্বরূপে গুপ্ত হলেও ব্যক্ত হয়ে আছে দেহকে আশ্রয় করে, যেন কুম্ভের অঙ্গ জলের লক্ষণকে জয় করে নিয়েছে, ফলে কুম্ভ ও জলকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না। তেলের ভেতর যেমন হুতাশন জ্বলে তেমনি দেহের মধ্যে থাকে নিরাকার নিরঞ্জন। মস্তিষ্কের সহস্র দলে নিত্য যে পুরুষ বসে থাকে তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত দেহে।

বাংলার সুফিসাধকগণ এদেশের প্রাচীন তন্ত্র দেহতত্ত্ব-যোগতত্ত্ব ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেহ সম্পর্কিত বিশ্বাস নির্মাণ করেছেন। দেহের ভেতর লিপ্ত হয়ে আছে নিরাকার নিরঞ্জন। দেহের চিহ্ন, করণ ও কর্মকে অবলম্বন করে সেই অচিনের সন্ধান পাওয়া যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের শাস্ত্রীয় উৎস শ্রুতি ও পুরাণ হলেও এর দার্শনিক উৎস শঙ্করাচার্যের জ্ঞানযোগ বিরোধী ভক্তিপন্থী দর্শনধারা যা রামানুজ, বল্লভ, মাধব, নিম্বার্ক প্রমুখের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত সম্পূর্ণ শাস্ত্রনির্ভরও নয়; কেননা এর তত্ত্বসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ রাধার ধারণা এসেছে লৌকিক উৎস থেকে, যার জোরালো কোনো শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই। এই বৈষ্ণব দর্শন শ্রীচৈতন্যের কথা-উপদেশ, তাঁর কর্ম ও জীবননির্ভর। চৈতন্যের শিষ্য ষড়গোস্বামীর একজন শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিত ও তাঁর বাণী অবলম্বনে রচিত *ষট-সন্দর্ভ* গ্রন্থে যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত দেন সেটাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব অনুসারে, জীব-জগৎ কৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ। জগৎ বিশেষ রূপে বিদ্যমান থেকেও কিভাবে তা পরম হতে পারে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে। শক্তি ও শক্তিমান পরস্পর থেকে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন। বিশেষ ও নির্বিশেষের এই সম্পর্ক মানবের জ্ঞানগোচর নয়, মানুষের পক্ষে এই সম্পর্কের স্বরূপ অচিন্তনীয়। বিশেষ ও পরমের সত্তাতাত্ত্বিক সম্পর্ককে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত এভাবে অজ্ঞেয়বাদ দিয়ে আড়াল করেছে।

গৌড়ীয় মতে, শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ রূপ দিয়ে জগতে অস্তিত্ব, চেতনা ও আনন্দকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা রাধাকেও এই সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাধাকে অঙ্গীকৃত করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির ভেতর। বলা হয়েছে, রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনীস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ। ভক্তি বা প্রেমের উৎসে তাই রাধাতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভক্তকুলের জন্য রাধা হয়ে উঠেছে প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। যদিও রাধা কোনো শাস্ত্রীয় দেবী নন। রাধা লৌকিক দেবী এবং তাঁকে নিয়ে যে পুরাণগুলো রচিত হয় তা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ নবম শতকের পরে রচিত বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রের একটি সূক্তকে অবলম্বন করে রাধাতত্ত্বের বিস্তার ঘটান।[৪১] ভক্তি সাধনায় রাধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন হলো, সত্তা হিসেবে দেহ নামক ধারণা বৈষ্ণব মতে কি রূপে নির্মিত হলো? বৈষ্ণব মতে, ভগবান কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির বাইরে কিছুই নাই। জীব তার জীবশক্তিরই অংশ এবং জগৎ সগুণ পরমের প্রকাশ। কিন্তু কৃষ্ণের মায়াশক্তির প্রভাবে জীব আত্মস্বরূপকে বিস্মৃত হয় এবং তার অন্তর্মুখী দৃষ্টি বহির্মুখী দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। এটি কৃষ্ণেরই লীলা। এই মায়া কাটাবার উপায় ভক্তি এবং এই ভক্তির উৎস হ্লাদিনীশক্তির জাগরণ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, ভক্তির উদ্বোধনে দেহের গুরুত্ব সৃষ্টি হয়েছে। কেননা ভক্তি এক প্রকারের রস যার জন্ম হয় ভাব থেকে। পঞ্চভাব থেকে আসে পাঁচ ধরনের রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পেছনে কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন শরীরী অভিনিবেশ, যেমন, শঙ্খধ্বনি শোনা, নীল মেঘ দেখা বা পদ্মফুল দেখা থেকে জন্ম হয় দাস্য ভাবের[৪২]। দাস্য ভাবের অর্থ কৃষ্ণকে প্রভু রূপে গণ্য করে নিজেকে তাঁর দাস ভেবে উপাসনা করা। সাধকের মনে সেই ভাব সৃষ্টিতে উল্লিখিত জাগতিক দৃশ্যগুলো সহায়ক ভূমিকা রাখে।

বৈষ্ণবেরা জীবের সঙ্গে পরমের সম্পর্কের স্বরূপ দিয়ে সামাজিক সম্পর্কগুলোকে ব্যাখ্যা করেছে, সেসবের নির্মাণ করেছে। তাদের কাছে প্রেমভক্তি সাধ্যসাধনার কেন্দ্রীয় বিষয়। ভক্তি দিয়েই পরমকে পাওয়া যাবে। তবে এই ভক্তি হলো শুদ্ধভক্তি। কৃষ্ণের শরণ গ্রহণে যে শুদ্ধভক্তি প্রয়োজন চৈতন্য তা সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দেবার সময় উল্লেখ করেন:

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥[৪৩]

(*চৈতন্য চরিতমালা* মধ্যলীলা: ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ)

শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ আছে চৈতন্যের শিক্ষাষ্টকে। চৈতন্য সংস্কৃত ভাষায় যে আটটি শ্লোক রচনা করেছিলেন, তার একটি শ্লোকে ভক্তিকে হেতু বা উদ্দেশ্যমুক্ত বলে তিনি উল্লেখ করেন:

ন ধনং জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥[৪৪]

শুদ্ধভক্তির ব্যাখ্যায় কৃষ্ণের শরণাগতি বা পরমের উপলব্ধি কোনোকিছুর শর্তাধীন হতে পারবে না। জ্ঞান বা কর্মের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় এই উপলব্ধি চূড়ান্ত বিচারে দেহকে অস্বীকার করে। জীব ও পরমের এই শুদ্ধভক্তির সম্পর্ক-চেতনাকে কেউ কেউ বলেছেন, 'a supernatural order of existence'[৪৫] সুতরাং বলা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ভাব ও রসের জন্মে শরীরকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলেও পরমকে পাওয়া সম্ভব কেবল ভক্তির শুদ্ধতায়, যাতে দেহের বিজড়ন কাম্য নয়। দেহ এখানে কেবলই অবলম্বন।

বাউল মত

বাংলা অঞ্চলে সুফিসাধকদের আগমনে একটি ইসমিক সমাজ-পরিপার্শ্ব নির্মিত হবার পর তার প্রত্যক্ষ ফল ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের উদ্ভব। গোঁড়াপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদ ও উদারপন্থী সুফিবাদের মধ্যপন্থা হিসেবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত হিন্দুসমাজের প্রভাব বলয়কে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রেম-ভক্তির তত্ত্বকে হিন্দুধর্মীয় পরিসরে প্রচার করলেও তাদের সমাজে শ্রেণী ও বর্ণভেদের অবয়বটি অটুট থেকে যায় এবং সামাজিক সাম্যের প্রশ্নটি অন্তঃসারশূন্য পোশাকী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও মানুষের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়। সে-কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবোত্তর কালে বৃহত্তর নদীয়া-কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলে কর্তাভজা, সাহেবধনি, বলরামী, কিশোরীভজনী, সাঁইভজা-এর মতো অসংখ্য ছোট ছোট ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটতে থাকে। বৈষ্ণব পরবর্তীকালে এই ধারায় বাউল মতেরও উদ্ভব। বাউল মতের উদ্ভব সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন :

> যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেছিল আর যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মাচরণে রত ছিল, তারাই কালে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাধারণ উত্তরাধিকার ছিল বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাউল মত গড়ে উঠতে পেরেছে।[৪৬]

একাধিক ধর্মের উত্তরাধিকার থাকায় বাউলদের মধ্যে জাত নিয়ে বৈচারিক মনোভাব পোষণ করতে দেখা যায়। যেকোনো জাতের প্রতি অন্ধ আস্থা ও জাতের বড়াইকে তারা পরিত্যাগ করতে পেরেছেন।

বিভিন্ন ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, কৃত্য ইত্যাদি মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠলে এগুলো ব্যক্তি ও সমাজভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন আনুষ্ঠানিকতাকে ডিঙিয়ে মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাউলদের দেহভিত্তিক চর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাজে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন মানবের দেহে একই প্রাণের অনন্তধারা বয়ে চলেছে। এছাড়া বাংলা অঞ্চলে বহু বছর ধরে বিভিন্ন সাধনধারা যে ভাবকে আশ্রয় করে সাধনা ও কর্মের মাধ্যমে মুক্তি পেতে চেয়েছে, সেই ভাব যদি দেহেরই ভেতর বিরাজ করে, তাহলে মানুষে মানুষে মিলিত হবার পথে জাত এবং ধর্মের বাহ্যিক আচরণীয় কোনো বাধা হতে পারে না। লালনের গান :

একে বহে অনন্তধারা
তুমি আমি নাম বেওয়ারা
ভবের পরে।
লালন বলে আমার আমি
জানলে বাধা যেত দূরে।
সাঁইর লীলা বুঝবি খ্যাপা
কেমন করে![৪৭]

বাউলধর্ম দেহাত্মবাদী। দেহের বাইরে আত্মা বা পরমাত্মা বলে কোনো সত্তাকে বাউল মত স্বীকার করে না। দেহে যে আত্মার স্থিতি রয়েছে তা বস্তুরই বিকাশের ফল। লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহ্ তার একটি গানে স্পষ্ট করেই সে-কথা বলেছেন :

বস্তুকেই আত্মা বলা যায়।
আত্মা কোনো অলৌকিক কিছু নয়॥
বিভিন্ন বস্তু সমন্বয়ে
আত্মার বিকাশ হয়ে
জীবন রূপ সে পেয়ে,
জীবেতে রয়॥

(*বাংলার বাউল ও বাউলগান:* ৩৭৮ নং গান)

দুদ্দু শাহ স্পষ্ট উচ্চারণে বলছেন, আত্মা এবং জীবন বস্তুর বিকাশের ফল। আত্মার তত্ত্বে রহস্যবাদের স্থান নেই। অন্যদিকে, সাকার দেহ বা রূপ ছাড়া নিরাকারের যে স্থিতি নাই, সে-কথা লালন বলেছেন একটি গানে :

নিরাকার রয় অচিন দেশে
আকার ছাড়া চলে না সে।
নিরান্ত সেই অন্ত যার নাই
যা ভাবে তাই হয়।

(*বাংলার বাউল ও বাউলগান*: পৃ. ৩৪৫)

অর্থাৎ, নিরাকারের ভেতর সব সময় অচেনার রূপায়ণ হতে থাকে। আকার বা দেহের ভেতর দিয়ে যে অনন্তের বহমানতা, অনন্ত বলেই যেকোনো নতুন সম্ভাবনা ও নতুন সত্যকে তা সম্ভব করে তুলতে পারে।

লালন ও অন্যান্য বাউল সাধক সুফি ঐতিহ্য থেকে যে নূরতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব ও আজাজিলতত্ত্ব গ্রহণ করেন, সে-সব থেকেও এই ধারণা পাওয়া যায় যে, পরম আছে দেহেরই ভেতর। লালন বলেন, আদম হলো অধরকে ধরার সুতা। আদম সৃষ্টি করার পর, তার কলবে আল্লা রুহু হয়ে নিজেই গিয়ে বসেছেন। নূরতত্ত্বে বলা হয়, আল্লার নূরে নবী, নবীর নূরে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আজাজিলতত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহ যখন আদমকে সিজদা করতে বলেছেন ফেরেশতাদের মধ্যে তাতে একটি আপাত স্ববিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে নিপতিত হয়েছে আজাজিলও। কেননা তাকে একই সঙ্গে আল্লার একত্ব বা তাওহীদের ঘোষণার প্রতি অনুগত থাকতে হয়, আবার আদমকেও সিজদা দিতে হয়। স্ববিরোধ দূর হয় যদি আদমে আর আল্লায় কোনো ভেদ করা না হয়। আল্লাহর সিজদার নির্দেশকে বাউলগণও একই অর্থে গ্রহণ করেছেন। বাউলেরা দেখেছেন, দেহ বা সাকার রূপের ভেতর পরমের নিরন্তর প্রবাহ চলেছে। দেহের ভেতরের এই ভাবকে জানাই আত্মতত্ত্বের গোড়ার দিক। দেহ তাই বাউলদের কাছে আত্মোপলব্ধির সোপান। দেহের বিকাশকে বুঝতে পারাই জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান অধিগত করার উপায়।

বাউলেরা দেহাধারে নিরন্তর বয়ে চলা নিরঞ্জনকে 'সহজ' বলেছেন। তা মানবের বিকাশের চূড়ান্ত সম্ভাবনা, তাকে ঈশ্বর না বলে বলা হয়েছে মানুষ। রূপের ব্যক্তি-মানুষের ভেতর স্বরূপের 'সহজ-মানুষ'কে একটা নিরিখ করে তুলেছেন বাউলেরা। সেই কাঙ্ক্ষিত স্বরূপকে পাবার লক্ষ্যেই তারা 'মানুষ ভজনা' করেন।

২.

দেহ-সম্পর্কিত ধারণার নির্মাণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গকে সামনে আনে; একটি হলো, আত্মসত্তা আর অন্যটি হলো, এই আত্মসত্তার মুক্তি। আত্মসত্তা সম্পর্কিত বিশ্বাসের ভেদ বাংলার ভাবুক গোষ্ঠীগুলোকে সত্তার মুক্তির ধারণাতেও পরস্পর থেকে আলাদা করেছে।

আত্মসত্তা কথাটি বললে যা বোঝায়, প্রশ্ন ওঠে, সেই আত্মসত্তা কার? যে চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ বা আশা নিয়ে আত্মসত্তা বা চেতনার নির্মাণ, সেসব চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ বা আশা কে করেন? অর্থাৎ, মুক্তির জন্য যে সাধনা, সেই মুক্তি কার? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এমন এক সত্তার কল্পনা করা হয়ে থাকে যেকোনো একজন কর্তা এবং বিভিন্ন অর্থে (meaning) ও তাৎপর্যের উৎস। কিন্তু আত্মসত্তাকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার যুক্তিও রয়েছে, অর্থাৎ, আত্মসত্তা এমন একটি নির্মাণ যা একইসঙ্গে প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ও প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদিত হয়।[৪৮] বাংলার ভাবুক সম্প্রদায়গুলোর দেহ সম্পর্কিত ধারণা থেকে এই আত্মসত্তার নির্মাণের ইশারা পাওয়া যায় এবং এই নির্মাণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একেক রকম।

কৃষিজীবী সমাজে জন্ম নেওয়া তন্ত্রমত দেহের বাইরে থাকা কোনো অধিদৈবতকে স্বীকার করেনি। তন্ত্র অনুসারীরা প্রাণ ও আত্মাকে দেহ-নির্ভর বলে বিশ্বাস করেন। তান্ত্রিকদের কাছে প্রাণ, মন ও চেতনা দেহেরই নানা ধরন। ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের ধারণায় মানবদেহ হয়ে পড়েছে ব্রহ্মাণ্ডেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। ধরিত্রীর শক্তি 'কুণ্ডলিনী' নিহিত আছে মানবদেহে। এসব বিশ্বাস মানবসত্তাকে অসীম সম্ভাবনার আকর করে তুলেছে। তন্ত্রমতে, আত্মসত্তার ধারণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, যে আত্মসচেতনতা থেকে আত্মার বোধ জন্মে, সেই আত্মচেতনা দেহ-নির্ভর। আবার, যে দেহের শর্ত দিয়ে আত্মসত্তার সৃষ্টি আত্মসত্তা সেই দেহের সীমাকেই ডিঙিয়ে যেতে চায়। ব্যক্তির পারঙ্গমতার সীমাকে ছাড়িয়ে যাবার এই চেষ্টারই নাম আত্মঅতিক্রম। এর ভেতর দিয়েই ঘটবে ব্যক্তির মুক্তি। তার এই মুক্তিও দেহকে আশ্রয় করেই। দেহের ভেতরে থাকা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে সাধক মুক্তির পথে অগ্রসর হন। সাধক যখন পূর্ণভাবে এই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারেন তখন তিনি পূর্ণহন্তা অবস্থায় পৌঁছান। তান্ত্রিকদের আত্মসত্তার ধারণা যেমন দেহস্থিত নাড়ি, চক্র, সুপ্তশক্তি ইত্যাদির একটি ব্যবস্থা দিয়ে গড়া, তেমনি ওই ব্যবস্থার সাপেক্ষে সৃষ্ট আত্মসচেতন কর্তার মুক্তিও লৌকিক শর্ত-নির্ভর। কায়াসাধনা বা দেহের ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই সে মুক্তি পায়। তন্ত্রমতে, ব্যক্তির মুক্তি বিষয়ের বিশুদ্ধি দিয়ে নয় বরং বিষয়ের যুক্ততা দিয়ে, বিষয়ের ভেতর দিয়ে।

উপনিষদের বেশির ভাগ ঋষি এবং গীতার ভাষ্য অনুসারে, দেহ অনিত্য এবং আত্মা নিত্য। এ থেকে আত্মসত্তার যে ধারণা তৈরি হয় তা হলো, অনিত্য দেহ ও নিত্য আত্মার এক বন্ধন। দেহে যে আত্মার বাস তাকে পরমাত্মা থেকে আলাদা জ্ঞান করার ভেতর দিয়ে আত্ম-বোধের উদ্ভব। ব্রহ্মসূত্র অনুযায়ী, ব্যক্তিসত্তার উদ্ভব যেহেতু পরমসত্তা থেকে তাই ব্যক্তিসত্তা প্রধান হতে পারে না, পরমসত্তাই তার কারণ। ব্যক্তির মধ্যে যে নিজত্বের বোধ জন্মে, সেটা হয় অজ্ঞতাপ্রসূত।[৪৯] আসলে নিজ দেহে থাকা নিত্য আত্মা আর পরমাত্মায় ভেদ নেই, এমন কি অন্য ব্যক্তির দেহস্থিত আত্মার সঙ্গেও নয়। আত্মাই ব্রহ্ম, এমন উক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় উপনিষদে। একই পরমের অবস্থান সকল দেহে। আত্মার বোধ নির্দেশ করে নিত্য আত্মাকে, দেহকে নয়। দেহই আত্মা— এমন ধারণাকে বর্জন করেছেন উপনিষদের ঋষিগণ। তবে নিজ দেহে যে নিত্য আত্মা বিরাজ করে তাকে উপলব্ধি করতে হয় নিখিল পরমাত্মা বলে। তবেই অপার শান্তি লাভ হয়।

একই সঙ্গে সাধক পরমাত্মায় লীন হতে পারেন। এই পরমাত্মায় লীন হবার ব্যাপারটি ঘটে চৈতন্যের শুদ্ধতায়। এই শুদ্ধচৈতন্য ব্যাখ্যাতীত, কেননা স্থান-কাল বা প্রসঙ্গ-নির্ভরতা ছাড়া চৈতনের ধারণাই অসম্ভব।

গীতার ভাষ্যে গুণ ও কর্ম প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত এবং নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়ার ভেতর দিয়ে সাধক মুক্তিলাভ করেন। এই মুক্তি প্রকৃতি নির্ভর। যেহেতু কর্ম ও গুণ আত্মাকে জড়িত করে না, কাজেই মুক্তির প্রশ্নে দেহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলে দেহাতিরিক্ত আত্মার যে বিমূর্তায়ন উপনিষদে লক্ষণীয় তা সাধকদের জন্য ভয়, ভরসা ও মুক্তির প্রশ্নকে লোক-জগৎ বা শর্ত-নির্ভরতা থেকে সরিয়ে নিয়েছে। ব্যক্তি তার আত্মা বা চৈতন্যকে বিশুদ্ধ পরমাত্মা বলে উপলব্ধি কি করে করতে পারে? এটি একটি যৌক্তিক প্রশ্ন, কেননা চৈতন্য বলে যে প্রপঞ্চ রয়েছে তা প্রসঙ্গ-নির্ভরতা বা জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া অসম্ভব।

বৌদ্ধ মাধ্যমিক ধারার দার্শনিক শান্তরক্ষিত একক ব্যক্তিসত্তার ধারণাকেই অস্বীকার করেন। তিনি তার না-এক না-বহু (neither one nor many) যুক্তি ব্যবহার করে অনন্য ব্যক্তিসত্তার ধারণা খারিজ করে দেন। তিনি বলেন, "এটা স্পষ্টভাবে বোধগম্য যে, ব্যক্তির এক বা বহুত্বের প্রকৃতি নেই, যেহেতু এই ব্যক্তিকে ক্ষণস্থায়ী বা অ-ক্ষণস্থায়ী কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না।" (*মাধ্যমিকালঙ্কার:* ৯) শান্তরক্ষিত তাঁর *মাধ্যমিকালঙ্কারবৃত্তি* গ্রন্থে যুক্তি প্রদান করেন এভাবে: অন্তর্গতভাবে একক ব্যক্তিসত্তার ধারণাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না এজন্য যে, তা যদি সময়ের অধীন হয় তবে অবশ্যই একেক মুহূর্তে তার মধ্যে নতুন নতুন রূপের আবির্ভাব হবে। সুতরাং, তা আর নিত্য বা একক থাকবে না। সুতরাং, যেহেতু তা একও নয় কাজেই তা বহুও হতে পারে না। যাকে এক বা বহু কোনো রূপেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না তা অবশ্যই শূন্যস্বভাবের।[৫০] এভাবে, শান্তরক্ষিত দেখান, যাকে আমরা অনন্য কর্তাসত্তারূপে দেখি তার কোনো অস্তিত্ব নেই। মাধ্যমিক ধারার দার্শনিকগণ পরমার্থ সত্যের এই শূন্যরূপ উপলব্ধির ভেতর দিয়ে মুক্তির পথ সৃষ্টি করেন।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতে, চেতনার কর্তারূপ জীবদেহকে জড় বা আত্মা কোনোটাই বলা যায় না। কোনো কোনো চর্যায় এটা স্পষ্ট যে, ইন্দ্রিয় সংবেদন থেকেই বিকল্পাত্মক জগৎ প্রতিভাসিত। ইন্দ্রিয়ের সাড়া থেকে যে চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে তা থেকেই কাল বা সময়ের জন্ম। এই কাল চেতনা নির্ভর। ব্যক্তিসত্তাও পঞ্চস্কন্ধের ফল। কাজেই স্কন্ধবিয়োগ ঘটলেই সাধকের মুক্তি। মুক্তির শর্তগুলো, দেহের মধ্যেই আছে। শূন্যতা ও করুণার উৎস এই দেহ। যে সহজাবস্থায় চিত্ত-নিরোধ ও আনন্দের উদ্ভব ঘটে তা দৈহিক অবস্থা। সুতরাং, আত্মসত্তা জীবদেহের প্রসঙ্গের বাইরে বেরুতে পারে না।

সহজিয়াগণ যে অদ্বৈতসিদ্ধিকে মুক্তি বলে গণ্য করেছেন তাতে ঐশ্বরিকতা নেই। ব্রহ্মবাদীদের ভয়-ভরসার উৎসরূপ কোনো ঈশ্বর বা পরমসত্তার ধারণা সহজিয়া মতে নেই। পারিপার্শ্বিক

জগৎকে চেতনার ভেতর রোধ করে যে প্রভাস্বর শূন্যাবস্থায় পৌঁছাবার কথা সহজিয়ারা বলেন, তাকে কোনো কোনো চর্যাকার ব্রহ্মময়তা অনুভবের অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন এবং ওই অদ্বৈতাবস্থা লৌকিক জগৎকে মায়া ভাবতে প্ররোচিত করেছে।

মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে মরমী একত্ব প্রতিষ্ঠায় আস্থা স্থাপন করেন তাঁরা সুফি। সুফি মরমী ভাবুকেরা সাধনার মাধ্যমে আত্মসত্তাকে স্বর্গীয় সত্তায় উন্নীত করতে চান। আত্মসত্তা সম্পর্কিত তাঁদের মত সারসত্তাবাদী, (essentialist) অর্থাৎ, ব্যক্তির কর্তাসত্তার মূলে আছে জীবাত্মা যা নিত্য ও স্বর্গীয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন, নিজ আত্মা পরমাত্মারই অংশ। আত্মসত্তার বোধ বা অহং এর বিলোপ ছাড়া পরমাত্মায় লীন হওয়া যাবে না। অহংই পরমাত্মার সঙ্গে পৃথকত্ববোধের জন্য দায়ী। আর এই অহং সক্রিয় হয় ইন্দ্রিয়তাড়িত বিষয়বাসনা দিয়ে।

মুক্তির প্রশ্নে সুফি সাধকেরা আত্মকেই হারাতে চান। এই অবলুপ্তি ঘটতে পারে জীবদ্দশাতেই, তবে এটি ঘটে ভাবগত অর্থে। ইন্দ্রিয়শুদ্ধি এর প্রধান একটি উপায়। এই উপায় অবলম্বন করতে সুফিরা সংসার ত্যাগ করে নির্জনবাস গ্রহণ করেন। মুরাক্বিবাহ, এত্তেকাফ এর মতো নির্জনবাস এই ইন্দ্রিয়শুদ্ধির আনুষ্ঠানিক ধরন। সৈয়দ সুলতান আত্মসত্তার মুক্তির একটি অনন্য পথ তুলে ধরেন তার *জ্ঞানচৌতিশায়*। যেহেতু মানবদেহের সঙ্গে লীন হয়ে থাকে নিরঞ্জন পুরুষ, তাই মানুষ আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে যখন অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে বা মিলিত হয় তখন এর ভেতর দিয়ে নিরাকারের প্রকাশ ঘটে। সৈয়দ সুলতান বলছেন :

মিলাও জীবেত জীব তেজি আপনার
মিল হৈলে যথা যাইব চিন্তহ তাহার।
মনেত আমান দিয়া কর পরিচএ
মন ভঙ্গ না হইলে সর্বত্র উদএ।
...
হারাই আপনা ভেস হের নৈরাকার
হরিষ যথেক পাপ পুণ্য হৈব সার।[৫১]

অর্থাৎ, জীব যদি আপনাকে ত্যাগ করে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন পরস্পরের ভেদ লুপ্ত হয় এবং মনের সঙ্গে যখন মনের পূর্ণ পরিচয় ঘটে তখন এর ভেতর দিয়ে ঘটে নিরাকারের উদয়। এই নিরাকারের উদয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ, ভিন্ন পরিচয়চিহ্নকে লুপ্ত করে দেবে, সেই অবস্থা আনন্দ ও পুণ্যময়। এটাই মুক্তির অবস্থা।

ভারতীয় কায়াসাধনার আদলে বাংলার সুফিবাদে মোকাম-মঞ্জিল, হাল, লতিফা ইত্যাদি যে সমস্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে সেসব আত্মবিলোপ বা আত্মিক শুদ্ধি অর্জনের শরীরী উপায়গুলোর সঙ্গে যুক্ত। সুফিদের আত্মবিলোপকে শূন্যবাদ (nihilism) বলা যায় না। কেননা আত্মসত্তার বিলোপ মানে এখানে নিজ সত্তাকে অস্বীকার করা নয়, বরং তাকে বিশ্বসত্তায় উন্নীত করা। তবে ব্যক্তির

এই পরমমুখীনতা মানবমুখীনতা নয়। পরমকে অপরের ভেতর পাবার সাধনা বাউলেরা করেছেন, সুফিরা ওই পথে যাননি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন জীবজগৎ পরমসত্তার জীব-শক্তির অংশ। জীব হিসেবে ব্যক্তিসত্তার নিজত্ব আসলে অবিদ্যাজাত। কেননা ব্যক্তির অন্তর্মুখী দৃষ্টি মায়ায় আচ্ছন্ন হলে তা বহির্মুখী হয়। সে আত্মবিস্মৃত হয়। যদিও এই অবিদ্যা বা মায়া সৃষ্টি হওয়া ভগবান কৃষ্ণেরই কাজ। তাহলে, ব্যক্তির মধ্যে আত্মসত্তা বা আত্মবোধের পেছনে পরমের জীব ও মায়াশক্তি— এই দুইয়েরই ভূমিকা রয়েছে। আর বিশ্বের সকল কিছুর অস্তিত্বরক্ষা, চিন্ময়রূপে স্থিতি ও আনন্দময় হওয়া পরমের স্বরূপ শক্তির কাজ। কাজেই ব্যক্তিসত্তা পরম-নির্দিষ্ট, চূড়ান্তবিচারে। এমনকি আত্মসত্তার নিজত্বের বোধও পরমের মায়াশক্তিজাত।

বৈষ্ণবেরা মানুষের সামাজিক ও পারমার্থিক মুক্তির ধারণা থেকেও পরমের অনুষঙ্গকে বাদ দেননি। যে মায়াপাশ আত্মবোধের উৎস, নিজ স্বরূপবিস্মৃতির উৎস, তাকে কাটানো সম্ভব হ্লাদিনীশক্তির জাগরণে, রাধারূপের উদ্বোধনে মায়া কাটবে। শুদ্ধভক্তি থেকে ভক্তের হৃদয়ে পরমের সান্নিধ্য লাভ ঘটবে। বৈষ্ণবের ভগবান প্রাপ্তি তাই প্রতিদিনের ধুলামাটির পৃথিবীতে নয়, নয় শ্রম-ঘাম-দুঃখ-তাপের জগতে; এই প্রাপ্তি ঘটে এক শুদ্ধ বিমূর্ত প্রেমের ভেতর দিয়ে।

বাউলেরা দেহাত্মবাদী। প্রাচীন তন্ত্রের দেহাত্মবাদ তাঁরা যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব, সুফি ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের তত্ত্বভাণ্ডারকেও তারা বৈচারিক দৃষ্টি নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন এবং তাঁরা পৌঁছেছেন এমন এক সমন্বয়ী মানবতন্ত্রের দিকে, মানুষের সমাজসংগঠনের অন্তর্গত তত্ত্বভাবনা হিসেবে যা অনন্য। লক্ষণীয় যে, আধিপত্যবাদী বৈদিক মত ও শাস্ত্রীয় ইসলামকে তাঁরা নিজেদের তত্ত্বভাবনায় গ্রহণ করেননি।

বাউলের দেহাত্মবাদ থেকে আত্মসত্তার এমন এক ধারণা পাওয়া যায়, যাতে দেহজাত আত্মা যেমন বিদ্যমান তেমনি আছে এক কর্তাসত্তা যে আত্ম-সচেতন এবং যার আছে আত্ম-অতিক্রমেরও ক্ষমতা। লালন তাঁর একটি গানে এই খেদ ব্যক্ত করেছেন যে, ব্যক্তিকে আত্মারূপে অন্বেষণ করা হয়, কিন্তু তার ভেতরে যে কর্তাসত্তা বাস করে তার খোঁজ নেওয়া হয় না।[৫২] অথচ এই কর্তারূপই মানবের বিকাশের কারিগর।

বাউলের আত্মতত্ত্ব নিজ দেহস্থিত আত্মাকে পরম হিসেবে উপলব্ধির তত্ত্ব। সাধক এই উপলব্ধি দেহের ভেতর দিয়েই করেন। কারণ দেহের বাইরে এই নিরাকারের কোনো ঠাঁই নেই।

সুফি, বৈষ্ণব, বেদান্তের পরম ও ব্রহ্মের সঙ্গে বাউলের সহজ বা সাঁই এর তফাৎ এখানে যে, বাউলের সহজ স্বরূপের (সাঁই, মানুষ রতন বা মনের মানুষ) অবস্থান মানুষের ভেতর এবং একারণে মানুষই তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু। যে সহজ স্বরূপ মানুষের ভেতর বাস করে সেও মানুষরূপ, তবে এক ভাবগত মানুষ যা মানবের সমস্ত সম্ভাবনাকে ধারণ করে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতো এই সহজকে দেহের বিকাশ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হয়। দেহাত্মবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের প্রভেদ এখানেই। দেহনির্ভর আত্মার ধারণা ও দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণা দুটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।

আমরা দেখতে পাই দেহাত্মবাদীরা যেহেতু দেহের ভেতরেই পরমকে অধিষ্ঠিত দেখেন সেকারণে মানুষকে তাঁরা মহিমান্বিত করে তোলেন এবং মানুষ ভজনার তাগাদা অনুভব করেন। প্রাচীন তন্ত্রের দেহাত্মবাদী উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথ ও বাউলগণ। অন্যদিকে, বৈদিক অধ্যাত্মবাদী ধারাটি গীতা, উপনিষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সামাজিক ও আত্মমুক্তির প্রশ্নে দেহাত্মবাদীরা জাগতিকতা ও প্রাত্যহিক জীবনাচারকে যে মূল্য দিয়েছে অধ্যাত্মবাদী ধারা তা দেয়নি। দেহাতিরিক্ত পরমকে পেতে এবং নিজের সত্তাকে পরমার্থিক করে তুলতে তারা বরং জাগতিকতাকে পাশ কাটাতে চেয়েছে। তাদের সাধন-ধারা ও জীবনাচারের মধ্যেও তার প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

তথ্যনির্দেশ

[১] বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম*, কলকাতা: আনন্দ, ১৩৯৫, পৃ. ১৮
[২] শ্রীঅরবিন্দ, *শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা*, (পণ্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ১৯৬৯), পৃ. ৮০
[৩] অতুল সুর, *হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৪, পৃ. ৫১
[৪] প্রাগুক্ত
[৫] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬, পৃ. ৪৮১
[৬] কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, *বঙ্গীয় শব্দার্থ কোষ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: ভাষাবিন্যাস, আশ্বিন ১৪১৬, পৃ. ৪৫৮
[৭] S.C. Banerji, *A Brief History of Tantra Literature*, Calcutta: Naya Prokash, 1988, pp. 1-2
[৮] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'শাক্তধর্ম ও তন্ত্র' *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, রায়হান রাইন (সম্পাদনা), ঢাকা: সংবেদ, ২০০৯, পৃ. ৪২
[৯] অতুল সুর, প্রাগুক্ত
[১০] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রচনাবলী ২: ২৮৭', *লোকায়ত দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২
[১১] প্রাগুক্ত, 'রচনাবলী ২: ২৯২', *লোকায়ত দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪
[১২] S.C. Banerji, *Tantra in Bengal*, New Delhi: Manohar, 1992, p. 5
[১৩] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৪৮৯
[১৪] গোপীনাথ কবিরাজ, 'কুণ্ডলিনীতত্ত্ব', *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০, পৃ. ২৭
[১৫] রাধাগোবিন্দ নাথ, 'উপনিষৎ', *বাঙালির ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
[১৬] প্রাগুক্ত।
[১৭] স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯, পৃ. ১২৪
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
[২০] রাজশেখর বসু, *শ্রমদ্ভগবদ্গীতা*, কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., শ্রাবণ, ১৬৩৮, পৃ.১৭
[২১] দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতাপাঠ', *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯
[২২] প্রাগুক্ত
[২৩] রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *বৌদ্ধ দর্শন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনালয়, ২০০৭, পৃ. ৫
[২৪] উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
[২৬] সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদনা), *চর্যাগীতিকা [বৌদ্ধ গান ও দোহা]*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ঘ

[২৭] Blumenthal, *James, The Ornament of the Middle Way: A Study of the Madhyamaka Thought of Santaraksita*, New York: Snow Lion Publications, 2004, p. 83

[২৮] আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, ঢাকা: পড়ুয়া, ২০০৩, পৃ. ৪০

[২৯] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২, পৃ. ৫৩১

[৩০] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পাদনা), *কবি শুকুর মামুদ বিরচিত গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ. ৮০

[৩১] শেখ ফয়জুল্লা, *গোরক্ষ-বিজয়*, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩২৪), পৃ. ১২১-১২২

[৩২] আহমদ শরীফ, 'বাংলার সুফিসাধনা', *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, রায়হান রাইন (সম্পাদনা), সংবেদ: ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৪৪

[৩৩] ভোলানাথ নাথ, 'নাথধর্ম', *বাঙালির ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

[৩৪] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, ৫৩২

[৩৫] মুহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ১৫৬

[৩৬] Edwards, Paul. (ed. in chief), *The Encyclopedia of Philosophy,* Vol 7 and 8, New York: Macmillan Publishing Co., 1967, p. 41

[৩৭] আহমদ শরীফ, 'বাংলার সুফিসাধনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-৩৮

[৩৮] উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

[৩৯] ক্ষিতিমোহন সেন, *কবীর*, অখণ্ড আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০০৭, পৃ.২৯-৩০

[৪০] সৈয়দ সুলতান, *নবীবংশ* [দ্বিতীয় খণ্ড], আহমদ শরীফ (সম্পাদনা), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, ৬৬১

[৪১] বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সূক্তটি হলো:

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহনী পরা ॥

(দ্র. সনাতন গোস্বামী, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ. ৯

[৪২] Dimock, Edward C., *The Place of the Hidden Moon*, The University Press of Chicago: Chicago and London, 1966, p. 23

[৪৩] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৯২, পৃ. ২৯৫

[৪৪] *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর অন্ত্যলীলা: বিংশ পরিচ্ছেদ (পৃ. ৫০৭) শ্লোকটির অর্থ করা হয়েছে:

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধ ভক্তি' দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥

[৪৫] B. G. Ray, 'Rabindranath Tagore', in *Indian Thought*, ed. by Donald H. Bishop, New Delhi: Wiley Eastern P.L., 1975, p. 338

[৪৬] আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[৪৭] আহমাদ মাযহার ও পারভেজ হোসেন, *লালন ফকির পাঠ ও বিবেচনা*, সংবেদ: ২০০৮, পৃ.১৯৭

[৪৮] Macey, David, *The Penguin Dictionary of Critical Theory*, London: Penguin Books, p. 368

[৪৯] Sivananda, Sri Swami (text, trans. and commentary by), *Brahma Sutras*, India: Dievine Life Society, 2008, p. 27

[৫০] Blumenthal, James, Ibid., p. 72

[৫১] সৈয়দ সুলতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৫-৬৬৬

[৫২] ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ) (সম্পাদিত), *লালন-সঙ্গীত* (প্রথম খণ্ড), ছেঁউড়িয়া: লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, ১৯৯৩, পৃ. ২৩৬

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

আহসান হাবীবের কবিতা : শব্দানুষঙ্গ

মোহাম্মদ রেজাউল করিম তালুকদার*

সারসংক্ষেপ

কবিতার অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে বিচিত্র মত ও পথের উপস্থিতিকে একটি সার্থক কবিতার সৌরভ ও সমৃদ্ধির দ্যোতক হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এই শিল্পমাধ্যমে লেখা ও দেখার দৃষ্টির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে, কবিতা শব্দের শরীরে ভর দিয়েই নিজের অস্তিত্বের গৌরব ঘোষণা করে। এ-কারণেই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর আশ্রয়ে একজন কবির শিল্পবোধ ও জীবনদৃষ্টির গতিবিধি নিরূপণ করা সম্ভব। বর্তমান নিবন্ধে আহসান হাবীবের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অনুষঙ্গে তাঁর শিল্পচিন্তা ও জীবনভাবনার স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। হাবীবের কবিতা ও গদ্যের আশ্রয়ে শব্দানুষঙ্গে তাঁর বিবেচনা অনুধাবনের মাধ্যমে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের সৌরভ ও গৌরব সনাক্ত করার প্রয়াস এই রচনায় লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী ভাব প্রকাশের অনুকূল আবহে উপস্থাপিত হয়েছে কি-না, এই নিবন্ধে তা-ও অনুসন্ধানের চেষ্টা থাকবে। কবিতার সদর-অন্দর বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবি হিসেবে আহসান হাবীবের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনই এই নিবন্ধের লক্ষ্য।

কবিতা শব্দের মাধ্যমেই স্রষ্টার অন্তর্গত অনুভবকে পাঠকের প্রাণে পৌঁছে দেয়। একজন আত্মসচেতন কবি শব্দের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে যুক্ত করেন অনাস্বাদিত অনুরণন, যা পরিচিত শব্দের শরীরে দ্যুতি ও গতি সঞ্চার করে। সৈয়দ আলী আহসান ব্যাখ্যা করেছেন যে, কবিব্যক্তিত্বের স্পর্শে শব্দ তার নির্জনতা ভেঙে লাভ করে অর্থ-শক্তি এবং এই শক্তি ধ্বনির মাধ্যমে বাক্যে ছড়িয়ে পড়ে।[১] এমনকি কবিতার সংজ্ঞার্থ নিরূপণের চেষ্টায়ও আমরা শব্দকেই সর্বাগ্রে বিবেচনার প্রয়াস দেখি। শব্দের সুশৃঙ্খল বিন্যাসেই যে নির্মিত হয় কবিতার দেহ এবং এই দেহের গভীরেই সুপ্ত থাকে কবিপ্রতিভার অভিজ্ঞতার নির্যাস—এ বিষয়ে আমাদের বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দ মোটামুটি একমত হয়েছেন। কখনো কখনো শব্দকে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমেও কবিতা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই বিশৃঙ্খলাও প্রতিভাবান কবির পরিকল্পনাপ্রসূত। কবিতাকে পাঠক বা সমালোচক যেভাবেই পাঠ, বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করেন না কেন, সেখানে শব্দের উপস্থিতি এবং কখনো কখনো এর আধিপত্যও সুপ্রকাশিত। তাই একজন কবির আত্মখচিত শিল্পদৃষ্টি ও প্রকরণকলায় শব্দের স্বরূপ ও স্বভাব চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের আর্থ-পরিধি অভিধানের শাসন কিংবা নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কবিচিত্তের উষ্ণতা কিংবা আর্দ্রতায় শব্দের নবজন্ম ঘটে বলেই কবিতার কাছে আমাদের প্রত্যাশার দ্বার

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

অবারিত। শব্দশরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সক্ষমতাকেই রবীন্দ্রনাথ কবিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, 'কবিতা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।'[২] এই ভঙ্গি নিশ্চয়ই চোখ ভোলানোর অপপ্রয়াস নয়, তা কবির করণকৌশলগত বিশেষত্বের স্মারক। এখানে কবিতায় প্রকাশিত তথ্য ও সত্যের সম্পর্কসূত্র নির্দেশের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু অন্যত্র তিনি কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন এইভাবে :

> শব্দ তৈরি হয়েছে ঠিকটা-কী জানাবার জন্যে; সেইজন্যে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক-যেন-কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না।[৩]

শব্দের অর্থ বাড়ানো বা বাঁকানোর মধ্যে কবিত্বের শক্তি নিহিত সন্দেহ নেই, তবে এই কাজটি কতিপয় নির্বাচিত শব্দের শরীরে ও সজ্জায়ই সম্পন্ন করেন একজন কবি। এই নির্বাচন-প্রক্রিয়ার মধ্যেই মুদ্রিত থাকে একজন কবির মানসলোকের মৌল প্রবণতা। 'এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর-এক দিকে অস্পষ্ট কথারও।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে ভাষার যে প্রবণতায় অস্পষ্টের প্রতি পক্ষপাত প্রবল হয়ে ওঠে, সেখানেই কবিত্বের লক্ষণ সুপ্রকাশিত বলে আমাদের ধারণা জন্মে, এবং জীবনানন্দের ভাষায়, তখনই 'কবিতা মানসের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে—তাকে নির্মলতর করে তুলবার জন্য—কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে।'[৪] অস্পষ্টের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলা, পাঠকচিত্তের বিপর্যয় ঘটানো কিংবা নির্মল করে তোলার অভিপ্রায়টি শেষ পর্যন্ত কতিপয় শব্দশরীর অবলম্বনেই সংহত হতে চায়।

কবিতায় শব্দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রাচীন ভারতীয় রসশাস্ত্রের শরণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের গতিবিধি বিবেচনায় আনলে কবিতার শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ইতিহাসকে কবিতার ইতিহাসের সমান বয়সী বললেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রীক কাব্যতত্ত্বও আমাদের অনুধাবনকে সেই পথেই পরিচালনা করতে চায়। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচক লিখেছেন :

> প্রাচীন রসশাস্ত্রে কবিতার শব্দালোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাত্ত্বিকগণ যে 'নাদতত্ত্ব' নির্দেশ করেন—'শব্দই ব্রহ্ম', তা সৃষ্টিতত্ত্বের সমার্থক। এই 'নাদতত্ত্ব'ই আনন্দবর্ধনের ভাষায় 'ব্যঙ্গার্থ' যা প্রকৃতপক্ষে ভাষার সৌকর্যের [articulation] সঙ্গে বিজড়িত। ধ্বনিকে বলা হয়েছে ভাষার সংবর্তন ও বিন্যাস, তা অনিবার্য ও স্বতঃক্রিয়। শব্দের পারস্পরিক অবস্থান ও সন্নিধান থেকেই জন্ম নেয় উক্ত অর্থস্তরের বহুমাত্রিকতা। গ্রিক কাব্যতত্ত্বেও শাব্দিক বিন্যাসই শেষ লক্ষ্য, তবে সেখানে 'ধ্বন্যালোক'-এর মতো ব্যঞ্জনাকে অন্তিক বলে নির্দেশ করা হয়নি।[৫]

আহসান হাবীবকে (১৯১৭-১৯৮৫) নিশ্চয়ই শব্দেশ্বরবাদী কবি বলা যাবে না, যদিও শব্দের হৃৎপিণ্ডেই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার সারাৎসার ঢেলে দিতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী পাঠককে অভিধানমুখি করে না, বরং হৃদয়ের নিকটবর্তী করে তোলে। হাবীবের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ বিষয়ে একজন সমালোচকের বিবেচনা স্মরণ করা যাক :

> প্রচলিত শব্দই আহসান হাবীবের কাব্য ভাষা নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সে তৎসম শব্দ তাঁর পাণ্ডিত্যকে জাহির করেনি, তিনি অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সে অর্ধতৎসম শব্দ আমাদের পরিচিত এলাকায় চলাফেরা করে, তিনি তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেছেন, এবং এই তদ্ভব শব্দকে নিয়েই আধুনিক বাংলা ভাষার মূল কারবার। তিনি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে কবিতায় স্থান দিয়েছেন, সে ভাষা সুপ্রযুক্ত। তিনি বিদেশি শব্দ অর্থাৎ ইংরেজি-আরবি-ফারসি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সে শব্দও তাঁর কবিতাকে দুর্বোধ্যতার কঠিন-প্রাচীর-বদ্ধ করেনি।[৬]

মৃদুভাষী ও স্বল্পভাষী কবি হিসেবে পরিচিত আহসান হাবীব নিজের কবিতা সম্পর্কে কথা বলতে স্বস্তি পেতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি সার্থক কবিতা নিজেই নিজের কথা বলতে সক্ষম। তাই তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর গতিবিধি অনুধাবনের জন্য আমরা তাঁর কবিতার ওপরই নির্ভর করতে চাই। তবে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের শক্তি ও সমৃদ্ধি বিষয়ে হাবীবের বিবেচনার প্রকাশ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। এ-প্রসঙ্গে আহসান হাবীবের কবিতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ক. শব্দের বাগানে যাই
বলি, কিছু ফুল দাও
ভ্রমর-সঙ্গীত
দাও কিছু... ('শব্দ ফুল নীলিমা'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)[৭]

খ. দু'চোখে
প্রজ্ঞার আগুন যেন
কণ্ঠস্বর যেন
স্বর্গীয় সংকেতে ঋদ্ধ শব্দাবলি ছড়ায় দু'পাশে। ('আমার সন্তান'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

গ. শব্দের মালায় আমি তোমাকে গাঁথতে চাই—স্বাধীনতা! তুমি
ঘরে-বাইরে এমন উলঝলুল নৃত্যে মেতে আছো, কি আশ্চর্য
আমার কলম
কিছুতেই তোমাকে যে ছুঁতেও পারে না। ('স্বাধীনতা'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ঘ. এখন আমার শব্দাবলি
বুকের মধ্যে গুমরে থাকা শব্দাবলি
পথের পাশে আলোর মালা।
আমার আর্ত শব্দাবলি বোবা বুকের বাইরে এখন
সুনীল আলো জ্বালিয়ে রেখে এখন আমায় দেখাচ্ছে পথ
বাড়ি ফেরার পথ দেখাচ্ছে। ('এখন আমার'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আহসান হাবীব কবিতায় শব্দ ব্যবহারের বিশেষ কোনো নিয়মনীতি বা মানদণ্ডকে গুরুত্ব দেননি। ভাবার্থকে লক্ষ্যভেদী করার প্রয়োজনীয়তাই তাঁর কাছে মুখ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আশায় *বসতি* কাব্যের 'ক্ষমাই প্রার্থনা' কবিতায় আহসান হাবীব ঘোষণা করেছেন : 'শব্দের কাঙাল আমি/কেবল নীরবে/একান্তে দাঁড়াতে পারি/এবং জানাতে পারি/আমার এ অক্ষমতা।' এই অক্ষমতা প্রকাশের মধ্যে কবির স্বভাবসুলভ বিনয় ধরা পড়লেও শব্দের সঙ্গে তাঁর সখ্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের 'এখন আমার' কবিতায় কবি বলেছেন : 'এখন আমার শব্দাবলি/ভাঙা ঘরের চাল ছেয়ে দেয়।' আহসান হাবীব কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে ভাঙা ঘরের চাল পর্যন্ত নিজের অনুভবকে বিস্তৃত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

একজন আধুনিক কবি ভাবকে শৈল্পিক অবয়ব দেওয়ার প্রয়োজনে সাধু-অসাধু, নবীন-প্রবীণ, দেশী-বিদেশী সকল শব্দকেই সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ভাষার বিষয়ে প্রাসঙ্গিকতাকেই কবি একমাত্র মানদণ্ড মনে করেন। আধুনিক শিল্পস্রষ্টার কাছে ভাষা রূপের উপাদান হিসেবেই গৃহীত হয়ে থাকে। তবে সেই ভাবকে সাধারণ পাঠকের ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখতে চাননি আহসান হাবীব। তাই ভাষাকে সরল ও গতিশীল করার দিকে তিনি দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছেন। গদ্য-পদ্যের মিশ্রণকে তিনি তাঁর কাব্যযাত্রার শুরু থেকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। T. S. Eliot এ প্রসঙ্গে বলেছেন, '... and I think that an interaction between prose and verse, like the interaction between language and language, is a condition of vitality in literature.'[৮] কবিতার সঙ্গে গদ্যের মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিশ শতকের তিরিশের দশকের কবিবৃন্দের প্রয়াসকে আহসান হাবীব সার্থকতার সঙ্গে স্বীকরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠী তিরিশের কবিদের শব্দ-সচেতনতা সম্পর্কে বলেছেন :

> বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা।...শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা।...নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ।[৯]

আহসান হাবীবের কবিতায়ও আমরা তিরিশের কবিদের এই প্রবণতাসমূহের সাঙ্গীকরণ লক্ষ্য করব। তাঁর কাব্যযাত্রার শুরু থেকেই তিনি শব্দ-ব্যবহারে সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় তিনি এই ধারা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। বিশেষ করে কথ্য-ক্রিয়াপদ ও কথ্যরীতির সংযোগসাধনে তাঁর কৃতিত্ব চোখে পড়ার মতো। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাক:

ক. সারারাত গুঁতোগুঁতি, সারারাত মুখে মার মার
পরদিন দুপুরেতো মেলে পুরস্কার! ('সৈনিক'/*রাত্রিশেষ*)

খ. আর তো আপনার মাথা তামাক খাই না
নিজে মাখি নিজে খাই কোথাও যাই না। ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)

গ. বিজলি বাতির বোতাম টিপে আমি তৈরি হই
ওর মুখোমুখি হয়ে কিছু বলতে চাই; ('অভ্যাগত'/*সারা দুপুর*)
ঘ. বুদ্ধির চকমকি ঠুকে পথের মশাল
নিজেরাই জ্বেলে নেব, ('বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আমরা'/*আশায় বসতি*)
ঙ. যেতে চাইলেই বলে,
এখন যুদ্ধটুদ্ধ চলছে
এখন জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন ('আমার যাওয়া হয় না'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)
চ. তারপর সমস্ত সংসার কি আন্ধার, হায়রে বাজান। ('দাদাজান বলতেন'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)
ছ. মা নেই, বা'জান গেছে মেলায়, মেলায়
দেখে যান দেখে যান হুর পরীর নাচ'– বলে
সুন্দরালী সারারাত ময়ূর নাচায়। ('কোলাজ'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আহসান হাবীবের কবিতায় কথ্য-ক্রিয়াপদ ও কথ্যরীতির ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব। কবিতাকে সাধারণের কথনকৌশলের নিকটবর্তী করার জন্য তিনি অপ্রচলিত শব্দ পরিহার করেছেন এবং অভিধান-নির্ভরতা থেকে বাইরে থাকতে চেয়েছেন। ভাবনাকে তিনি শব্দের গাম্ভীর্য দিয়ে ভারী করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বাভাবিক শব্দ-বন্ধের আশ্রয়ে ভাব প্রকাশের কারণেই তাঁর কবিতার শরীরে নিরাভরণ সৌন্দর্যের দীপ্তি ধরা পড়েছে।

আহসান হাবীবের কবিতায় ইডিয়ম বা বাগধারার ব্যবহার বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। "কথ্যভাষার 'ইডিয়ম' বা বিশিষ্ট দেশজ রীতির ব্যবহার আধুনিক কবিতার একটি বিশেষ প্রকরণ-রীতি। ইডিয়ম ব্যবহারের ফলে ভাষায় সঞ্চারিত হয় সহজ স্বাভাবিকত্ব।"[১০] আহসান হাবীব ইডিয়মের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কখনো সরাসরি কখনো-বা ইডিয়মকে ভেঙে তাতে তিনি নিজের ইচ্ছের অনুকূল আবহ সঞ্চার করেছেন। বাগ্-বিধির প্রয়োগে কেবল কবির শব্দ-সচেতনতাই প্রকাশিত হয় না, তাতে তাঁর জীবনভাবনারও প্রতিফলন ঘটে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> Idioms arise out of the contacts of daily life. They are the response of the human organism to the elements around it. They reflect the speed of life, the pressure of life, its very essance.[১১]

আহসান হাবীব ইডিয়মের এই শক্তিকে সার্থকতার সঙ্গে কাব্যরূপ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে লোককথা কিংবা লোককাহিনীর চূর্ণ অনুভবকেও তিনি কবিতায় ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এতে পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির উপলব্ধির সম্মিলন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপ পেয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:

ক. লিফ্‌ট্ ক'রব মানে
ওটা একটা কথার কথা।
আমরা হেঁটেই যাব। ('কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি'/*রাত্রিশেষ*)

খ. জ্বি হুজুর একদিন এই দুই হাতে
লড়েছি এগারো হাত কুমীরের সাথে,
গাঙের কুমীর টেনে তুলেছি ডাঙায়
ভেঙেছি বাঘের মাথা এই বাম পায়। ('ছহি জঙ্গেনামা'/*ছায়া হরিণ*)

গ. সহজে পাড়ের কড়ি গুণে দিয়ে
সেই ঢেউয়ে মত্ত এ জীবন; ('স্বজন'/*সারা দুপুর*)

ঘ. তিনি বোকার স্বর্গেই বাস করেন
একথা উপলব্ধি করেন অভিজ্ঞ মোত্তাকিম মুহূর্তেই ('রেখে যাবো'/*সারা দুপুর*)

ঙ. কাকের বাসায় রাখে না নিজের ডিম
অনায়াস-সন্তানের আশা নেই তার ('কাক-কোকিল'/*আশায় বসতি*)

চ. দুধ-সাগরে নাইয়ে দেবো আয়রে খোকন ঘরে আয়! ('মায়ের ডাকের ছড়া'/*আশায় বসতি*)

ছ. চারপাশে রাক্ষসখোক্কস আর
ভূতপ্রেত বসিয়ে কেবল
আতঙ্কে চীৎকার করে ('যখন বিভ্রাট'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আহসান হাবীবের কবিতায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার বহুল নয়, তবে বিচিত্র। তিনি যেমন ইংরেজী শব্দকে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন, সেইসঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দকেও অবলীলায় কাব্যদেহে ধারণ করেছেন। প্রথম পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থসমূহে বিদেশী শব্দের ব্যবহার তেমন চোখে না পড়লেও ধীরে ধীরে তিনি কবিতার ভাবানুষঙ্গের প্রয়োজনেই বিদেশী শব্দভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। তাঁর কবিতা যত বেশী গদ্যভঙ্গির নিকটবর্তী হয়েছে ততই তাতে বেড়েছে বিদেশী শব্দের প্রভাব। বিশেষ করে মানুষের কথ্যভঙ্গিকে কবিতায় ধারণ করার ক্ষেত্রে অন্য ভাষার শব্দকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। নাগরিক জীবনের বিবিধ অনুষঙ্গকে তিনি যখন কাব্যরূপ দিয়েছেন, তখন কথোপকথনে প্রযুক্ত বিবিধ বিদেশী শব্দকে তিনি অবলীলায় গ্রহণ করেছেন। সে-ক্ষেত্রে ইংরেজী শব্দের আধিক্য লক্ষ্য করা যাবে। আবার কবিতার প্রকরণ-কলায় তিনি যখন অন্যকোনো রূপ-এর শরণ নিয়েছেন তাতে প্রযুক্ত হয়েছে প্রচুর বিদেশী শব্দ। *ছায়া হরিণ* কাব্যের 'হক নাম ভরসা' কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যেখানে চিঠির আদলে কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন কবি। জমিদারের শোষণ-নিপীড়নের বিস্তারিত উল্লেখ করে জনৈক মহম্মদ তালেবালি তেরোশ' একান্ন সালে জমিদারকে যে চিঠি লিখেছে, তাতে বিপুল-সংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন কবি:

আদাব সালাম অন্তে সমাচার এই
যে, হুজুর কাল ফজরের অনেক আগেই
তামাম মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে
সহি-সালামতে
এসে নিজের বাটিতে পৌঁছেচি। এখন
সে কারণ
পত্রযোগে শতকোটি সালাম নিবেন
আর সবিশেষ সংবাদাদি পত্রে জানিবেন।

যখন জাহাজঘাটে নেমেছি,
তখন নিশিরাত্রি। মন
কিছুটা ঘাবড়ালো, তবু মালেকের নাম
নিয়ে যখন মাঠের মাঝে এসে নামলাম
দেখলাম আজব ব্যাপার,
বেশুমার
বাতি
আসমানের অতবড় ছাতি
ছেয়ে আছে। আজব রোশনাই
ডেকে কয় কিছু ভয় নাই। ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটিতে আদাব, সালাম, সমাচার, হুজুর, ফজর, তামাম, মুরুব্বী, দোয়া, বরকত, সহি-সালামত, মালেক, আজব, বেশুমার, আসমান, ছাতি, রোশনাই প্রভৃতি-আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার করেছেন কবি। এই কবিতায় ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ থেকে কবির শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বিপুলসংখ্যক বিদেশী শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও অভিধানের সাহায্য ছাড়াই পুরো কবিতাটির পাঠোদ্ধার সম্ভব। এই কবিতায় ব্যবহৃত আরো কিছু আরবী-ফারসী শব্দ : খোয়াব, মকসেদ, হাসেল, সাফ, বেয়াদবী, মাফ, গমগীন্, ফারাগ, নাজেহাল, মেহ্মানদারী, দাওত, বেদেরেগ, বেহ্তর, গোস্বা, কসম, শানাই, জিগরফাটা, গর্দান, জিন্দিগী, শান, আচম্বিতে, ফন্দি ইত্যাদি। একই কাব্যের ছহি 'জঙ্গেনামা' কবিতায়ও প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার করেছেন কবি। এই কবিতায় তিনি মধ্যযুগের পুঁথিসাহিত্যের প্রবণতাকে স্বীকরণ করেছেন। পুঁথিসাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আহসান হাবীবও এই ঐতিহ্যের প্রতি সুবিচার করেছেন কবিতাটিতে। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক:

জ্বি হুজুর, আমি সেই হুজ্জত্ সরদার।
জান নিয়ে বেঁচে আছি পাক-পরওয়ার
খোদাওন্দ করিমের করম ফজলে।
তবে কি না এলাহীর লানতের ফলে
হয়েছে এমন হাল। হাড়-মাংসহীন
আমি সেই খাক্সার হুজ্জত্ কমিন। ('ছহি জঙ্গেনামা'/ছায়া হরিণ)

এই কবিতাংশে আমরা প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি। পুরো কবিতাটিই এ জাতীয় শব্দের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই কবিতায় ব্যবহৃত আরো কিছু আরবী-ফারসী শব্দ: একিন, ফখর, নেজার, মওত, ছিনা, বহর, আগ্, খোদা, ফরজন্দ, বেইমান, বে-এনসাফি, কবুল, ফিকির, নজর, শান, জিন্দিগী, ছবক, জবর, খবর, আছানক, তেজিয়ান, কাতার, গর্দান, আখের, দাদ, হাওয়ান, বেকসুর, ছতর, ইজ্জত, শরম, কাফন, আওলাদ, জারেজার, আজদাহা, গজব ইত্যাদি। আহসান হাবীবের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহেও আরবী-ফারসী শব্দের

ব্যবহার লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারে কবির মুন্সিয়ানার পরিচয় উপরিউক্ত কবিতা দুটিতে মুদ্রিত হয়ে আছে বলেই আমরা মনে করি।

আহসান হাবীবের কবিতায় ইংরেজী শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো। কবির ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দাবলি নাগরিক জীবনের রূপকল্প নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। একই সঙ্গে তা মানুষের কথনভঙ্গির সঙ্গেও সম্পর্কসূত্র রচনা করেছে। কবির ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দও বিশেষভাবে তাঁর কবিতার ভাবানুষঙ্গের অনুগামী। তাই তাঁর কবিতার ইংরেজী শব্দকে আরোপিত মনে হয় না, বরং প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিতকে প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে তা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে:

ক. 'কিউ'য়েতে দাঁড়িয়ে থেকে (রোমান্টিক নাম বটে)
আমরাই 'কিউ' হয়ে যাই। ('সৈনিক'/*রাত্রিশেষ*)

খ. আপনি ত' বেশ ব'লে বেড়ান
যা কিছু হোক থাকতে হবে 'জলি'। ('দ্বৈত'/*ছায়া হরিণ*)

গ. পূব পাশের রাস্তায় ই-পি-আর-টি-সি'র গর্জন
সাড়ে সাতটার জেট্ নামছে আকাশমাটি কাঁপিয়ে
পাশের বাড়ির আয়রণ্ডুল মেয়েটি এইমাত্র
বাইরে বেরুলো,
এয়ারপোর্টে চাকরি তার।
একটা জিপ এসে থামলো দরজায়
আশরাফ সাহেব নেমে এলেন;
এক হাতে অলিম্পিয়ার বাক্স
আর অন্য হাতে টোস্টার। ('অভ্যাগত'/*সারা দুপুর*)

ঘ. আর তার দু'পকেটে ভ্যরাইটির টিকিটের বই–
অতিরিক্ত মই
একখানা। সারাদিন হোটেল-রেস্তোরাঁ। ('ডাবল কলাম'/*সারাদুপুর*)

ঙ. তোমার ক্যামেরার ফিল্ম যাকে তুলে নেবে
সে ত আমি নই ('আমাকে দাও'/*আশায় বসতি*)

চ. কেনাকাটা করেন না করছেন দেদার শপিং এবং শপিং তাই
দামটা শুধু জেনে নেন দাম কিছু কমাবার মত
বিনিথ্ ডিগনিটী কোন ছোট উক্তি মুখেই আনেন না
শুধু ছোট্ট করে বলেন ঠিক আছে তুলে দিন অতঃপর
ড্রাইভার ড্রাইভার রবে চীৎকারে মাথায় ওঠে হাট ('আসামী বিষয়ক'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

ছ. মঞ্চের দু'পাশে দেখা যাবে দু'সারি মানুষ– ফ্রিজ্ড্। ('দৃশ্য নির্দেশ'/*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*)

জ. কোথাও পড়ে না চোখে ব্লাডব্যাঙ্ক, অথচ প্রত্যহ
রক্ত নাও, রক্ত নাও বলে, দেখো সারিবদ্ধ মানুষ দাঁড়ায়
মানুষের রক্ত তবু অদৃশ্য সিরিঞ্জ বেয়ে যায় ('চিত্রমালা'/*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো কাব্যের 'উনিশ কি বিশ' কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দের সঙ্গে ইংরেজী শব্দ ব্যবহারে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন কবি। একজন সমালোচক বলেছেন: "গদ্যঢঙের ভাষা-

বিন্যাস এবং সংলাপধর্মিতার গুণে এই কবিতাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সংলাপধর্মিতার কারণে মনে হয় যেন সমাজ-অভিজ্ঞ কেউ ক্রমাগত বর্ণনা করছে সমাজেরই 'সাধারণ মানুষ আর ভূঁই ফোড় উচ্চবিত্তের' চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য।"[১২] রূপকধর্মী এই কবিতাটিতে কবি স্টেডিয়াম, ব্লেড, প্লাস্টিক ইত্যাদি ইংরেজী শব্দের সঙ্গে কামিন, হয়রান, হেকিম, সওয়াল, নাজেহাল, আল্লার কুদরত, হাসেল, শুকরিয়া, মোকাম, হাজির, উজির, নাজির ইত্যাদি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আহসান হাবীব কবিতায় প্রচুর নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করেন। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের চেয়ে স্থানবাচক বিশেষ্য বেশি ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। এই প্রয়োগ-কৌশলে তাঁর কবিতা সময়-সমাজ-রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, যদিও স্বকালের সীমা অতিক্রমী অভিব্যক্তি তাতে অনুপস্থিত নয়। কয়েকটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য-যুক্ত পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে:

ক. ফরিদের ছোট ছেলে আমজাদ ('কাশ্মিরী মেয়েটি'/*রাত্রিশেষ*)
খ. আমরা যাবো ছকু মিয়ার হোটেলে। ('কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি'/*রাত্রিশেষ*)
গ. আমি যাবো তিন নম্বর হারু মিয়ার বস্তি ('কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি'/*রাত্রিশেষ*)
ঘ. এখনো নয়নে কাঁপে মীরণের তীক্ষ্ণ তলোয়ার! (সেতু-শতক'/*রাত্রিশেষ*)
ঙ. ঐ ঘরে বাস করে কাজেম বয়াতী ('একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ'/*রাত্রিশেষ*)
চ. মহাম্মদ তালেবালি, আমানীর পাড়, ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)
ছ. দেয়ালে ভার্জিন মেরী, মোনালিসা তারি মাঝখানে
তোমার কোমল দীপ্তি জয়নুলের তুলিতে অমর। (সম্রাট'/*ছায়া হরিণ*)
জ. বিলিয়ে নিঃশেষে কবে সুচতুর বরদাতা বাক্‌কাস-এর পায়ে
প্রমত্ত মিডাস আমি দেহের প্রাণের ('প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা'/*সারাদুপুর*)
ঝ. নূহের প্লাবনে পথ হারিয়েছি ('তারা দু'জন'/*সারা দুপুর*)
ঞ. হায় আবু হোসেন তোমাকে মৃত জেনে
যদিও ঠকেছি, ('তোমাকে মৃত জেনে'/*সারা দুপুর*)
ট. আহা, রাধা কিংবা হেলেনের চোখ দেখিনি ('জাল'/*সারা দুপুর*)
ঠ. গগাঁ কিংবা ভ্যানগগের
কোনো মূর্ত বিষাদ আমাকে সঙ্গ দেয় (শিল্প-মানবিক'/*আশায় বসতি*)

কবিতায় ব্যবহৃত স্থানবাচক শব্দাবলী কেবল একটি স্থানের পরিচয়ক-নির্দেশক হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা কবির অভিজ্ঞান ও চেতনালোকের প্রতিভূ হয়ে ওঠে কখনো কখনো। একটি স্থানবাচক বিশেষ্য পাঠকচিত্তে ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির বিস্তৃত প্রেক্ষাপট নির্মাণ করতে পারে। একটি নামবাচক বিশেষ্যকে আমরা কোনো কোনো কবিতার গতিবিধির নিয়ন্ত্রক হিসেবেও আবির্ভূত হতে দেখি। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে আহসান হাবীবের কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি স্থানবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:

ক. খানিকটা হেটে গিয়ে
মার্কুইস্ লেন ছাড়িয়ে
কিড স্ট্রীট পেরিয়ে
তারপর চৌরঙ্গি। ('রেড্ রোডে রাত্রিশেষ'/*রাত্রিশেষ*)

খ. এখন নিবেছে আলো মিসরে ও দূর বেবিলনে! ('পারাপার'/*ছায়া হরিণ*)
গ. ইমামগঞ্জের সব গলিঘুঁজি ছাড়িয়ে হঠাৎ
কাজীর বিষণ্ন চোখ চলে গেলো দূরে বহু দূরে ('রেখে যাবো/*সারা দুপুর*)
ঘ. মনীষা কি বাইজান্টাইন
নাইলের সবুজ? ('মনীষা মনীষা বলে'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)
ঙ. শহর পিরোজপুর
সরকারী স্কুলের খেলার মাঠ ('আমার যাওয়া হয় না'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)
চ. কখনো পিরোজপুরে, খানজাহানে কাটিয়ে দু'দিন
পায়ে হেঁটে খুলনা যায়। ('উনিশ কি বিশ'/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

আহসান হাবীবের কবিতায় নামবাচক এবং স্থানবাচক বিশেষ্য পদের তালিকা আরো দীর্ঘ হবে, কিন্তু কবির মানসপ্রবণতা অনুধাবনে উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহই আমাদের বিবেচনায় যথেষ্ট। নামবাচক বিশেষ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা লক্ষ্য করি, কখনো তিনি শিল্পী-সাহিত্যিকের নাম ব্যবহার করেছেন, কখনো ঐতিহাসিক চরিত্রের শরণ নিয়েছেন, কখনো-বা পৌরাণিক চরিত্রের আশ্রয়ে নিজের অনুভবকে শব্দবন্দী করেছেন। স্থানবাচক বিশেষ্য কখনো স্মৃতিমগ্নতার হাত ধরে তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে, কখনো-বা কোনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার প্রয়োজনে স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন।

বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আহসান হাবীবের কৃতিত্ব চোখে পড়ে। কখনো তিনি বিশেষণের স্বাভাবিক ব্যবহার অক্ষুণ্ন রেখেছেন, কখনো বা বিসর্পিল বা বিসঙ্গত ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতায় ব্যঞ্জনা সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কবিতায় বিশেষণ ব্যবহার যে বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে, রবীন্দ্রপরবর্তী কবিরা তাতে যুক্ত করতে চেয়েছেন নতুন ব্যঞ্জনা। আহসান হাবীরের কবিতায়ও বিশেষণ ব্যবহারের বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। বিশেষণ ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে বক্তব্যের সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করে। ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে মানুষ স্বভাবতই বিশেষণ প্রয়োগ করে। কবি-কল্পনায় যে ভাবের অঙ্কুরোদ্গম, পাঠকের চিন্তায় তারই বিস্তার ঘটে নানাবিধ উপমা ও বিশেষণের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, উপমাও সামগ্রিক বিচারে বিশেষণেরই বিস্তৃত রূপ। বিশেষণের ব্যবহার থেকে কবির মানসগঠনের ব্যাকরণটিও চিহ্নিত হয়ে যায়। বিশেষণ কবির অভিজাত মানসিকতার প্রতিভূ হিসেবে কাজ করে। আহসান হাবীব বিশেষণ ব্যবহারের মাধ্যমে কাব্যদেহে যে গতি ও দ্যুতি সঞ্চার করেছেন, তা বিশেষণকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমরা আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* থেকে বিশেষণ-আশ্রয়ী কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে ধরছি :

ক. যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের <u>প্রিয়</u> প্রভাত। ('দিনগুলি মোর')
খ. কাশ্মিরী মেয়েটির তনু <u>গোলগাল</u> ('কাশ্মিরী মেয়েটি')
গ. কল্প কামজ <u>কুমারী</u> কন্যা জ্বলে <u>প্রচণ্ড</u> দিন শিখায় ('আজকের কবিতা')
ঘ. <u>তীরবিদ্ধ</u> দিনগুলি এ-মাটিতে চূর্ণ হয়ে ঝরে! ('দ্বীপান্তর')
ঙ. <u>লাল</u> মাটি, <u>কালো</u> পীচ্ <u>শাদা নীল</u> বালবের বুকে ('দ্বীপান্তর')

চ. তুমি পরেছ লাল টক্‌টকে একটা শাড়ি। ('কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি')
ছ. জংধরা মগজের নীলকোষে অসহ তুফান ('কনফেশান')
জ. জাগে অকুণ্ঠ অভিনয় আর চাতুরী লজ্জাহীন ('দিনের সুর')
ঝ. নতুন সূর্যের তীরে বিদ্ধ করে কুৎসিত মৃত্যুকে ('সেতু-শতক')
ঞ. তাদের বিকৃত সুর হৃদয়ের আনাচে-কানাচে। ('প্রদক্ষিণ')
ট. আবার উধাও পাখা সেই সব পুরনো পাখির। ('হে আকাশ হে অরণ্য')
ঠ. বন্ধুর পথের 'পরে রিখিলাম নাম, ('স্বাক্ষর')

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহের নিম্নরেখ শব্দগুলি বিশেষ্যের শরীরকে বিশেষ ভাবে ও ব্যঞ্জনায় উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষণ ব্যবহারের ধরন থেকে একজন সৃজনশীল মানুষের মনোভাবের ব্যাকরণটিও অনেকটা আঁচ করা সম্ভব। গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে বিশেষণ ব্যবহারে বিশেষত্ব অর্জন অসম্ভব বলেই আমরা মনে করি। আহসান হাবীব শব্দশরীরে অনুভবের নির্যাস ঢেলে দিয়ে শব্দকে জীবন্তসত্তায় পরিণত করেন যা কবির অভিজ্ঞতারই শিল্পিত স্মারক হয়ে ওঠে। কারণ 'শব্দেরও চোখ-কান আছে। সেইজন্যেই বোধ হয় শব্দও এক রকমের অভিজ্ঞতা।'[১৩] শব্দের অভিজ্ঞতা সৃজনপ্রতিভার সংস্পর্শে সংহত হয়ে অভিধানসম্মত অর্থের সীমানা অতিক্রম করে যায় বলেই কবিতার কাছে পাঠকের প্রত্যাশার চারপাশে কোনো দেয়াল থাকে না। আমরা আহসান হাবীবের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কবির বিশেষণ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি :

> নিষ্পাপ মূঢ়তা, ক্লান্ত দিন, অনন্ত জীবন, অমর মিনার, সোনামুখী নারকেল, ম্লান মুখ, শ্রান্তিহীন পরিবেশ, রৌদ্রদগ্ধ দিন, কুৎসিত কঙ্কাল, সভ্যতার চতুর দালাল, পাণ্ডুর কপাল, ভ্রষ্টনীড় হৃদয়, রৌদ্রপীত মাটি, দুর্মর পিপাসা, স্তব্ধবাক্ পাখি, মায়াবিনী নারী, ইস্পাত-কঠিন দিন, ভোরের উজ্জ্বলতনু বুক, আজব রোশনাই, জিগরফাটা রক্ত, সমুদ্রের কালো বুক, মানবিক তৃষ্ণা, সতর্ক সন্তান, দুঃস্থ পৃথিবী, কুৎসিত কুটিল কামনা, অজেয় বিষাণ, অনিন্দ্যসুন্দর নারী, বলিষ্ঠ বাহু, সোনামাখা বিকেল, অমর কবিতালোক, বিপুল ত্যাগের মহিমা, উজ্জ্বল মনীষা, আতশী নজর, অকৃত্রিম বাসনা, মুক্ত বুক সঙীন, আবিষ্ট আত্মা, হৃতদীপ্তি অথৈ বিশ্রাম, ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণতার জ্বালা, জ্যোৎস্না কণ্ঠ, বিষণ্ণ আলো, আদিম আবেগ (*ছায়া হরিণ*); দক্ষিণ হাওয়া, সোনামাখা ধান, নির্লজ্জ পিপাসা, নির্মল বাসনা, সুচতুর বরদাতা, বিশুদ্ধ সোনা, আটপৌরে দিন, সমুদ্রপ্রাণ আশা, প্রাচীনতম বিধাতা, অবিনশ্বর কবিতা, ছিন্ন-ভিন্ন হাওয়ার নখর, বাসনা-বিহ্বল চোখ, ঘাসের নরম নম্র কণা, প্রজ্ঞাবান গৃহস্থ, অনিকেত প্রেয়সী, বিস্মিত হৃদয়, নিবিড় সন্ধ্যা, সজীব অবুঝ পুতুল, ক্লিষ্ট হৃদয়, অবিকল হৃদয়, সরীসৃপ শরীর, প্রখর কোনো প্রতিভা, দুর্লভ পৃথিবী, গভীর নিঃসঙ্গতা, ডিসটেম্পার্ড দেয়াল, উজ্জ্বল ক্লান্তি, লাবণ্যের অশেষ বিস্তার, ক্লান্ত নদীতীর, বয়স্ক মালিক, দ্বিচারিণী জননী, দুর্বিষহ আশার মুকুল, ক্লান্ত বিব্রত কয়েকটি মুখ, মহৎ মধুর কান্তি, পরিত্যক্ত পুরনো বাগান, অবিনশ্বর জন্মভূমি, দুর্গম পথ, বিভ্রান্ত দিন, মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি, বালখিল্য মত্ততা, স্বনির্ভর আলোর জগৎ, অনভিজ্ঞ মনস্বিতা, উজ্জ্বল আর প্রাণোচ্ছল শিখা, শিশির ধোয়া সবুজ ঘাস (*সারা দুপুর*); মসৃণ সদয় দীর্ঘ মই, জীবনের আটপৌরে রঙ্গমঞ্চ, উদ্দাম অঙ্গভঙ্গি, সুসম্পন্ন ইতিহাস, উন্মাদ চীৎকার, আসন্নপ্রসবা অসংখ্য কাকের ডিম, দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-ভয়ের ভূত, পীড়িত পাঞ্জা, মুগ্ধ স্বজন, অটল করতল, ঘরকুনো বেড়াল, অমলধবল পাল, নির্মম বিদ্রুপের ঘণ্টা, রক্তচক্ষু কোন এক কৃষ্ণশ্মশ্রু-সজ্জিত পুরুষ, দুর্বোধ্য চীৎকার,

বুদ্ধির চকমকি, প্রজ্ঞার আলোকে চোখ উজ্জ্বল, অসীম সাহসে অটল বুক, অবিজ্ঞ সংসারী, গভীর গম্ভীর আর জ্বালাময় আবেগ, সমৃদ্ধ কারুকাজ, অস্থির ব্যাকুল প্রাণ, ব্যথিত প্রবীণ পথচারী, শ্বাসরুদ্ধ যৌবন, জাগ্রত-প্রাণ সমর্পিত নদীর কল্লোল, বাস্তুহারা যৌবন, বিক্ষুব্ধ দর্শক, বেহেশতী বাদশাহী, আলোকিত আত্মা (*আশায় বসতি*); সুশোভন স্বাধীন শৈশব, বিচলিত মানব-সন্তান, স্বকালসমৃদ্ধ এক সুস্থির আবাস, দিশেহারা কাঠবেড়ালী, সুসজ্জিত বাগান, বিপুল ভবিষ্যৎ, কোলাহলমুখর হৃদকেন্দ্র, পরার্থপর সভ্য, সুতীক্ষ্ণ স্বর, নীলিমা মলিন চাঁদ আঁধার চরাচর, অলৌকিক হুইসিল, আস্তিনছেঁড়া গেরুয়ারঙ কামিজ, সারিবদ্ধ মাছ, বিজ্ঞাপন-বিশারদ সভ্যতা, সর্বগ্রাসী দানবনিনাদ, নিস্তরঙ্গ জলতল, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, যন্ত্রকম্পিত অচেনা বন্দর, জান্তব নিনাদ, গুলিবিদ্ধ হাজার করোটি, অটল প্রতিজ্ঞা, দুর্ভার নৈঃশব্দ্য, ঝলকিত পিপাসার জল, বিচিত্র বেলুন, অপরূপ উজ্জ্বলতা, তীক্ষ্ণ চাবুক, স্তব্ধ বাতাসের বুক, বিষণ্ন বিমূঢ় কয়েকটি মানুষের মুখ, দানবাকার কলঘর, ক্ষিপ্ত পা, বিদীর্ণ মাটি, দুর্বোধ্য তিমির, অক্ষম আক্রোশ, প্রিয়তম মহত্তম অস্ত্র বুক, দীর্ণবুক দুঃখী মানুষ, উলঝলুল নৃত্য, লাল নীল সবুজ সমস্ত রঙ, এতল বেতল শব্দ, পরিপাটি বিছানা, অর্থহীন আস্ফালন, সবুজ ঝালর এই সজ্জিত নিসর্গ, প্রবল ঘৃণায় প্রাচীন প্রাচীন কোন গুহা, বিষণ্ন সভা (*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*); ধাবমান প্রাচীন হরিণ, অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বী স্মৃতিহরণ, গনগনে আগুন, অর্ধনির্মিলিত চোখ, পোহাতী তারা, অনবরত অবিরল স্বপ্নস্রোত, রঙিন উজ্জ্বল জামা, দমাদ্দম আওয়াজ, শাদা নীল অথবা সবুজ এমন কি ফ্যাকাশে হোক তার রং, জন্মান্ধ তুষার, দুর্বিনীত মাটি, অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা, সৌখিন উচ্চারণ, ঘর্মাক্ত শরীর ধুলো, অনুপম সৃষ্টি, সুসজ্জিত সুশ্রী শিশু, মারাত্মক ব্যাধি, অপার্থিব আনন্দ, উজ্জ্বল গন্তব্য, প্রকাণ্ড আলো, অস্থির পুরুষ, তীক্ষ্ণ বল্লম, দগদগে ঘা, অলৌকিক বাসগৃহ, শুকনো গোলাপ পচা আপেল, শূন্য ঝনঝন আওয়াজ, লাল নীল সবুজ কাগজ, পুরনো সংলাপ, ফুলের মলিন রেণু পুবের বাতাস, নিত্যক্রোধ প্রবল বিক্রম, স্খলিত নক্ষত্রের পোড়া গন্ধ, বিপুল সমাবেশ, অপূর্ব ভাটিয়ালীর কথা, বিশালকায় কালো ঘোড়া, টান টান শরীর, ভরা কলসী নীল শাড়ী রুপোর ঝুমকোর কথা, জয়নালের অলৌকিক বাঁশি, সূক্ষ্ম কৌশল, পরিতৃপ্ত দর্শকমণ্ডলি, উজ্জ্বল হলুদ আর রুপালি জলের রেখা, নিপীড়িত পিষ্ঠ, হৃষ্ট শবশাবকেরা, আর্তস্বর-শিহরিত এই রাত্রি, উথাল পাথাল মেঘ, দুর্বহতা দুর্ভার জীবন, উজ্জ্বল সান্নিধ্য, স্পর্ধিত বালক, কর্দমাক্ত জল ভাঙা সাঁকো, পোড়া নিসর্গ শূন্য বাসন নীল মাঠ ভাঙা লাঙল মহাসড়ক, বানোয়াট অন্ধতা, আবহমান শোভাযাত্রা, অনিশ্চিত আরেকটি দিন, হন্তারক ঘণ্টা, সাজানো শয়নকক্ষ, টানটান নদী, খররৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের পাখি, টলমল শিশির, শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা, স্নিগ্ধ মাটির সুবাস, সরচ পথ ধু ধু নদীর কিনার, উধাও নদী, অবোধ বালক (*দু'হাতে দুই আদিম পাথর*); ছোট নীল রেলগাড়ি, তীক্ষ্ণ হুইসিল, অনন্ত রেলপথ, ভগ্নসেতু পাহাড়ের ধ্বস, রক্তাক্ত হরিণ শিশু, অনন্ত সবুজ, অলৌকিক জোয়ার, সমৃদ্ধ মরাই, তুমুল বর্ষা, রঙিন বাঁশের বাঁশি, নিভন্ত উনুন, ধাবমান বৈরী বাতাস, দীর্ঘ পথ ভালোবাসার, জান্তব গর্জন, ঘেয়ো কুকুর, মুমূর্ষু বাঘ, ক্রুদ্ধযুবা বিভ্রান্ত যুবতী, সবুজ শস্যকণায় সমৃদ্ধ বুক, ক্লান্ত দেহভার, কি আশ্চর্য কি বিশাল রাত, পুরাতন বৃক্ষরাজি কি রকম টালমাটাল অস্থির বাতাস, চূর্ণ শিলা, বুনো ঝাউ, স্খলিত তারা, এতল বেতল নাচ, প্রসন্ন পাখির নীড়, খুঁটিহীন চালহীন আবাস, ঈশ্বরের গাঢ় কণ্ঠস্বর, সারিবদ্ধ স্নানার্থী, নিরঞ্জনা নদী, পঙ্গু-বিকৃত আমাদের চেতনা, অবিনাশী অস্ত্র, রক্তশূন্য মানুষ, স্তূপাকার পি এস পি, ভাসমান অথৈ নদী, আত্মমগ্ন সন্ত, আদিম বাগান, অলৌকিক আচ্ছাদন, অসহ্য কষ্টের হাসি, সফেদ চাদর, পৃথিবীর রক্তাক্ত শয়ান, নদীর জলে কালো কালো ছবি (*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*)।

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী পুরো কবিতার প্রেক্ষাপটেই বিশেষ অর্থের দ্যোতক হয়ে ওঠে, কোনো শব্দ কিংবা বিশেষ কোনো পঙ্‌ক্তির খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন উপস্থাপন থেকে কবির অভিপ্রায়ের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্যের মুখ দেখে না। আহসান হাবীবের কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষণের দীর্ঘ তালিকাও সেই অর্থে পাঠককে বিশেষ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করবে না। তবে কবির বিশেষণ নির্বাচনের প্রবণতা থেকে বিশেষণ-প্রসঙ্গে তাঁর মানসপ্রবণতা অনুধাবনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

আহসান হাবীব কবিতাই লিখতে চেয়েছেন এবং কবিতার মাধ্যমে নিজের ভাবনাজগৎ ও কল্পনাবিশ্বের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্কসূত্র সুদৃঢ় করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রয়াস শব্দের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা ছাড়া অসম্ভব বলেই মনে করতেন তিনি। শব্দের শরীরে তিনি নিজেকেই ঢেলে দিতে চেয়েছেন। এই ঢেলে দেওয়ার গতিবিধির মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে যায় তাঁর শিল্পীসত্তার স্বভাব, শক্তি ও সমৃদ্ধি, যা স্বকালের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেও অনাগত কালের পাঠকের ডানার মেলার অবাধ আকাশ হতে চায়। সমালোচক যথার্থই লিখেছেন :

> ভাষাই কবিতায় অভিজ্ঞতার জগৎরূপে আবির্ভূত হয়, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে অলংকৃত অর্থবাক্যে ও ছন্দস্পন্দে। কবির 'কল্পনামনীষা' এই অভিজ্ঞতার জগৎকে শব্দে বন্দি করে গড়ে তোলে নিজ নিজ ডিকশন। এখানে যেমন শিল্পের সৃষ্টিরহস্য ও ভাষার আকরণিক নিয়মাবলি সক্রিয় থাকে, তেমনি সামাজিকভাবে অবিরত সৃষ্টিশীল ভাষার বৈভব, বর্ণরূপ ও অর্থান্তর-ক্রিয়াটি ডিকশনকে প্রতিনিয়ত নির্মাণ করতে থাকে। উক্ত সমাজবিশ্বটিতে থাকে উৎপাদন অর্থব্যবস্থার গূঢ় দ্বন্দ্ব, শ্রেণী সংঘর্ষ, নৃতাত্ত্বিক-ভৌগলিক- সাংস্কৃতিক স্তরবৈচিত্র্য। শব্দশিল্পী এরই অন্তর্ভূত সত্তা, তার রয়েছে বিপুল সামাজিক ভাষাজগৎ এবং একে রূপান্তর ও সংগীতাত্মক করে তোলার অশেষ ক্ষমতা।[১৪]

আহসান হাবীবের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যাবে, শব্দ ব্যবহারে তিনি রক্ষণশীলতা পরিহার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বলার কথাটিকে বলিষ্ঠ করার প্রয়োজনকেই তিনি অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং সেই প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযোগী ভাষা নির্মাণের দিকে যত্নশীল থেকেছেন। শব্দের শক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তিনি। শব্দকে গ্রহণে তিনি যেমন উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি শব্দের শরীরে নতুন অনুরণন সঞ্চারের দিকেও মনোযোগী ছিলেন কবি। তাই তাঁর কবিতার পরিচিত শব্দবন্ধই পাঠকের মনে অপরিচয়ের আবহ সঞ্চার করে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ঘরের দেয়ালে সুসজ্জিত শব্দমালা জুড়ে দিয়েছেন এবং সেখানে গড়ে উঠেছে অনুভব ও উপলব্ধি বিচিত্র এক সংগ্রহশালা। 'এতল বেতল শব্দাবলি এখন আমার গানের মালা'—*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের 'এখন আমার' কবিতায় কবির এই স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে, শব্দের সঙ্গে তাঁর সংসারযাপনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ হয়েছে। এই স্বাস্থ্যসম্মত

শিল্পসৌকর্যের সান্নিধ্যে এলে পাঠকচৈতন্যে যে অনুরণন সঞ্চারিত হয়, তা শব্দের সঙ্গে শব্দের গভীরতর সম্পর্ক সেতুরই ফল, যা উৎসারিত হয় আহসান হাবীবের আত্মখচিত শব্দ-শরীর থেকে।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ আলী আহসান, *কবিতার রূপকল্প*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২২

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *সাহিত্যের পথে*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য,তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৬৫

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলাভাষা পরিচয়*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ঐতিহ্য,তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৬০৩

৪. জীবনানন্দ দাশ, *কবিতার কথা*, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৬

৫. বেগম আকতার কামাল, *কবির চেতনা : চেতনার কথকতা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৪৯

৬. সৈকত আসগর, *বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৮

৭. আহসান হাবীব, *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*, *আহসান হাবীব রচনাবলী* ১ (সম্পাদক–আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫। এই নিবন্ধে আহসান হাবীবের কবিতার মূলপাঠ (text), অন্য কোনো গ্রন্থের উল্লেখ না থাকলে, *আহসান হাবীব রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড থেকে গৃহীত হয়েছে বুঝতে হবে। মূলপাঠের উদ্ধৃতি-শেষে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের নাম, উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. T. S. Eliot, *The Use of Poetry and the Use of Criticism*, Faber & Faber [paper-back], Mcmlxvii, p. 152

৯. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩-৪

১০. মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩০৩

১১. Herbert Read, *Collected Essays in Literary Criticism*, second edition, Reprinted, MCMLiv, Faber & Faber Ltd. London, 1950, pp. 55-56

১২. মিজানুর রহমান খান, 'আহসান হাবীবের কবিতার শিল্পরূপ', *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), বর্ষ : ৩৪ সংখ্যা : ৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২০৯

১৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *কবিতার বোঝাপড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৮৫

১৪. বেগম আকতার কামাল, *কবির চেতনা : চেতনার কথকতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে রাজনৈতিক মিথ হিসেবে 'সোনার বাংলা'র ভূমিকা

মামুন আল মোস্তফা*

সারসংক্ষেপ

সোনার বাংলা একটি রাজনৈতিক মিথ। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী ঔপনিবেশিক শাসনকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার প্রেক্ষাপটে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে এ মিথটি তৈরি হয়। পাকিস্তান আমলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে এটি নজীরবিহীন শক্তি নিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়। এ প্রবন্ধের প্রথম অংশে রাজনৈতিক মিথ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং পরের অংশে মিথ হিসেবে সোনার বাংলা কখন তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং এটি কিভাবে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নিগড় ভেঙে স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জনের শক্তি জোগায় সেটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

১

প্রাক উপনিবেশ আমলের বাংলা, অর্থাৎ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা যে ঔপনিবেশিক বাংলা থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি 'প্রাচুর্যপূর্ণ' ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিবাদ নেই।[১] বাংলার প্রাচুর্য সম্পর্কে এমনকি রবার্ট ক্লাইভ পর্যন্ত লিখেছেন: নগর হিসেবে মুর্শিদাবাদ আমাদের লন্ডনের মতোই বিশাল এবং জনবহুল; এদের মধ্যে তফাৎ হলো মুর্শিদাবাদের লোকেদের সম্পদ এখানকার লোকেদের থেকে বহুগুণ বেশি।[২] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৮০৭ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত সময়ের বাংলা ও বিহার প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত লাভ যেটা বিলাতে পাঠানো হয়েছিল সেই হিসাব পর্যবেক্ষণ করে কোম্পানির আমলা মন্টগমেরি মার্টিন ১৮৩৫ সালে মন্তব্য করেন: প্রতি বছর তিন লক্ষ পাউন্ড করে যে অর্থ গত ত্রিশ বছর যাবৎ বাংলা থেকে বিলাতে পাচার হয়েছে সেটাকে যদি ভারতে প্রচলিত সুদের হারে -- অর্থাৎ শতকরা ১২ ভাগ চক্রবৃদ্ধি হারে -- হিসেব করা হয় তাহলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২৩,৯০০,০০০ পাউন্ড। আর এই পরিমাণ অর্থ অন্যত্র পাচার হলে খোদ ইংল্যান্ডও ফতুর হয়ে যেত।[৩]

এত কিছুর পরেও আমাদের পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা থাকে, সে সময়ের প্রাচুর্যের নিরিখে বাংলাকে সোনার বাংলা বলা যাবে কি-না। এ বিষয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তিন

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খণ্ডের যে বাংলাদেশের ইতিহাস লিখিত হয়েছে সেটার অর্থনৈতিক ইতিহাস অংশে আকবর আলী খান *সোনার বাংলা মিথ নাকি বাস্তবতা* সে বিষয়ে এক প্রশ্ন তুলে বিষয়টিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিবেচনা করার প্রস্তাব তুলেছেন। তাঁর মতে, 'সোনার বাংলা' তত্ত্বের চারটি 'এসেনসিয়াল করোলারি' রয়েছে: ১. ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের আগে বাংলায় নিরবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল; সোনার বাংলার মানে হলো সমকালীন অন্যান্য সমাজ যে দুর্ভিক্ষ ও অর্থনীতির অন্যান্য চড়াই উৎরাই এর মধ্য দিয়ে গেছে সোনার বাংলায় সেগুলো অনুপস্থিত থাকবে। ২. ইংরেজ শাসনের আগে বাংলা ছিল 'ল্যান্ড অব প্লেনটি এন্ড চিপনেস'। মানে বাংলা প্রাচুর্যপূর্ণ ছিল এবং সবকিছু ছিল সস্তা। ৩. সাধারণ মানুষ এই সমৃদ্ধির সুফল ভোগ করতেন এবং তাঁরা দারিদ্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ৪. প্রাক ইংরেজ আমলে বাংলা সমকালীন অন্যান্য সমাজের চাইতে বেশি প্রসপারাস বা ধনাঢ্য ছিল।[৪] 'সোনার বাংলা'য় যে এই চারটি বৈশিষ্ট্য থাকবে সেটা কেউ কখনও দাবি করেছে এমন রেফারেন্সও তিনি দেননি। ফলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে পারি যে, এসব ফিরিস্তি তাঁর নিজের। প্রশ্ন হলো পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো কৃষি-ভিত্তিক সমাজের খোঁজ কি আমরা জানি যেখানে সাধারণ মানুষেরা দারিদ্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল না; যেখানে কখনও বন্যা বা খড়ার কারণে দুর্ভিক্ষ হয়নি? বাংলা চূড়ান্তভাবে সম্পদশালী ছিল কি-না সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তিনি লিখছেন, "অভিজ্ঞতার বাইরে থেকেই বলা যায় যে, প্রাক-শিল্পযুগে চূড়ান্ত সমৃদ্ধি থাকতে পারে না ... অভিজ্ঞতার বাইরে থেকেই বলা সম্ভব যে, বাংলার অর্থনীতি যে সমকালীন এশিয়ার অন্যান্য অর্থনীতির তুলনায় বেশী সমৃদ্ধ ছিল সেটা বিশ্বাস করার কারণ আছে।"[৫] প্রশ্ন হলো: এবসুলুট প্রসপারিটি বলতে কোনো জিনিসের কথা জগতের কোনো তাত্ত্বিক কি কখনও কোথাও আলোচনা করেছেন? না করলে অসুবিধা নেই। লেখক নিজেও এই শব্দগুচ্ছ দিয়ে কী বুঝান সেটা কোথাও লিখেননি। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের এ দেশে তিনি হয়ত বেহেশত জাতীয় কোনো পদার্থের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আবার, '*A priori*'-এর মানেই হলো যা অভিজ্ঞতারও আগে থেকে হাজির থাকে। অর্থাৎ, বাস্তবের সঙ্গে তুলনার আগেই শুধুমাত্র বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই। প্রশ্ন জাগে, বিষয়টা যদি *A priori* হয়, তিনি কিভাবে বাংলার অর্থনীতির সঙ্গে এশিয়ার অর্থনীতির তুলনা করেন? অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে তৎকালীন বিভিন্ন সমাজের অর্থনীতির এই ধরনের তুলনা সম্ভব—বিষয়টা প্রমাণ করতে পারলে শুধু বঙ্গদেশের নয়, তিনি পৃথিবীর সেরা দার্শনিকের তকমা পাবেন। যাই হোক, তাঁর সিদ্ধান্ত হলো সোনার বাংলা চূড়ান্ত অর্থে কখনও সোনার ছিল না। আইনস্টাইনের পরে খোদ নেচারারাল সাইন্স বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনাতেই এবসুলিউটিজম উধাও হয়ে যাওয়ার পরও ইতিহাস চর্চায় এ ধরনের এবসুলিউটিস্ট এপ্রোচ অপেশাদার গবেষকসুলভ। মজার বিষয় হলো সমকালীন অন্যান্য সমাজের সঙ্গে কোন ধরনের তুলনা না টেনেই তিনি আরও সিদ্ধান্ত নেন: বৃটিশ উপনিবেশ-পূর্ব যুগে বাংলা যে অন্যান্য প্রাক-শিল্প বা প্রি-

ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজের চাইতে সমৃদ্ধ ছিল এই অনুমিতি আমাদের জানা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে খারিজ করা যায় না। এই লেখা বাংলাদেশের ইতিহাসের পাঠকদেরকে বড়জোড় অন্যান্য সূত্র থেকে নেওয়া কিছু তথ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবে। তবে ইতিহাসতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত পাঠকের নিকট এই ধরনের চর্চা আদৃত হবার কথা নয়। প্রাবন্ধিক নিজে ইতিহাসের পাঠক মাত্র আর রাজনীতিবিজ্ঞানের ছাত্র। সেজন্য তিনি 'সোনার বাংলা'র ইতিহাসের অংশটুকুকে ঐতিহাসিকদের বিবেচনার জন্য রেখে দিয়ে এবং নিকট বা সুদূর অতীতের কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্বে বাংলা সত্যিকার অর্থেই সোনার ছিল নাকি ছিল না সেই তর্কে না গিয়ে 'সোনার বাংলা'কে একটি রাজনৈতিক মিথ হিসেবে সংজ্ঞায়ন ও বিশ্লেষণ করবেন।

২

মিথকে এনথ্রোপোলজি বা নৃ-বিজ্ঞানের অধীত বিষয় বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। মেলনস্কি এবং লেভি স্ত্রস মিথ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মিথ বলতে মানুষ সমাজের ঐ সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করাকেই বুঝে থাকে যেগুলোর কোনো বাস্তবভিত্তি নেই। মিথ হলো বানোয়াট, অলীক কল্পনা, যেমন খুশি তেমন চিন্তার ফসল। আর বাস্তবতাকে আন্তরিকভাবে মোকাবেলা করার কোনো প্রচেষ্টা মিথের সঙ্গে যুক্ত নয় বলেই ভাবা হয়। আর রাজনৈতিক বলয়ের মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প গাঁথা হলো রাজনৈতিক মিথ। বিষয়টা মোটেও সেরকম নয়। মিথের শক্তি প্রবল। লেভি স্ত্রস, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুদিন অধ্যাপনা করে গেছেন, তাঁর *মিথ ও মিনিং* নামে যে সাক্ষাতকারটি বই আকারে প্রকাশিত হবার পর বাজারে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে সেখানে বলেন, মিথই আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলে। লেভি স্ত্রসের তত্ত্ব নৃ-বিজ্ঞানের পরিসরে ব্যবহারের জন্য বেশ উপযোগী হলেও, রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বোঝার জন্য এটা তেমন সাহায্য করে না। সেজন্য আমরা এখানে জর্জেস সরেল, আর্নস্ট ক্যাসাইরার এবং হেনরি টিউডরের বরাত দিয়ে রাজনৈতিক মিথকে ব্যাখ্যা করব এবং তারপর 'সোনার বাংলা' মিথ কখন কিভাবে তৈরি হলো সে বিষয়ে এবং সবশেষে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই মিথ আন্দোলনের গতিকে কতটা ত্বরান্বিত করেছে সে বিষয়ে সবশেষে আলোচনা করব।

রিফেলেকশনস অন ভায়োলেন্স নামের বইয়ে জর্জেস সরেল সর্বপ্রথম আমাদেরকে রাজনৈতিক মিথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি মূলত বুঝতে চাচ্ছিলেন কোন ধরনের আন্দোলন সংগ্রামে মানুষ সর্বস্ব বাজি রাখে, কখনও পিছিয়ে আসে না। কার্ল মার্ক্সের প্রলেতারিয়ান রেভুলুশন বা সর্বহারার বিপ্লবকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন: মার্ক্স সব সময়ই বিপ্লবকে মিথ আকারে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আরও জানান যে, বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে শ্রমিক শ্রেণী যে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেন সেই ধর্মঘটও তাঁদের মধ্যে মিথ

হিসেবেই বিরাজ করে। কেননা এই ধর্মঘটের মাধ্যমেই তাঁদের সমাজতন্ত্রের নির্যাস সম্পর্কে একটি অন্তর্গত (ইনটুইটিভ) ধারণা বা বোঝাপড়া তৈরি হয়। মিথের রাজ্যের মানুষেরা কখনও নিরুৎসাহিত হন না। তাঁর মতে, মিথের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটা একটি ভবিষ্যতের সুখছবি/মনছবি যা একই সঙ্গে বর্তমানকে ছাঁচাছোলাভাবে অর্থবহ করে তোলে।

মিথ অলীক কল্পনা নয়। মিথ 'ফেয়ারি টেল' বা ছেলে ভুলানো রূপকথার গল্প নয়, আর ইশপ বা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্পের মাধ্যমে নৈতিকতা শিক্ষার আসরও নয়। রূপকথাতো কল্পনার রং মিশিয়ে তৈরি করা গল্প; বাস্তবতার সঙ্গে এগুলোর মিল থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে; এগুলোর উদ্দেশ্য শুধুই বিনোদন। আর নৈতিকতা সংক্রান্ত গল্পগুলো বাস্তবজীবনে মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি। মিথ কিন্তু আবার ইউটোপিয়াও নয়। ইউটোপিয়া হলো তাত্ত্বিকের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ফল। একজন তাত্ত্বিক বাস্তবকে দেখে, বিশ্লেষণ করে এমন এক মডেল হাজির করেন যার সঙ্গে বাস্তবের সমাজকে তুলনা করা যাবে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এগুলো অখণ্ডনযোগ্য। যেমন, আমরা চাইলেই বলতে পারি যে, প্লেটো আদর্শ সমাজের যে ইউটোপিয়া উপস্থাপন করেছেন সেটা মোটেই টেকসই নয় কেননা সেটা বর্তমানের উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে, মিথ কিন্তু একেবারেই আলাদা। মিথ ভবিষ্যতের ছবি আঁকে; সমাজ বাস্তবতার নয়। মিথ কোনো বিশেষ বিষয়ের কোনো বিবরণ নয়। বরং সমাজ বদলের কাজে ব্রতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন (expressions of a determination to act)।

সমাজে মিথ কি কাজ করে? এর কাজ হলো কোনো ব্যক্তি, কোনো গোষ্ঠী বা কোনো শ্রেণীর মধ্যকার সবচাইতে শক্তিশালী অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তোলা। আর এই অনুভূতিগুলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সবসময় মনের মধ্যে উঁকি দেবে। মিথে আচ্ছন্ন মানুষ তাঁর বর্তমানের যে প্রকল্প সেটা বাস্তবায়নের শক্তি অর্জন করে মিথ থেকে। অন্যকোনো পন্থায় সেই শক্তিলাভ সহজসাধ্য নয়। মোদ্দা কথা, মিথ হলো *বিশ্বাসের* একটা ব্যাপার; আর এখানেই এর শক্তি নিহিত। যেহেতু মিথ সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুর প্রস্তাব করে না এবং যা দাবি করে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো যুক্তি-প্রমাণও হাজির করে না বরং অনির্দিষ্ট কিছু সহজবোধ্য ধারণা দেয় যার ফলে সবার পক্ষে একে ধারণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু মিথ যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তৈরি কোনো কনক্রিট বা সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয় নয় সে কারণে এটাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বা দার্শনিকভাবে মোকাবেলা করা যায় না; কোনো ভবিষ্যতবাণী, তাত্ত্বিক প্রকল্প বা ইউটোপিয়ার মতো মিথকে খারিজ করা যায় না।

রাজনৈতিক মিথ: বটিচি এবং চালান্ড বলেন, রাজনৈতিক মিথ একটা গণ-ভাষ্য যেটা একটি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতাকে তাৎপর্য প্রদান করে। ফলে এর মধ্যে সত্য কতখানি আছে সেটা দিয়ে অন্য ভাষ্যের সঙ্গে মিথের পার্থক্য তৈরি হয় না; বরং মিথ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এটা ক) ঐ জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে রূপায়ণ

করে ও সেই তাৎপর্যকে পুনরুৎপাদন করে; খ) যা গোষ্ঠীর সকলে শেয়ার বা ভাগাভাগি করে; এবং গ) ঐ গোষ্ঠী যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে থাকে সেটাকে সুনির্দিষ্টভাবে মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।[৬]

টিউডর রাজনৈতিক মিথে রাজনৈতিক মিথ আমাদেরকে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার গল্প বলে। যে ব্যবস্থাটি অতীতে ছিল এবং যেটাকে ফিরিয়ে আনা অথবা টিকিয়ে রাখা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও কখনও রাজনৈতিক মিথ ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের তালে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সে সমাজ নির্মাণ ত্বরান্বিত করার তাগিদ দেয়।[৭]

ক্রিসটোফার ফ্লাড মনে করেন মিথ-রচনা রাজনৈতিক জীবনের একটি স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। এতে কোনো রহস্যময়তা নেই। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শগুলোর মধ্যে কোনটার টিকে থাকা উচিত মিথ সেটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। ফলে এটা অনিবার্য যে, মানুষ তাদের বিশ্বাসের আলোকে অতীতকে রাঙ্গিয়ে তোলে।[৮] মনে হতে পারে যে, রাজনৈতিক মিথাচ্ছন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তাদের জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বিকারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সোরেল এ ধরনের সকল সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেন।[৯] ফলে মিথ যখনই তৈরি হোক না কেন, মানুষ যতক্ষণ একে অনুভব করবে, ততক্ষণই এর শক্তি অটুট থাকে। পণ্ডিতজন মিথকে খণ্ডন করার জন্য চেষ্টা করলেও মিথাচ্ছন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গকে সে প্রচেষ্টা স্পর্শ করতে পারে না।[১০] এদিক থেকে মিথকে অনেকটা ধর্ম বিশ্বাসের মতো মনে হবে।[১১] বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিসের মতো নয় যেটা প্রমাণ কিংবা অপ্রমাণযোগ্য। মিথ অর্ন্তগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিশ্বাসের হুবহু অনুরূপ যেগুলো আন্দোলনের ভাষায় প্রকাশিত হয়। আর মিথকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লিষ্ট করে ঐতিহাসিক বিবরণ হিসেবে কারও সামনে হাজির করা যায় না বলে একে খণ্ডনও করা যায় না।[১২] এমনকি দর্শন বা অধিবিদ্যাও মিথের শক্তির কাছে হার মানে। টিউডরের মতে, রাজনৈতিক মিথকে দর্শন বা যুক্তিও ধ্বংস করতে পারে না। এদিক থেকে মিথ অজেয়।[১৩]

সোরেল, টিউডর, ফ্লাড এ বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মিথ অপ্রমাণযোগ্য নয়। প্রশ্ন জাগে মিথের যে উপাদান সেগুলোর সত্যাসত্য কি মিথ তৈরিতে কি আদৌ সাহায্য করে? যদি করে থাকে, তাহলে কতটুকু? টিউডর বলেন: মিথের সাফল্যসূত্রটি হলো একে সাধারণভাবে সত্য ঘটনার বিবরণ বলে গ্রহণ করা হয়। সবাই যদি বুঝে যায় যে মিথটি হলো ডাহা মিথ্যা তাহলে সে মিথ সবাইকে যে আনন্দ দেবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; তবে সেক্ষেত্রে মিথ মানুষকে কর্মোদ্দীপিত করার শক্তি হারাবে। যে মিথকে সত্য বলে ধরা হয় না সেগুলো সাহিত্য-সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে টিকে থাকে বটে, তবে সেগুলো মৃত মিথ। জ্যান্ত মিথ সব সময়ই সাদামাটা 'সত্য' হিসেবে হাজির থাকে।[১৪]

মিথের মধ্যে সত্য-ঘটনার উপাদান থাকলেও ইতিহাস-গবেষক তথ্য-উপাত্ত, দলিল, প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য কিংবা পুরাকীর্তির ভিত্তিতে যে সত্য নির্মাণ করেন, মিথের সত্য তা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। আগেই বলা হয়েছে, যে মিথের দরকারই হয় একেবারে ব্যবহারিক প্রয়োজনে। গবেষক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী বা দার্শনিক যাই বলুন না কেন, যে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যদি মিথকে সত্য বলে ধরে নেয় সেটাই মিথকে প্রাণবান ও শক্তিমান করে তোলার জন্য যথেষ্ট।[১৫]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: মিথ বর্তমানের সাপেক্ষে সবকিছু বলে, ব্যাখ্যা করে (টিউডর, পৃ. ১২৪)। বর্তমানের সমস্যাকে উতরে, আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত নির্মাণে যা কিছু করণীয়, রাজনৈতিক মিথ সেগুলো করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে উৎসাহিত করে। সেজন্য অনেক সময় মিথাকাঙ্ক্ষী গোষ্ঠী ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে উপযোগধর্মী রাজনৈতিক সত্য তৈরি করে বা মেনে নেয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিবৃতি ঐতিহাসিকভাবে সত্য হতে পারে, কিন্তু একে গ্রহণ করার কারণে যদি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বস্তুগত এবং নৈতিক কল্যাণের পথরোধ হয়, তাহলে কার্যত সে বিবৃতি তো মিথ্যারই অন্য নাম মাত্র। এ ধরনের অকেজো সত্যকে গ্রহণ করার চাইতে মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে এমন কোনো 'ঐতিহাসিক ভুল' বা 'দার্শনিক অসত্য' কে সত্য বলে গ্রহণ করা শ্রেয়তর। সেজন্য শুধুমাত্র ঐতিহাসিক গবেষণায় সত্য প্রমাণিত হয়নি বলে প্রচলিত লোকিক ঐতিহ্যকে মিথ্যা বা কুসংস্কার বলে বাতিল করে দেওয়া যাবে না; কেননা অন্তর্নিহিত নৈতিক ও রাজনৈতিক সত্যগুলোর কারণেই এগুলো আদরণীয়।[১৬] এক্ষেত্রে মিথ ইডিওলজি বা রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজ রূপান্তরের কাজ করে। এতে গাঠনিক উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হলেও এই ভাবাদর্শ রাজনৈতিক মিথকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়।[১৭] কাণ্ডজ্ঞান থেকে মনে হতে পারে যে, মিথ কোনো বিষয়কে গোপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এবং বুদ্ধিজীবীরা এর সত্যিকারের অর্থকে সরাসরি বের করতে সক্ষম। কিন্তু ব্যাপারটি উল্টো। মিথ কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য এমন অর্থ বহন করে এবং প্রকাশ করে যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। এগুলোর ভাষান্তর সম্ভব নয়; এমনকি যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্য করাও সম্ভব নয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিথের সত্যিকারের মানে এর আক্ষরিক অর্থের মধ্যে নিহিত থাকে না; বরং এটা এমন এক সংকেত যা দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে এবং সকল শর্তকে অস্বীকার করে।[১৮]

একটি জনগোষ্ঠী কখন মিথাক্রান্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে? এটা ঠিক যে, আমরা নাগরিকেরা সাধারণ সময়ে যুক্তিশীল আচরণ করি এবং নিজেরা সাধারণভাবে করতে সক্ষম এমন কাজে অন্য কোনো ধরনের অতি-বাস্তব বা অধিবাস্তব জিনিসের আশ্রয় গ্রহণ করি না। কিন্তু ব্যক্তি যদি গভীর সংকটে নিপতিত হন যেখানে তাঁর অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে, যার থেকে উত্তরণ তার আয়ত্তের সীমার বাইরে, তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজে চিন্তা করেন না,

বরং অন্যের চিন্তার উপর নিজেকে সঁপে দেন। চূড়ান্ত রকম কঠিন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ নিজে চিন্তা করার এমনকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা অন্যের উপর ছেড়ে দেয়। প্রাচীন যুগে এমন অবস্থায় সুপার হিরো, কার্লাইলের ভাষায়, কিংবা অবতারের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলের বিশেষ কোনো নেতা সামনে চলে আসেন। চূড়ান্ত রকম দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে মানুষ নিজেকে চিন্তা করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার শ্রম থেকে মুক্ত করতে চায়। এমন পরিস্থিতিতে নতুন কোনো রাজনৈতিক দল নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয় যা অন্ততপক্ষে মানুষকে সকল দোলাচল থেকে মুক্তি দেবে বলে মনে হয়। আর মিথ তৈরি হওয়ার সেটিই মোক্ষম সময়।[১৯]

ব্যক্তি কিভাবে ভাবে বা সিদ্ধান্ত নেন সে বিষয়টি বিবেচনা করার পাশাপাশি একটি সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠী কিভাবে আচরণ করে এবং মিথাচ্ছন্ন হন সে বিষয়টিও ক্যাসাইরার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান জাতির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার মাধ্যমে। তিনি জানান: দিন থেকে দিন জার্মানদের সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছিল। ওয়েমার রিপাবলিকের নেতৃবৃন্দ তাঁদের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আইনী পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রাণপণে সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করছিলেন; কিন্ত তাদের কোনো চেষ্টাই কাজে আসছিল না। বেকারত্ব আর মুদ্রাস্ফীতির কারণে গোটা জার্মানির আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। আর এই পরিস্থিতিই হলো রাজনৈতিক মিথ তৈরি হওয়ার ও পুষ্ট হবার জন্য সবচাইতে উপযোগী।[২০]

মিথ দুই ধরনের হতে পারে। নিবর্তনমূলক বা অপ্রোসিভ: ক্যাসাইরার (১৯৭৩) দেখিয়েছেন যে, আর্যদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এ ধরনের একটি মিথ। অন্যদিকে মিথ মুক্তির বাণী নিয়েও হাজির হতে পারে, যেমন, সোরেল দেখিয়েছেন যে সর্বহারার বিপ্লবের ধারণা এমন একটি মিথ যা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য মুক্তির আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে। মিথের আলোচনার প্রকৃতি কেমন হবে? সোরেলের মতে, মিথ কখন কিভাবে এলো সে বিষয়গুলোর সঙ্গে মিথ বর্তমানে কিভাবে ক্রিয়াশীল থেকে বর্তমানের রূপান্তরে কাজ করে সে বিষয়েও আলোচনা আসা জরুরি। আন্দোলন এবং সংগ্রামকে সফল করে তোলার জন্য মিথের শক্তিকে কাজে লাগানোর কোনো বিকল্প নেই। জনতা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মিথকে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ বিপ্লবের আলোচনা চলতে পারে বটে, কিন্তু বৈপ্লবিক মূহূর্ত আসবে না।[২১]

মোদ্দা কথা, মিথ দুইটি ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, মিথাক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা বা অবস্থানকে ব্যখ্যা করে। সামষ্টিক সংকটে করণীয় কি সে বিষয়ে মিথ নির্দেশনা দেয়। টিউডর বলেন: অন্য সকল মিথের মতো রাজনৈতিক মিথও পরিস্থিতির ব্যাখ্যা হাজির করে; তবে তফাৎ হলো রাজনৈতিক মিথ আমাদেরকে জানায় কোনো একটি জনগোষ্ঠী কিভাবে তৈরি হলো এবং তারা কী অর্জন করতে চায়।[২২] দ্বিতীয়ত, মিথ হেজিমনি বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিংবা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি বা ভৌগোলিক সীমানা বাড়ানোর জন্য কিংবা

সংকটের মুখে অন্তর্দলীয় সম্প্রীতি (solidarity) বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।[২৩] মিথকে কাঠামোগতভাবে বোঝার জন্য টিউডর রাজনৈতিক মিথের দুইটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেন: ক) এর প্রোটাগনিস্ট থাকে, আর থাকে শুরু এবং শেষসহ একটা প্লট। প্রোটাগনিস্ট বিষয়ে বলা যেতে পারে যে, মিথ সব সময়ই একটি গোষ্ঠীর/জনসমষ্টির জন্য প্রযোজ্য। মিথের একজন নায়ক থাকতে পারে বটে। কিন্তু এর প্রোটাগনিস্ট কখনই একজন ব্যক্তি বিশেষ নয়। বরং মিথের প্রোটাগনিস্ট সব সময়ই একটি উপজাতি কিংবা জাতি কিংবা সম্প্রদায় কিংবা একটি শ্রেণী কিংবা নির্বাসিত কোনো জনসমষ্টি বা অভিবাসীর দল।

কোনো একটি জনগোষ্ঠী যখন নিজেদেরকে কোনো একটি চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় তখন মিথ আমাদেরকে সেই জনগোষ্ঠীর আবেগ-অনুভূতি (sentiments) এবং চিন্তাকে (ideas) বুঝতে সাহায্য করে; মিথ কোনো জিনিসের বিবরণ নয়, বরং কর্মোদ্দীপিত হওয়ার বাসনামাত্র।[২৪] আর তাই, সমাজ-পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি বুঝতে চাওয়া গবেষকের জন্য রাজনৈতিক মিথের পর্যবেক্ষণ জরুরি।

৩

এবার আসা যাক 'সোনার বাংলা' রাজনৈতিক মিথ কি-না সে বিষয়ে। 'সোনার বাংলা'র ধারণাটি জনপ্রিয় হয় বিশ শতকের প্রথমভাগে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে।[২৫] সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের ঘোষণার পর যে স্বদেশী আন্দোলন দানা বাঁধে তার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সাহিত্যে 'সোনার বাংলা'র ধারণাটি বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা বিপুলভাবে ব্যবহার করতে থাকেন। আমরা দেখি, স্বদেশী আন্দোলন বাংলা সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, দেবব্রত বসু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকদের দেশ-মাতৃকা নিয়ে লেখাজোখা স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্ববোধক গানের বেশিরভাগ এ সময়ে রচিত।[২৬] মজার বিষয় হলো, যদিও বাংলা বলতে তখন সবাই পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাংলাকে একসঙ্গেই বুঝতেন ও বুঝাতেন সোনার বাংলার কোনো সুনির্দিষ্ট উদাহরণ যখন কেউ টানতেন তখন সেগুলো পূর্ব-বাংলা থেকেই উঠে আসত।[২৭] গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: সোনার বাংলার প্রকৃত রূপ কি সে বিষয়ে স্পষ্ট বা প্রিসাইজ কোনো বিবরণ আমরা কোনো সূত্র থেকে পাই না।

লক্ষ্য করার মতো বিষয়, এসময় সোনার বাংলার যে রূপ আমাদের সামনে হাজির হয় সেটা প্রাথমিকভাবে মায়ের রূপ। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালবাসি' কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এ বসুন্ধরা'তে আমরা 'সোনার বাংলা'কে মা হিসেবেই পাই। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমও এর ব্যতিক্রম নন: তাঁর বিখ্যাত আনন্দমঠেও দেশকে আমরা মা হিসেবেই পেয়েছি। আর মায়ের কোলে, অর্থাৎ গ্রামে, ফিরে

গিয়ে সেখানে মায়ের হৃতশ্রী পুনরুদ্ধারের বিষয়টিও তখন গুরুত্ব পেয়েছে (ইকবাল, ২০১০: ৯০-৯৯)। লক্ষণীয় যে, 'সোনার বাংলা' প্রপঞ্চটির ব্যবহার বিপুল হলেও সোনার বাংলার মূল উপাদান কোনটি সে বিষয়ে কেউই স্পষ্ট করে কিছু লিখেননি কিংবা বলেননি। এর মধ্যে সব সময়ই ধোঁয়াশা ছিল। কিন্তু তাই বলে সাধারণ মানুষ যাঁরা সোনার বাংলা'কে অখণ্ড রাখার জন্য জানবাজি রাখতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁদের বুঝবার জন্য বা অন্যকে বুঝাবার জন্য 'সোনার বাংলা'টুকুই যথেষ্ট ছিল। বাকিটা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো গড়ে নিয়েছেন, ধরে নিয়েছেন, বা মেনে নিয়েছেন। মানে ইংরেজ সরকার যে বাংলাকে খণ্ড-খণ্ড করতে চেয়েছে, সেটা 'সোনার বাংলা'। সুতরাং, সেটাকে রক্ষার আন্দোলনই ছিল এর মূলসুর। টিউডরের ভাষায়, স্বদেশীরা সোনার বাংলাকে প্রিজার্ভ বা ধরে রাখতে চেয়েছেন। আর 'সোনার বাংলা'র সত্যিকারের রূপ আর যাই হোক, ইংরেজ সরকারের নীতিকে এটা ঠিকই রুখে দিয়েছে। এখানেই সোনার বাংলা মিথের জন্ম। টিউডর রাজনৈতিক মিথের যে প্রোটাগনিস্টের কথা বলেছিলেন, এ ক্ষেত্রে প্রোটাগনিস্ট হলো শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক-জমিদার শ্রেণী। আর এই মিথের যাত্রা সম্পর্কে আমরা ঠিক নিঃসন্দেহ না হতে পারলেও এর শক্তি কোন পর্যায়ে নিঃশেষ হয়েছে সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ-রদের পরে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের আন্দোলন দানা বাঁধার পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে ভারত-মাতা আর অন্যদিকে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি—এই দুই হেভি-ওয়েট ইমেজের তলায় 'সোনার বাংলা' চাপা পড়ে যায়।

৪

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় ১৯৪৭ সালে। কিন্তু বাংলা উপনিবেশই রয়ে যায়। ভাষার প্রশ্নে, সংস্কৃতির প্রশ্নে এবং সম্পদের বণ্টনের প্রশ্নেই শুধু যে নতুন ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী বাংলাকে বঞ্চিত করেছে তা নয়, মানুষ হিসেবেও তারা বাঙালি জনগোষ্ঠীকে হীনজ্ঞান করেছে।[২৮] এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-বিভেদ সৃষ্টি করে শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে চেয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনোদ্ভূত সামাজিক সংকট প্রগাঢ় হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে বাউল আব্দুল করিম গেয়েছেন:

গ্রামের নও জোয়ান হিন্দু মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
আমরা আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
.....
করি ভাবনা সেদিন আর পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন
করিম দীনহীন কই লুকাইতাম।

অতীতের বাংলা কত সুখের ছিল সেটা এই গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে সময়কাল অনির্দিষ্ট। গানের মূলসুর হলো আগে সুখ ছিল এখন নেই। যদিও ঔপনিবেশিক শাসনাধীন প্রতিটি মুহূর্তই আগের চাইতে বেশি করে সংকটময় হয়ে উঠছে, তবুও মনে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আগের সুদিনকে ফিরিয়ে আনার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে জার্মানেরা মিথাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য যে রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, কবিয়ালের গানে আমরা সেরকম সংকটময় সময়ের একটি চিত্র পাচ্ছি।

গণতন্ত্রহীনতা ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংকট ধরা পড়ে একটি ভোটের গানে: "বাক্স ভইরা টেক্স দেবো/ভোটের বেলায় নাই"। আর যখনই বাঙালি গণতান্ত্রিক পন্থায় অধিকার আদায়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে তখন তাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছে সেই ঔপনিবেশিক শক্তি। ফলে সেই বঞ্চনাবোধ ছিল। তবে আপামর জন-সাধারণকে সেই বাস্তব বঞ্চনার ব্যাপারে সজাগ করে তাদেরকে সেই বঞ্চনা থেকে উত্তরণের জন্য সংগ্রামে সামিল করা সহজ ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে জার্মানির অবস্থা পরিবর্তনে কার্ল মার্ক্সের একটি উপদেশ প্রাসঙ্গিকভাবে আসে: জার্মান জনসাধারণকে কোনভাবেই আত্ম-প্রতারণা করতে দেওয়া যাবে না; হতাশায় কাবু হতে দেওয়া যাবে না। তাঁদেরকে বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে বাস্তব বঞ্চনাকে আরও তীব্রতর করে তুলতে হবে। তাদের লজ্জার কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়ে লজ্জাকে অনেক বেশি অসহনীয় করে তুলতে হবে।[২৯]

এটা ঠিক যে, গত শতকের পঞ্চাশের দশকেই শিক্ষিত বাঙালিরা পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকেও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ব্যাপারে সচেতন করে তাদেরকে নতুন সমাজ তৈরির জন্য উদ্যমী করে তোলার কাজটা হয়েছে ১৯৬০-এর দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভ্যানগার্ড আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের মাধ্যমে। আর এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান-আন্দোলনের ফলে চাপা পড়ে যাওয়া 'সোনার বাংলা'র মিথটি আবার সামনে চলে আসে। সাধারণ মানুষকে সাদাসিধে ভাষায় তিনি বুঝাতে সক্ষম হন: "সোনার বাংলা শ্মশান কেন?" শুধু সোনার বাংলা শ্মশান কেন সেই প্রশ্নের সোজা-সাপটা এবং সাধারণ মানুষের বোঝার উপযোগী জবাব হাজির করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। শ্মশানকে পুনরায় সোনার বাংলায় পরিণত করতে চাইলে কি করণীয় সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করে সবার সামনে হাজির করেন। সেটা ছয় দফা। এ ব্যাপারে পুরিন্দা, সাতগ্রাম, ঢাকা থেকে জনৈক এনাজুর রহমান চৌধুরী ১৯৬৬ সালের ৭ জুলাই বঙ্গবন্ধুর নিকট যে পত্র লিখেন সেটা বিবেচনা করার মতো: "শতকরা ৯০ জন বাঙালী একথা বিশ্বাস করে যে, ৬ দফা বাংলার ও বাঙালীর মুক্তিসনদ ও শেখ মুজিব বাংলার জনগণের আশা-আকঙ্ক্ষার একমাত্র প্রতীক।... সর্বশেষে আপনাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি দেশবাসী আপনার ঐতিহাসিক ৬ দফার সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে চলেছে।"[৩০]

প্রসঙ্গত, শেখ মুজিবুর রহমান তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অনেক প্রভাবশালী নেতা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া 'সোনার বাংলা'র রাজনৈতিক মিথকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরুজ্জীবিতই শুধু করেননি; তিনি এ মিথকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। আর এ মিথের অন্তর্গত ভবিষ্যতের সুখছবিকে বাস্তবে রূপ দেবার কর্মপরিকল্পনাও সবার সামনে হাজির করেছেন। জনগণ সেই মিথকে যেমনভাবে আস্বাদন করেছে, তেমনি গ্রহণ করেছে তাঁর সেই মিথ বাস্তবায়নের রূপরেখাকে। এ রূপরেখা, অর্থাৎ, ছয় দফার রূপরেখা সম্পর্কে তাঁরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, ১৯৬৭ সালে—ছয় দফা প্রবর্তনের এক বছরের মাথায়—আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন:

> যদি গণভোটে শতকরা ত্রিশ ভাগ ভোটও ছয় দফার বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমরা একে বাতিল করে দেব। ... আমরা ক্ষমতা চাই না। আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচী সমাজতান্ত্রিক। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে আমরা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। জনগণের রক্ত চোষার জন্য, সমগ্র জাতির সম্পদ শুধুমাত্র দুইশ পরিবারের কুক্ষিগত রাখার জন্য আমরা স্বাধীন হইনি।[৩১]

সৈয়দ নজরুল ইসলামের এই মন্তব্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জনগণের উপর কতটা আস্থাশীল ছিল। আর অন্যদিকে জনগণও সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির উপর যে আস্থাশীল ছিল সেটার প্রমাণ তো সত্তর সালের নির্বাচনেই আমরা পেয়েছি। এ বিষয়ে বিস্তর অভিযোগ আসে যে, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যদি আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মেনিফেস্টো পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব সেখানে দলটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—এই তিনটি বিষয়ের জন্য একটি করে অনুচ্ছেদ বরাদ্দ করা আছে। এগুলো ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের রাজনৈতিক রূপরেখা নির্ধারনী বক্তব্য। আর চার নম্বর অনুচ্ছেদের শিল্প, পাঁচ নম্বরে কৃষি, ছয় নম্বরে পাট শিল্প, সাত নম্বরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নয় নম্বরে বাংলা ভাষা—এই সব কয়টি বিষয় শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার জনগণের জীবন মান উন্নয়নের জন্য। মোট এগারটি অনুচ্ছেদের মধ্যে সাত, আট, দশ ও এগার নম্বর অনুচ্ছেদ অখণ্ড পাকিস্তানের ভোটারদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ছিল। এই অবস্থা দেখে বানার্ড হেনরি লেভি বলছেন:

> সবার মনে কোথা থেকে জানি এ ধারণা এসে গিয়েছিল যে শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান, অথচ তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার প্রশ্ন কখনও ওঠেনি। ... সব কিছুর আগে শেখ মুজিবুর রহমান একজন বাঙালি, ইসলামাবাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে গেলেই তিনি অস্বস্তিতে ভুগতে থাকেন, বাংলার সীমানার বাইরে পা রাখলেই নিজেকে বিদেশী মনে হয় তাঁর। প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতল কেন? নির্বাচনে জেতার

> উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার উন্নতি হয় এবং দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে আসে।[৩২]

আর পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের দুই দশকের অভিজ্ঞতায় 'সোনার বাংলা'র মিথটি একটি জনপ্রিয় গানে চমৎকারভাবে উঠে আসে:

সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের শ্মশান করেছে কে?
কে কে কে?
এহিয়া তোমায় আসামির মতো জবাব দিতে হবে।।
শ্যামল বরণে সোনার ফসলে ছিল যে সেদিন ভরা
নদী নির্ঝর সোনা বয়ে যেত কত অমৃত ধারা।
অগ্নি দহনে সে শুভ স্বপ্ন দগ্ধ করেছে কে?
.....
দেশের মাটিতে আমরা ফলাব ফসলের কাঁচা সোনা
চিরদিন তুমি নিয়ে যাবে কেড়ে হায়রে উন্মাদনা।

আমরা যদি এই গানটির বক্তব্য বিশ্লেষণ করি তাহলে সোনার বাংলা মিথের শক্তির জায়গাটা আরও স্পস্ট হবে। আবহমান বাংলা আগে সোনায় মোড়ানো ছিল। আমাদের অনেক শুভ স্বপ্ন ছিল। সে বাংলা এখন শ্মশান হয়েছে। আর স্বপ্ন দগ্ধ হয়ে গেছে। এজন্য দায়ী কে?

শুধু সেই সময়ের মানুষের কাছে নয়, প্রতিটি বাঙালির কাছে এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে। আমরা প্রায় দুইশত বছর ঔপনিবেশিক শাসনে ছিলাম। ঔপনিবেশিক শাসকেরা আমাদের সম্পদ পাচার করেছে। ফলে আমাদের ভগ্নদশা। কিন্তু গানটিতে এসকল প্রশ্নের জবাব চাওয়া হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে। কে এই ইয়াহিয়া খান? এই ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতনের পর সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যুক্ত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন। কিন্তু এই গানে তাঁর কাছ থেকেই অতীতের ঔপনিবেশিক শাসনের যত কুফল আমরা ভোগ করেছি সেগুলো সম্পর্কে জবাব চাওয়া হচ্ছে। এখানে তাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে। ফলে রাজনৈতিক ভাষায় যা বলা যায়নি, মিথের ভাষায় জনগণকে তা স্পষ্ট করেই বলে দেওয়া গেছে: পাকিস্তানের সঙ্গে আর নয়; এবার আমাদের নতুন সমাজ গড়ার পালা, নতুনভাবে চিন্তা করার পালা। যে কথা বঙ্গবন্ধু শেষ মুহূর্তে বলেছেন, মিথ সেটা বহু আগেই মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে আর নয়।

তাছাড়া, বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদের পাচারের বিষয়টি অর্থনীতি বিষয়ে সচেতন নাগরিকের কাছে হয়ত স্পষ্ট ছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের বোধগম্য সীমার মধ্যে এ পাচারের বিষয়টিকে নিয়ে যাওয়া ও তাদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য

অতীতের সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা 'সোনার বাংলা' সঙ্গে বর্তমানের শ্মশান-সম 'দুঃখিনী বাংলা'র তুলনা ছিল নজীরবিহীন। বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও শ্মশান-সম বাংলাকে আবার 'সোনার বাংলা'য় রূপান্তরের স্বপ্নে ছিলেন বিভোর। অন্য সকলের সঙ্গে আইনসভার সদস্যবৃন্দ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দও সোনার বাংলার মিথে আচ্ছন্ন হয়ে ৩রা জানুয়ারী ১৯৭১ সালে ঢাকায় এক সভায় নিজেরা নিজেরা মিলিত হয়ে এক শপথ নেন। শপথের শেষ কয়টি বাক্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে: পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের মধ্যে এবং ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য চিরতরে নির্মূল করার জন্য, শোষণহীন সুখী সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাব। জনগণ আমাদের যে ম্যান্ডেট দিয়েছে সেটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো গোষ্ঠী বা অশুভ শক্তি যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলব। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকব।[৩৩]

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমানভাবে 'সোনার বাংলা' মিথে আপ্লুত হয়েছিলেন সাধারণ মানুষও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের কথা। ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে শাহজাহান সিরাজ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এর আগের দিনই মাত্র বাংলাদেশের পতাকার ডিজাইন করা হয়। আর মাত্র ছয় দিনের ব্যবধানে, অর্থাৎ, সাত মার্চে লাখ লাখ লোক পতাকা হাতে নিয়ে চলে এসেছিলেন রেসকোর্স ময়দানে। ঐ দিনের ঘটনার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ রুমীর বয়ানে জাহানারা ইমাম লিখেন:

> দেখেননি আজ কত লাখ লোক স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে এসেছিল? জনগণ এখন স্বাধীনতাই চায়, এটা তাদের প্রাণের কথা। নইলে মাত্র এই ছয়দিনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবাই সবখানে স্বাধীন বাংলার ঐ রকম ম্যাপ লাগানো পতাকা সেলাই করার মতো একটা জটিল কাজ, অন্যসব কাজ ফেলে করে, সেটা আবার বাতাসে নাড়াতে নাড়াতে প্রকাশ্য দিবালোকে মিছিল করে যায়?"[৩৪]

তাইতো! মাত্র ছয়দিনের মাথায় লাখ লাখ লোক স্বাধীন বাংলার পতাকা নাড়াতে নাড়াতে রাজপথে নেমে আসবে আর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তখনও টিকে থাকবে? সেটা কি করে হয়? তারপরের গল্প হলো সশস্ত্র সংগ্রামের গল্প। কিন্তু এবার যেটা হলো আগের—মানে ঔপনিবেশিক আমলের—হতাশার সমস্ত গান আশার গানে রূপান্তরিত হলো। পাকিস্তান আমলে লেখা বাউল করিমের লেখা গানে যে হতাশা ছিল সেটার বদলে এলো আশা। শ্মশানকে সোনার বাংলায় রূপান্তরের স্বপ্ন নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম।

আবার জমবে মেলা
বটতলা হাটখোলা
অঘ্রাণে নবান্নে উৎসবে।
সোনার বাংলা ভরে উঠবে সোনায়
বিশ্ব অবাক চেয়ে রবে।

আবার ভিড়বে এসে বাংলার বন্দরে
বেসাতির বড় বড় মহাজন
আবার খুঁজবে তারা সোনা ফলা বাংলায়
জহরত হীরা মনি কাঞ্চন।

'সোনার বাংলা'র মিথ ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের শোষণ-নিষ্পেষণ আরা হতাশাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুনভাবে সবকিছু গড়ার জন্য উদ্দীপিত করে। সবাইকে শক্তি জোগায়। সবাই মিলে অর্জন করি স্বাধীনতা। মেঘনা গুহঠাকুরতা আমাদের জানান, সোনার বাংলা আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কল্পনার রঙ্গে তৈরি ছিল।[৩৫]

উপসংহার

সোনার বাংলা সত্যিই কি সোনার ছিল? না-কি এ বাংলা শুধুই শোনা'র (যা শুধু শোনা যায়)? পণ্ডিতগণ এ প্রশ্নে যতটা ভাবিত হয়েছেন, এবং আশা করি এখনও হচ্ছেন, বাংলার সাধারণ মানুষেরা সে বিষয়ে ভাবিত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে মিথটি তৈরি হয়েছে মানুষ সেটাকে সাধারণ মানুষ সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন বলেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ বঙ্গভঙ্গ-রদ করতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর অখণ্ড পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার মানুষেরা যখন তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল তখন 'সোনার বাংলা'র পুরোনো মিথটি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। সোরেল, টিউডর এবং ক্যসাইরারের তত্ত্ব আমাদের জানায় যে, মানুষ চাইলে সচেতনভাবে রাজনৈতিক মিথ রচনা করতে পারে। তবে সোনার বাংলার মিথ কেউ সচেতনভাবে তৈরি করেছে এমন দাবি করাটা আমাদের জন্য দুষ্কর। কেননা তাঁরা রাজনৈতিক মিথকে যে কমন ন্যারেটিভ বা গণ-ভাষ্য বলেছেন, আমাদের 'সোনার বাংলা' তেমনি একটি গণ-ভাষ্য। এটা দিয়ে আমরা যেমন সোনা ফলা বাংলা বুঝি, আবার এমন দেশও বুঝি যেখানে সোনা ফলুক আর নাই ফলুক, সেখানে 'আমার সন্তান থাকে দুধে-ভাতে'। জাতির পিতা ভাবতেন সোনার বাংলা সুইজারল্যান্ডের মতো হতে হবে। 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাংলাদেশের রাজনৈতিক এলিটদেরকে এতটাই আপ্লুত করেছে যে, স্বাধীনতা লাভের পর 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সংগীত হিসেবেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এ সংগীতে জননী-রূপ বাংলার রূপের বর্ণনা রয়েছে। হয়ত দু'শো বছর পরাধীন থাকার ফলে 'সোনার বাংলা'র যে হতশ্রী অবস্থা হয়েছে সেটাকে আবার 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করার ব্যাকুল বাসনা থেকেই হয়ত

এমনটি হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে আবার একীভূত দেখার স্বপ্ন নিয়েই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানটি রচনা করেছিলেন। আর ১৯৭১-পরবর্তী সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের একীভূত হওয়ার কোনো ক্ষীণ সম্ভাবনা কখনও দেখা যায়নি। কোনো পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো আভাসও পাওয়া যায়নি। তারপরও সে গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে 'সোনার বাংলা' মিথ আমাদের রাজনৈতিক মানস কিংবা পলিটিক্যাল স্পেসের কত প্রবলভাবে হাজির আছে সে ইঙ্গিতই আমরা পাই। রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে 'সোনার বাংলা' শব্দগুচ্ছ ভার্চুয়াল স্পেসও অনেকখানি দখল করে আছে। 'গোল্ডেন বেঙ্গল' নামে গুগুল সার্চ ইঞ্জিনে আজকের দিনে ৭২ লাখ দুই শত ভুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। আর 'সোনার বাংলা'র ভুক্তি সংখ্যা চার লাখ নিরানব্বই হাজার।[৩৬] স্বাধিকার আন্দোলনের এত বছর পরও আমরা সোনার বাংলাতেই বিভোর।

তথ্যনির্দেশ

১ Choudhuri, Sushil, *From Prosperity to Decline*, Manohar Publishers and Distributors, New Delhi. Habib Irfan, Agrarian System of Mughal India, 1995

২ Quoted in Little J.H., *The House of Jagatseth*, Calcutta: Calcutta Historical Society, 1967, p. 2

৩ Quoted in Naoroji, Dadabhai, *Poverty and Unbritish Rule in India*, Swan Sonnenschein and Co. Ltd., 1901, p. VIII

৪ Khan, Akbar Ali, Golden Bengal: Myth and Reality in Sirajul Islam ed. *History of Bangladesh*, Vol. 2, 1997, pp. 132-154

৫ Khan, Akbar Ali, p. 152. The text reads: "*A priori* absolute prosperity cannot exist in pre-industrial societies... *A priori* there are reasons to presume that Bengal was relatively more prosperous than many other areas of Asia."

৬ Bottici, Chiara and Challand, Benoît, *Rethinking Political Myth: The Clash of Civilizations as a Self-Fulfilling Prophecy*, European Journal of Social Theory, Vol. 9(3), 2006, p. 320

৭ Tudor, Henry, *Political Myth*, The Macmillan Press Ltd, London, 1972, p.138

৮ Flood, Christopher, *Political Myth: A Theoretical Introduction*, Routledge, London, 2002, pp. 12-13

৯ Sorel, Georges, *Feflections on Violence*, ed. Jeremy Jennings, Cambridge University Press, 1999, p.115

১০ Op cit., p. 30

১১ Op cit., p. 30

১২ Sorel, p. 29

১৩ Cassirer, Ernst, *The Myth of the State*, New Haven CT: Yale University Press, 1946, p. 296.
১৪ Tudor, Op cit., p.123
১৫ Tudor, Op cit., p. 124.
১৬ Tudor, Op cit., pp. 135-136
১৭ Tudor, Op cit., p. 121
১৮ Tudor, Op cit., p. 122
১৯ Cassirer, Op cit., p. 288
২০ Cassirer, Op cit., p. 278
২১ Op cit., p. 28
২২ Tudor, Op cit., p.139
২৩ Tudor, Ibid.
২৪ Op cit., p. 28
২৫ Iqbal, Iftekhar, *The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change*, 1840-1943, Palgrave Macmillan, New York, 2010, pp. 14, 94
২৬ Sen, SN, *History of Freedom Movement in India (1857-1947)*, New Age International Publishers, New Delhi, 1997
২৭ Iqbal, 2010, p. 96.
২৮ Chowdhury, S. Roy, *The Genesis of Bangladesh*. Asia Publishing House. New York, 1972, pp. 19-21. Also see, Ziaur Rahman, Ekti Jatir Janma (Birth of A Nation) in Muhammad Hasan Imam (ed.), *Muktjuddher Khondachitra,* Madhyama. Dhaka, 2014, p.164
২৯ Marx, Karl, *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*, 1843, <https://www.marxists. org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro. htm>, accessed on May 1, 2016.
৩০ সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠি*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৩৩-২৩৪
৩১ Ghosh S, *The Awami League*, Academic Publishers, Dhaka, 1990, p. 141
৩২ Bernard Henry Levy, *Bangladesh, Nationalisme dans la revolution*, 1973, trans. Shishir Bhattarcharya, *Bangladesh Jokhon Shadhin Hochchilo*, Dhaka, 2014, p. 205
৩৩ *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১
৩৪ জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, ঢাকা, পৃ. ২৩
৩৫ Guhathakurta, Meghna, Sonar Bangla: Inspiration, Illusion and Extortion, *Humboldt Journal of Social Relations*, Vol. 23, No. 1/2, Asia, 1997, p. 197
৩৬ 3:00pm (Bangladesh Standard Time), May 1, 2016.

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

শঙ্খ : পুরাণে ও সাহিত্যে

ময়না তালুকদার*

সারসংক্ষেপ

ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে নাট্যতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বাদ্যযন্ত্রকে চারভাগে ভাগ করেছেন: তত (তন্ত্রীযুক্ত), অবনদ্ধ বা আনদ্ধ (যার উভয় দিক চর্মাবৃত), ঘন (ধাতুনির্মিত) ও সুষির (ছিদ্রযুক্ত)। এই সুষির শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের (Airophonei Instrument) মধ্যে শঙ্খ একটি। সমুদ্রে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন প্রজাতির শঙ্খ পাওয়া যায়। তবে শ্রীলংকা ও মাদ্রাজ উপকূলে এই প্রজাতির শঙ্খ বেশী পাওয়া যায়। শঙ্খশিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। পুরনো বহু রচনায় এর উল্লেখ এ শিল্পের প্রাচীনতার স্বাক্ষর বহন করে। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে (তামিলনাড়ু, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, এবং ঢাকায়) প্রাচীনকাল থেকেই লোকবাদ্য, অলংকার ও অস্ত্র হিসেবে শঙ্খ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে শঙ্খের ব্যবহার যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রন্থাদি, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাদি থেকে। তাছাড়া শঙ্খের সামাজিক তাৎপর্য খুবই গভীর ও সুদূরপ্রসারী। জীবনের প্রধান দুটি উৎসবে—জন্ম ও বিবাহে—শঙ্খ ও শঙ্খধ্বনির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পুত্র সন্তানের জন্ম-মুহূর্তে শঙ্খ বাজিয়ে নবজাতককে স্বাগত জানান হয়, আর নববধূকে বরণ করার সময় যে বরণডালা প্রস্তুত করা হয়, তাতে শঙ্খ থাকে। আবার আকাশে বজ্রপাত হওয়ার শব্দ শোনা গেলেও শঙ্খধ্বনি করার বিধান আছে। মোটকথা, সকল অপশক্তি ও অমঙ্গলকে দূর করার জন্যে শঙ্খের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৈদিক যুগ থেকে শঙ্খের ব্যবহার হলেও পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যে যে নানাভাবে শঙ্খের বিশেষ করে শঙ্খশিল্পের প্রসঙ্গ এসেছে, বর্তমান প্রবন্ধে তা-ই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

লোকায়ত শিল্পকলার জগতে শঙ্খ একটি অতি প্রাচীন কারুশিল্প। শঙ্খ শিল্পায়ন নবশাখ শ্রেণীভুক্ত শঙ্খবণিক বা শাখারু সম্প্রদায়ের বৃত্তি। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে লোকবাদ্য, অস্ত্র ও অলংকারাদি হিসেবে শঙ্খের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বাঙালির অলংকারের ইতিহাসেও শঙ্খের শৈল্পিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি, বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গেও শঙ্খ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে সমস্ত অমঙ্গল ও অশুভশক্তিকে বিনাশ করার জন্যে অলৌকিক শক্তির আধার রূপে শঙ্খধ্বনির ব্যবহার হয়ে আসছে। শঙ্খধ্বনি কখনো যুদ্ধসূচনা বা যুদ্ধ বিরতির নির্দেশকরূপে, আবার কখনো-বা উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যও ধ্বনিত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে মঠ-মন্দিরে এবং বিভিন্ন পূজা-পার্বণেও শঙ্খধ্বনি বা শঙ্খনাদ করা হয়। শঙ্খ হিন্দুনারীর সতীত্বের প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয়। বৌদ্ধধর্মেও শঙ্খধ্বনিকে সৌভাগ্যের সূচক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃতসাহিত্য, পুরাণ ও বাংলাসাহিত্য ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে শঙ্খের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সাহিত্যে শঙ্খের প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ করলে এই শিল্পের বহুল ঐশ্বর্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

শঙ্খশিল্প উদ্ভবের পৌরাণিক কাহিনীটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। *দেবীভাগবত* পুরাণে উল্লেখ আছে: শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামা রাধিকার অভিশাপে শঙ্খচূড় নামে অসুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তপস্যা বলে শঙ্খচূড় ব্রহ্মার কাছ থেকে একটি কবচ লাভ করে দেবতাদের অজেয় হয়। ব্রহ্মার আদেশে ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা তপস্বিনী তুলসীকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করে শঙ্খচূড় সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। তিনি সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্নরদের উপরে এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে দিলেন যে, দেবতারা অসহ্য হয়ে প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মা ও শিবের সঙ্গে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। সব শুনে বিষ্ণু বললেন: 'তোমরা এই শূল নিয়ে যাও, শিব এই শূল দিয়ে তাকে সংহার করবেন। আর আমি তাকে যে কবচ দিয়েছিলাম, তা ব্রাহ্মণ বেশে হরণ করব'।[১] ব্রহ্মা আরও বর দিয়েছিলেন যে, শঙ্খচূড়ের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হলেই তাঁর মৃত্যু হবে। এরপর শিব শঙ্খচূড়ের কাছে গিয়ে নানা স্তুতিবাক্যে দেবতাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু শঙ্খচূড় কিছুতেই রাজী হলেন না। এর ফলে দেবতাদের সঙ্গে শঙ্খচূড়ের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কিন্ত কোনো দেবতাই শঙ্খচূড়কে পরাজিত করতে পারলেন না। অবশেষে বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশ ধরে তার কাছ থেকে কবচ গ্রহণ করলেন এবং শঙ্খচূড়ের রূপ ধরে তুলসীর কাছে গিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করলেন। তারপর শিব বিষ্ণু-প্রদত্ত শূল দিয়ে শঙ্খচূড়কে নিহত করলেন। শঙ্খচূড় শাপমুক্ত হয়ে কিশোর গোপবেশে বৃন্দাবনে দিব্যরথে রাধাকৃষ্ণের কাছে পৌঁছলেন। তাঁর অস্থি শঙ্খে পরিণত হলো। *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের* প্রকৃতিখণ্ডেও এ কাহিনী রয়েছে।

শঙ্খ সম্পর্কে অপর একটি কাহিনী *হরিবংশে* পাওয়া যায়: পঞ্চজন নামে এক অসুর ছিলেন। এই অসুর হিরণ্যকশিপুর নাতি ও প্রহ্লাদের পুত্র। তিনি শঙ্খরূপ ধারণ করে সমুদ্রে বাস করতেন। শ্রীকৃষ্ণের গুরু সান্দীপনি মুনির পুত্র একদিন প্রভাততীর্থে স্নান করতে গেলে ঐ অসুর তাকে হরণ করে শঙ্খের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। গুরুদক্ষিণা হিসেবে বরুণের সাহায্যে কৃষ্ণ তাকে নিহত করে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন। মৃত্যুর পূর্বে পঞ্চজন কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন যে, যে-হাতে তার মৃত্যু হলো, সে করস্পর্শ সে যেন চিরকাল অনুভব করতে পারে। কৃষ্ণ তখন নিহত পঞ্চজন অসুরের অস্থি দিয়ে এক বিশেষ ধরনের শঙ্খ নির্মাণ করেন। পঞ্চজন অসুরের অস্থি দ্বারা নির্মিত বলে কৃষ্ণের শঙ্খের নাম হলো পাঞ্চজন্য শঙ্খ। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ধর্মের প্রতি পঞ্চজন অসুরের আনুগত্য দেখে কৃষ্ণ তাকে আরো বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। এছাড়াও পঞ্চজন অসুরকে তিনি বলেন যে, সন্ধ্যাকালে যে গৃহে নিয়মিত শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হবে, সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের আসন হবে চিরস্থিতিশীল; আর গঙ্গাজলের অভাবে কোনো গৃহে ধর্মকর্মের বিঘ্ন হলে, শঙ্খবারিই সর্বতীর্থবারির কাজ করবে।[২]

শঙ্খ সম্পর্কে নতুন একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা ব্রতচারী আন্দোলনের পথিকৃৎ-সংগঠক গুরুসদয় দত্ত তাঁর *পটুয়া সঙ্গীত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত একটি ছড়ার উল্লেখ করে এই পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে শঙ্খশিল্পের উদ্ভবের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> নিজেদের আঁকা পটচিত্র গ্রাম-গ্রামান্তরে দেখিয়ে বেড়াবার সময় পটুয়ারা শিব-পার্বতীবিষয়ক একটি কিংবদন্তি ছড়ার সুরে গেয়ে শোনাতেন। পার্বতী একবার শিবের কাছে একজোড়া শাঁখার জন্য অনুরোধ করলে চিরদরিদ্র শিব তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। দুর্গা বারংবার অনুরোধ করলেও শিব কিছুতেই শঙ্খ দিতে সম্মত হলেন না। শোকে-দুঃখে অভিমানিনী দুর্গা পিতৃগৃহে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও দুর্গা স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন না দেখে শিব চিন্তিত হলেন। তিনি শাঁখারির ছদ্মবেশ ধারণ করে দুর্গার কাছে গেলেন শাঁখা বিক্রি করতে। পার্বতী মহানন্দে শাঁখা পড়তে বসলেন। কিন্তু শাঁখা পরবার সময় সব শাঁখাই ভেঙে গেল। ছদ্মবেশী শিব তখন বললেন, পতিভক্তির অভাব না ঘটলে শাঁখা পরবার সময় এভাবে তা ভেঙে যাবার কথা নয়, একথা শুনে দুর্গা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি শাঁখারির দিকে এমন জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন যে, সে-দৃষ্টিকোপে শাঁখারির ভস্মীভূত হয়ে যাবার কথা। কিন্তু কী আশ্চর্য, শাঁখারির কিছুই হলো না। তখন দুর্গা বুঝতে পারলেন যে, এই শাঁখারিই হচ্ছে ছদ্মবেশী শিব। অতঃপর শিব দুর্গাকে নতুন একজোড়া শাঁখা পরিয়ে দিলেন। স্বামীর কাছ থেকে শঙ্খ উপহার পেয়ে শিবপত্নী পার্বতী স্বামীর সঙ্গে আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।[৩]

বিবাহিত হিন্দু-নারীরা দাম্পত্যসুখের প্রতীক হিসেবে যে শঙ্খ পরিধান করে, এ কাহিনীটি সম্ভবত তারই উৎস।

শঙ্খশিল্প উদ্ভবের চতুর্থ পৌরাণিক কাহিনীটিও বেশ আনন্দদায়ক: একবার দেবসভায় এক বিশেষ আনন্দ-অনুষ্ঠানে শিব-দুর্গা আমন্ত্রিত হন। কিন্তু অনুষ্ঠানে যেতে দুর্গা মহাসংকটে পড়লেন। স্বর্গলোকে সকল দেবীর দেহে যেখানে অলংকার শোভা পাবে, সে-সভায় তিনি নিরাভরণ বেশে কেমন করে যাবেন? বিব্রত শিব বিশ্বকর্মার সহায়তা কামনা করলেন। বিশ্বকর্মা শিবকে জানালেন যে, বসুন্ধরার সকল রত্ন ইতোপূর্বেই আহৃত হয়েছে এবং সে-সব মণিময় আভরণে সজ্জিত হয়েই দেবীরা স্বর্গলোকের আনন্দ অনুষ্ঠানে যাবেন। বিশ্বকর্মা আরো জানালেন যে, একমাত্র সিন্ধুতলের শঙ্খই অবশিষ্ট আছে, তা দিয়ে তিনি দুর্গার জন্য উৎকৃষ্ট অলংকার তৈরি করে দিতে পারেন। অগত্যা শিব তাতেই সম্মত হলেন। দুর্গা যখন শঙ্খ-অলংকার পরে দেবসভায় গেলেন, তখন শঙ্খের উজ্জ্বল শুভ্র আলোয় দেবীদের রাশি রাশি উজ্জ্বল অলংকার ও মণিমাণিক্য ম্লান হয়ে গেল। সেই থেকে বিবাহিত হিন্দুনারীর শ্রেষ্ঠ অলংকার হলো দু'গাছি শুভ্র শঙ্খবলয়।[৪]

২.

শঙ্খ কখনো মঙ্গলধ্বনি রূপে, কখনো বাদ্যযন্ত্র আবার কখনো-বা অলংকাররূপে প্রকাশ পেয়েছে। আবার কখনো অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে কম্বু, শাঁখ, শঙ্ক, শাঙ্ক প্রভৃতি শব্দ শঙ্খের প্রতিশব্দ হিসেবে পাওয়া যায়। এছাড়াও শঙ্খের প্রসঙ্গ কখনো এসেছে লোকবাদ্য রূপে, কখনো মাঙ্গলিক উপকরণ রূপে আবার কখনো-বা শ্বেতবর্ণের উপমা হিসেবে। প্রাচীনকালে

বাঙালি নারীর কাছে শঙ্খের অলংকারই ছিল অমূল্য সম্পদ। বাঙালি নারী শঙ্খবলয় পেলেই সবচেয়ে বেশী খুশি হতেন। তাই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্যের বহু স্থানে শঙ্খের অলংকার যে খুব জনপ্রিয় ছিল তা উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি।

মহাকবি কালিদাস *মেঘদূতম্* কাব্যে যক্ষকে অলকা নগরী থেকে রামগিরি পর্বতে এক বছরের জন্যে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যক্ষ মেঘকে তার প্রিয়ার কাছে দূত করে পাঠালেন। পথের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে উজ্জয়িনী নগরীর সৌধরূপ, বিদ্যুল্লতার মতো স্ফুরিত, বিলসিত উজ্জয়িনীবধূর চকিত চাহনির সৌন্দর্য মেঘ যেন প্রাণ ভরে দেখতে পারে সেজন্য যক্ষ উজ্জয়িনী নগরীতে কিছু সময় অবস্থান করার জন্য মেঘকে অনুরোধ করেন। উজ্জয়িনীর বিপনি বিতানগুলো যে কত সুন্দর এবং সেখানে যে কতরকম অলংকার রয়েছে সেটা বর্ণনা করতে গিয়েই কালিদাস শঙ্খের প্রসঙ্গ এনেছেন:

হারাং স্তারাং স্তরলগুটিকান্ কোটিশঃ শঙ্খশূক্তীঃ
শম্পশ্যামান্মরকতমণীনুন্ময়ুখ প্ররোহান্।
দৃষ্ট্বা যস্যাং বিপণিরচিতান্ বিদ্রমাণাঞ্চ ভঙ্গা-
ন্সংলক্ষ্যন্তে সলিলনিধয়স্তোয়মাত্রাবশেষাঃ ॥[৫]

অর্থাৎ, এই উজ্জয়িনী নগরীতে বিপণি বিতানসমূহে অসংখ্য সজ্জিত হারমালা, পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বলমণি, শঙ্খশুক্তি দীপ্ত শস্য-শ্যামল মরকত মণি ও প্রবালখণ্ড দেখে মনে হয় রত্নাকর সমুদ্রে শুধু জল রয়েছে।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের মহাকবি মাঘের *শিশুপালবধম্* মহাকাব্যের দশম সর্গে নারীদের পরিধেয় অলংকার হিসেবে শঙ্খের উল্লেখ আছে:

অংশুকং হৃতবতা তনুবাহুস্বস্তিকাপিহিতমুগ্ধকুচাগ্রা।
ভিন্নশঙ্খবলয়ং পরিণেত্রা পর্যরম্ভি রভসাদচিরোঢ়া ॥[৬] (১০/৪৩)

অর্থাৎ, নববধূর পরিধেয় বসন কেড়ে নেওয়ায় সে সুন্দর কুচাগ্রকে স্বস্তিকাচিহ্ন রচনা করে ঢেকে রেখেছিল, এ অবস্থায় পতি তাকে সজোরে আলিঙ্গন করায় তার শঙ্খ ও বলয় ভেঙে গিয়েছিল।

ঐ মহাকাব্যেরই ত্রয়োদশ সর্গে নারীর হাতের অলংকার হিসেবে শঙ্খের উল্লেখ আছে:

অধিকোন্নমদ্ঘনপয়োধরং মুহুঃ প্রচলৎকলাপিকলশঙ্খকস্বনা।
অভিকৃষ্ণমঙ্গুলিমুখেন কাচন দ্রুতমেককর্ণবিবরং ব্যঘট্টয়ৎ ॥[৭]

অর্থাৎ, কোনো এক রমণী শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে কানের রন্ধ্র কুণ্ডয়নে ব্যস্ত ছিল, তখন হাত তোলাতে তার নিবিড় স্তনযুগল আরও উন্নত হলো এবং তার সঞ্চালিত হাতের শাঁখা থেকে ময়ূরের রবের ন্যায় অব্যক্ত মধুর ধ্বনি হতে লাগল।

শঙ্খ কেটে যে বিভিন্ন আকৃতির শাখা বানানো হতো তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভূষণ রূপে শঙ্খের উল্লেখ আছে :

যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥[৮]

ঐ একই কাব্যের দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপে বর্ণনা করেছেন:

আহ্মা না চিহ্নসি তোত্রঁ মুগধী গোআলী।
শঙ্খ চক্রআহ্মো গদা শারঙ্গ ধরী ॥[৯]

আবার, ঐ কাব্যের তাম্বুলখণ্ডে দেখা যায়, বড়াই রাধার কোনো খোঁজ না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণ বড়াই-এর কাছ থেকে রাধার রূপের বর্ণনা শুনতে চাইলেন। তখন বড়াই কোমলাঙ্গী রাধার অপরূপ রূপের যে বর্ণনা করেন তাতে শঙ্খের প্রসঙ্গও এসেছে:

কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে ॥
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে॥[১০]

বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণে* বিবাহ উপলক্ষে পদ্মা যে শঙ্খ পরিধান করেছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়:

দুই হাতে তাড় দিল দেখিতে শোভন।
শঙ্খের সমুখে দিল সুবর্ণ কঙ্কণ ॥
পায়ে খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাসলি।
পরম সুন্দর জেন সোনার পুতুলি ॥[১১]

দেবসভায় নাচের সময় বেহুলা যে সব অলংকার পরিধান করেছিল, শঙ্খ-বলয় তার অন্যতম:

সিঁথায় সিন্দুর পরে নয়নে কজ্জল।
গলে শতেশ্বরী হার শ্রবণে কুণ্ডল ॥
দ্বিভুজে সরল শঙ্খ অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
নর্ত্তকীর বেশ যেন স্বর্গবিদ্যাধরী ॥[১২]

আবার, ঐ একই *পদ্মাপুরাণেই* দেখা যায় লক্ষ্মীন্দর যখন বাসর ঘরে মৃত্যুবরণ করেন, তখন বেহুলার হাতে শঙ্খনির্মিত অলংকার ছিল:

কে কে জাগরে তোরা গাররিয়া ওঝা
বাসরেতে ঢলিয়াছে চম্পকের রাজা।
হাতের শঙ্খ মলিন না হইল মাথার পঞ্চফুল
কান্দিতে কান্দিতে বেউলা হইল ব্যাকুল ॥[১৩]

শ্রীরায় বিনোদের *পদ্মাপুরাণেও* শঙ্খনির্মিত অলংকার ব্যবহারের প্রসঙ্গ জানা যায় :

রতন কঙ্কণ সঙ্গে শঙ্খ পরিল রঙ্গে
হেম-মণি তুঙ্গুরী বিরাজে ॥[১৪]

রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি ও ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের *বেণু ও বীণা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সহমরণ' কবিতায়ও অলংকার হিসেবে শঙ্খের প্রসঙ্গ এসেছে :

খ'য়ের রাশি ছড়িয়ে পথে
চল্‌ল নিয়ে শবের সাথে
যেথায় শ্মশান-ঘাট।
গুঁড়িয়ে শাঁখা, সবাই মিলে,
চিতায় মোরে বসিয়ে দিলে
বাজল শতেক শাঁখ।[১৫]

বুদ্ধদেব বসুর *লাল মেঘ* (১৯৩৪) উপন্যাসের নায়িকা শোভা হাতের শাঁখা আর কপালের সিঁদুরকে তার অস্তিত্বেরই স্মারক বলে মনে করেন। প্রসঙ্গক্রমে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

> কাঁধ পর্যন্ত উঁচু বালিশে ঠেশান দিয়ে শোভা বসে আছে, তার নাকটা ঝুলে পড়েছে ঠোঁটের উপর। এককালে নাকটা দেখতে মন্দ ছিলো না, এখন তার মাংসহীন ঢিলে মুখে কেমনতর খাপছাড়া ঠেকে। শীর্ণ হাতে খোঁচা-খোঁচা হাড় ফুটে উঠেছে। চুড়িগুলো খুলে নেয়া হয়েছে অনেক আগেই, শোভা নিজের হাতেই একদিন খুলেছিলো। সে যে কত শুকিয়ে গেছে তার অমন একটা প্রমাণ আর দরকার নেই। একটা প্রমাণ তবু রইলো বাঁ হাতে তার শাঁখা, তার এয়োতির চিহ্ন, সূক্ষ্ম কাজ করা ঢাকাই শাঁখা। জিনিসটা ছোট্ট আর সুন্দর, কিন্তু এখন তা দেখায় যেন প্রকাণ্ড সাদা একটা চাকা দাঁত বের করে রয়েছে। সেটা শোভা ছাড়বে না। যদি সে মরে, সেই শাঁখা আর কপালময় সিঁদুর নিয়ে মরবে, সধবার পরম গৌরব নিয়ে। মরতে মরতেও সে স্বামীকে বেঁধে রাখবে তাঁর হাতে, ঐ শাঁখার সাদা চাকার মধ্যে—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার স্ত্রীত্বের সগৌরব বিজ্ঞাপন। মৃত্যুতেই কি এর সমাপ্তি—এ যে জন্ম—জন্মান্তরের।[১৬]

৩.

মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র রূপে আবার কখনো যুদ্ধের সূচনায় শঙ্খ যে সাহিত্যের বহু স্থানে উল্লিখিত হয়েছে, তা নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

রাজকুমার অজ ও ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র রূপে শঙ্খধ্বনির প্রয়োগ হয়েছিল সে কথা কালিদাস তাঁর *রঘুবংশম্* কাব্যের ষষ্ঠসর্গের নিম্নোক্ত চরণ দুটিতে তুলে ধরেছেন:

পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধত-নৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাত-শঙ্খে পরিতো দিগন্তাংস্তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে ॥[১৭] (৬/৯)

অর্থাৎ, মাঙ্গলিক তূর্যধ্বনিতে দিগন্ত পরিপূর্ণ হলো, শত শত শঙ্খ বেজে উঠল, সেই তূর্যস্বনকে জলদের মন্ত্র-ধ্বনি মনে করে প্রাসাদের উপকণ্ঠবর্তী উদ্যানবাসী শিখণ্ডিসমূহ পুচ্ছ বিস্তার করে নৃত্যে মেতে উঠল।

রঘুবংশম্ কাব্যের সপ্তম সর্গে রাজকুমার অজ যখন স্বয়ংবর সভা শেষে ইন্দুমতীকে নিয়ে নিজ রাজ্যের উদ্দেশে রওনা হলেন তখন স্বয়ংবর সভার অন্য রাজন্যবর্গ ইন্দুমতীকে না পেয়ে হতাশ হয়ে অজকে পথিমধ্যে অতর্কিতে আক্রমণ করলেন। কমনীয় কান্তি অপ্রমত্ত অজ সকলকে পরাজিত করে অধরে শঙ্খ স্থাপন করে ধ্বনি করতে লাগলেন :

ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেঽধরোষ্ঠে নিবেশ্য দধৌ জলজং কুমারঃ।
তেন স্বহস্তার্জিতমেকবীরঃ পিবন যশো মূর্ত্তমিবাবভাসে ॥[১৮] (৭/৬৩)

অর্থাৎ, তারপর বীরোত্তম কুমার প্রেয়সী-পরিভুক্ত অধরোষ্ঠে শঙ্খস্থাপন করে ধ্বনি করতে লাগলেন। শ্বেতকান্তি শঙ্খ কুমারের ওষ্ঠ সংলগ্ন হওয়ায় মনে হলো, তিনি বুঝি স্বহস্তের দ্বারা অর্জিত মূর্তিমান যশোরাশিই পান করছেন। তখন তাঁকে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছিল।

ঐ সর্গে শঙ্খকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবেও দেখানো হয়েছে:

শঙ্খস্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাস্তং সন্নশত্রুং দদৃশুঃ স্বযোধাঃ।
নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমা শশাঙ্কম্ ॥[১৯] (৭/৬৪)

অর্থাৎ, চিরপরিচিত সেই শঙ্খধ্বনি শুনে তাঁর যোদ্ধাগণ ফিরে আসে এবং মুকুলিত কমলদলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজমান অজকে অচেতন অবস্থায় শত্রুসৈন্যদের মধ্যে দেখতে পায়।

দ্বাদশ শতকের কবি শ্রীহর্ষ তাঁর *নৈষধচরিতম্* মহাকাব্যে শঙ্খকে মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র রূপে উল্লেখ করেছেন:

নাল্পভক্তবলিরন্ননিবেদ্যৈস্তস্য হারিণমদেন স কৃষ্ণঃ।
শঙ্খচক্রজলজাতবদর্চঃ শঙ্খচক্রজলপূজনয়াভূৎ ॥[২০]

অর্থাৎ, তাঁর অন্নের নৈবেদ্যে সেই শ্রীবিষ্ণুর কাছে ভোজ্যবস্তুর উপহার প্রচুর হয়ে উঠল, (তাছাড়া তিনি বলিরাজকে অসামান্য ভক্তরূপে পেয়েছিলেন), কস্তুরীতে সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ হলেন এবং শঙ্খগুলোর চক্র !অর্থাৎ সমষ্টি থেকে জল দিয়ে পূজা করার ফলে যেন তাঁর প্রতিমা শঙ্খ, চক্র ও পদ্মযুক্ত হলো।

আবার ঐ মহাকাব্যের একবিংশ অধ্যায়ে শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা প্রসঙ্গে শঙ্খের উল্লেখ আছে :

ত্যজ্যতে ন জলজেন করস্তে শিক্ষিতুং সুভগভূয়মিবোচ্চৈঃ।
আননং চ নয়নায়িতবিম্বঃ সেবতে কুমুদহাসকরাংশুঃ ॥[২১] (২১/১০০)

অর্থাৎ, জলজ পদ্ম ও শঙ্খ রক্তিমা ইত্যাদি সৌভাগ্য ভালোভাবে শেখার জন্যে তোমার হাত ছেড়ে থাকে না। আর কুমুদ ফুল ফোটায় যে চাঁদের কিরণ, সেই চাঁদের বিম্ব (তোমার বাঁ) চোখ হয়ে তোমার মুখমণ্ডলের সেবা করে।

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের নাট্যকার ভাস রচিত *দূতবাক্যম্* নাটকে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বদিন কে দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যবলের সেনাপতি হবে—এ নিয়ে যখন মন্ত্রণা করছিলেন, তখন স্থির হলো গঙ্গাতনয় বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মই এই পদের উপযুক্ত। আর তখনই সৈন্যদের কোলাহলের মধ্যে প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি শোনা গেল:

সেনানিনাদপটহস্বনশঙ্খনাদৈ-
শ্চণ্ডানিলাহতমহোদধিনাদকল্পৈঃ।
গাঙ্গেয়মূর্ধ্নি পতিতৈরভিষেকতোয়ৈঃ
সার্ধং পতন্তু হৃদয়ানি নরাধিপানাম্ ॥[২২] (শ্লোক নং ৫)

অর্থাৎ, প্রচণ্ডবায়ুবেগে তাড়িত সমুদ্রের গর্জনের মতো সৈন্যদের কোলাহল, ঢাকের আওয়াজ এবং শঙ্খধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিষেকবারিসহ সব নৃপতির হৃদয় গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেবের মস্তকে পতিত হোক।

ভাসের আরেকটি নাটক *দূতঘটোৎকচম্*-এ দেখা যায়, অভিমন্যুকে হত্যা করার পর কৌরবদের উল্লাসে মেতে উঠতে দেখে অর্জুন কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন। প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সমগ্র পাণ্ডব-শিবির হর্ষধ্বনি করে উঠল। ভুবনকম্পিত সেই হর্ষধ্বনি শুনে দুর্যোধন বললেন:

'জয়ত্রাত, গচ্ছ, পাণ্ডবশিবিরে শঙ্খ-পটহ-সিংহনাদ-রবোন্মিশ্রঃ কিংকৃতোঅ২য়ং শব্দ ইতি জ্ঞায়তাম্।'[২৩]

অর্থাৎ জয়ত্রাত, পাণ্ডবশিবিরে যাও, জেনে এসো শঙ্খ, ঢক্কা এবং সিংহনাদ মেশানো এ শব্দ কীসের জন্য? সুতরাং এখানেও শঙ্খ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের নাট্যকার বিশাখদত্তের রচিত *মুদ্রারাক্ষসম্* নাটকটি মগধের রাষ্ট্রবিপ্লবোত্তর কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। নন্দরাজবংশের অমাত্য রাক্ষস আত্মগোপন করে ঘুরতে ঘুরতে কুসুমপুরের কাছে পরিত্যক্ত এক জীর্ণ উদ্যানে এসে বসলেন। তখন হঠাৎ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে শঙ্খের ধ্বনি শুনতে পেলেন :

> জোর ঢাকের বাজনা, শঙ্খের ধ্বনি মিলে এক বিরাট উৎসবের কলকল। এ শব্দ এত তুমুল যে শ্রোতাদের অসহায় কর্ণেন্দ্রিয়ের কষ্ট হচ্ছে, এত বিপুল এ শব্দ প্রাসাদগুলির মধ্যে প্রবেশ করে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সহসা নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে। প্রাসাদগুলি যেন পূর্বে পান করা অপ্রমেয় ঐ শব্দকে আত্মসাৎ করতে না পেরে পরে বমি করে ফেলেছে। ঐ আনন্দ-নাদ প্রবল পটহ ও শঙ্খ ধ্বনির সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন কৌতূহল বশে দিঙ্মণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করবার জন্যই চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।[২৪]

সপ্তম শতকের নাট্যকার ভট্টনারায়ণ তাঁর *বেণীসংহারম্* নাটকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে শঙ্খকে প্রয়োগ করেছেন। চতুর্থ অঙ্কে কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন এবং সেই শঙ্খের প্রতিধ্বনি চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল:

> এতস্মিন্নন্তরে জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ পরিভবশঙ্কিনা ধনঞ্জয়েন বজ্রনির্ঘাতনির্ঘোষ-বিষম-রসিত-ধ্বজাগ্রস্থিত-মহাবানরঃ তুরঙ্গম-সংবাহনব্যাপৃতবাসুদেবশঙ্খচক্রাসিগদালাঞ্ছিতচতুর্বাহুদণ্ড আপুরিতপাঞ্চজন্যদেবদত্ত। তাররসিতপ্রতিরবভরিতদশদিশামুখকুহরো ধাবিতস্তমুদ্দেশং রথবরঃ।[২৫]

অর্থাৎ, এই সময় ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীমের পরাজয় আশঙ্কা করে দ্রুতগতিতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রথ চালনা করলেন। সেই রথের চূড়ায় একটি বানর বসে বজ্রপাতের মতো ভয়ংকর শব্দ করছিল। অশ্ব পরিচালনে ব্যস্ত শ্রীকৃষ্ণের চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি থাকায় তাঁকে বিষ্ণুর মতো মনে হয়েছিল এবং সেই থেকে পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত নামক দুটি শঙ্খনাদের প্রতিধ্বনি চতুর্দিক পূর্ণ করেছিল।

আবার ঐ একই নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে দুর্যোধনের বন্ধু রাক্ষস ছদ্মবেশে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে জানালেন যে, গদাযুদ্ধে ভীম-অর্জুন দুজনেই মারা গেছেন। একথা শুনে তাঁরা চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার কথা যখনই চিন্তা করলেন তখনই দ্রৌপদী শঙ্খধ্বনি শুনতে পেয়ে বললেন: 'মহারাজ, কস্যাপ্যেষ বলদর্পিতস্য বিষমঃ শঙ্খনির্ঘোষঃ শ্রূয়তে।'[২৬] অর্থাৎ মহারাজ! বলদর্পিত কোনো তেজস্বী ব্যক্তির বিষম শঙ্খ-নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে।

মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের রচনায়ও নানাভাবে শঙ্খের প্রসঙ্গ এসেছে। শাহ মুহম্মদ সগীর ইউসুফ *জোলেখা* কাব্যে লিখেছেন যে, ইউসুফ যখন জুলেখাকে বিয়ে করার আয়োজন করেন তখন সেই বিবাহ বাসরে লোকনৃত্য ও লোকবাদ্যের আয়োজন করা হয়। সেই বিবাহ বাসরে ঢাক, ঢোল, কাঁশি, মন্দিরা, মৃদঙ্গ ও শিঙ্গার সাথে শঙ্খও ছিল :

> জথ বাদ্য ভাণ্ড আছে সর্বরাজ্য দেশ।
> পঞ্চ শব্দে বাদ্য কাজে পূরিয়া বিশেষ ॥

ঢাক ঢোল দণ্ডী কাঁসী দুন্দুভি নিশান।
মন্দিরা মাদল ভাল তবল বিষাণ ॥
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহুল।
শঙ্খনাদ সিঙ্গা ভেরী বাজত্র তুম্বুল ॥
জয়তুর সর্মণ্ডলা জন্ত্র তন্ত্র পুর।
নৃত্যগীতে নৃত্যক নাচএ জেহ্ন সুর ॥
ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনকার
বাঁশী কাঁসী চৌরাশী বাজন অনিবার ॥
সানাই বর্গোল বাজে ভেউর কর্ণাল।
করতাল মন্দিরা বাজত্র সুমঙ্গল ॥[২৭]

সৈয়দ আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যে শঙ্খ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে:

প্রভাতে উঠিয়া নৃপ করিল পয়ান।
শঙ্খ শিঙ্গা ডম্বরু বাজায় ঘন সান ॥
সকলেরে নৃপতি কহিল অনুরাগে।
সাবধানে চলিও বিকট পন্থ আগে ॥[২৮]

রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে শঙ্খের সুমিষ্ট ধ্বনির কথা বলেছেন:

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা,
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ...
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
শঙ্কট দুঃখ ত্রাতা ...।[২৯]

আবার,

ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।[৩০]

কবি অমিয় চক্রবর্তীর *মাটির দেওয়াল* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বিধুবাবুর মতো' কবিতাতেও বিবাহ বাসরে মঙ্গলময় শঙ্খধ্বনির কথা পাওয়া যায়:

না, মরীচিকা-হরা ভ্রান্তি -
দূর - করা মেঘমেদুর ভালোবাসা ?
পাড়ার মেয়ের বিয়ের শঙ্খ, সারাদিন বাজাচ্ছে সানাই
আমি কী করে জানাই।[৩১]

৪.

সাহিত্যের অনেক স্থানে অস্ত্র হিসেবেও শঙ্খের প্রয়োগ হয়েছে। নিম্নে প্রায়োগিক স্থানগুলো উল্লেখ করা হলো :

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের মহাকবি মাঘ *শিশুপালবধম্* মহাকাব্যের প্রথম সর্গে অস্ত্র হিসেবে শঙ্খের উল্লেখ করেছেন :

বিভিন্নশঙ্খঃ কলুষীভবন্মুহুর্মদেন দন্তীব মনুষ্যধর্মণঃ।
নিরস্তগাম্ভীর্যমপাস্তপুষ্পকং প্রকম্পয়ামাস ন মানসং ন সঃ ॥[৩২] (১/৫৫)

অর্থাৎ, হাতি যেমন মদমত্ত হয়ে শঙ্খ ভেঙে ফেলে জল ঘোলা করে, মাটি দিয়ে গভীরতা নষ্ট করে, ফুল তুলে মানস সরোবরকে কম্পিত করে, তেমন নিরাবণ বলদর্পে মনুষ্যের ধর্মযুক্ত কুবেরের শঙ্খ নামক নিধি বিদারণ করে, তাঁকে ক্ষুব্ধ করে, তাঁর ধৈর্য নষ্ট করে ও পুষ্পকবিমান অপহরণ করে। এতে তার হৃদয়ও কম্পিত হয়।

মনসামঙ্গল কাব্যে নারদের দ্বারকায় যাওয়ার সময় সকলে যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, সেখানে শঙ্খ অস্ত্র হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে:

শঙ্খ-চক্র-গদা হাতে কামের তনয়।
স্বপনে ঊষার সঙ্গে হৈলা পরিচয় ॥[৩৩]

বাংলা রেনেসাঁসের সার্থক প্রতিনিধি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর সৃষ্টি *মেঘনাদবধ* কাব্য-এর ষষ্ঠ সর্গে নায়ক মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ) লক্ষ্মণের আক্রমণ প্রতিহত করতে হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন, তাই-ই তিনি লক্ষ্মণকে নিক্ষেপ করেছিলেন। এর মধ্যে শঙ্খও একটি ছিল :

অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্র বলে, কভু না হানিলা
রথচূড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে ![৩৪]

৫.

অলংকার, বাদ্যযন্ত্র এবং অস্ত্র ছাড়াও শঙ্খ কখনো মাঙ্গলিক উপকরণরূপে, কখনো শ্বেতবর্ণের উপমারূপে আবার কখনো-বা উদ্দীপনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

কালিদাস *মেঘদূতম্* কাব্যের উত্তরমেঘে অলকা নগরীর অপরূপ সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরেছেন। যক্ষপতি কুবেরের প্রাসাদের উত্তরদিকে শঙ্খপদ্ম চিত্রিত যক্ষের গৃহ। সেই গৃহেতে তার বিরহ-কাতরা পত্নী রয়েছে তার কাছে যাওয়ার জন্যে যক্ষ মেঘকে বলছে:

এভিঃ সাধো! হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥[৩৫]
(উত্তরমেঘ ১৯)

অর্থাৎ, হে সাধো, আমি বুঝতে পারছি, আমার হৃদয়ে বিরাজমান গৃহের ছবি তোমারও হৃদয়ে রয়েছে। আমার গৃহদ্বারে শঙ্খ এবং পদ্ম আঁকা আছে। তাই দেখে তুমি আমার ভবনটি চিনতে পারবে। আমার বিরহে সেই গৃহে আর কোনো সৌন্দর্য নেই। কেননা, সূর্যের অভাবে পদ্মফুল কখনও নিজ শোভা ধারণ করে না।

রঘুবংশম্ কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে রাম-সীতা পুষ্পক রথে চড়ে শান্ত আকাশ পথে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরছিলেন। ফেরার পথে রামচন্দ্র সিন্ধুর শোভা সীতাকে অবলোকন করাতে গিয়ে শঙ্খের অপরূপ দৃশ্য দেখাতে লাগলেন :

তবাধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্ম্মিবেগাৎ।
উদ্ধাঙ্কুরপ্রোত-মুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খ-যূথম্ ॥[৩৬] (১৩/১৩)

অর্থাৎ, বিম্বোষ্ঠে! ঐ দেখ, তোমার অধরের ন্যায় রক্তাভ বিদ্রুম-বৃক্ষের উপর, তরঙ্গবেগে আহত ও উত্থিত হয়ে কেমন করে শঙ্খগুলি এসে পড়ছে এবং বিদ্রুমের উর্ধমুখ সূতীক্ষ্ণ অঙ্কুর বা শাখার অগ্রভাগে একেবারে বেঁধে যাচ্ছে; আহা! কত কষ্টে শঙ্খনিচয় ঐ অঙ্কুর হতে আপনাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে।

সপ্তম শতকের নাট্যকার শ্রীহর্ষ প্রণীত ব্যতিক্রমধর্মী নাটক *নাগানন্দম্*। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের বেলাভূমিতে বেড়াতে গিয়ে শুভ্র শঙ্খের কথা বলেছেন:

উন্মজ্জজ্জলকুঞ্জরেন্দ্র-রভসাস্ফালানুবন্ধোদ্ধতঃ
সর্বাঃ পর্বতকন্দরোদরভূবঃ কুর্বন্ প্রতিধ্বানিনীঃ।
উচ্চৈরুচ্চরতি ধ্বনিঃ শ্রুতিপথোন্মাথী যথায়ং তথা
প্রায়ঃ প্রেঙ্খদসংখ্য-শঙ্খধবলা বেলেয়মাগচ্ছতি ॥[৩৭] (৪/৩)

অর্থাৎ, জলে ভেসে ওঠা বড় জলহস্তিগুলোর সদা ও প্রচণ্ড আঘাতে সোচ্চার শব্দ যখন সমস্ত গিরিগুহার ভিতরে প্রতিধ্বনিত করে কর্ণকুহরকে আহত করছে, তখন বোঝা যাচ্ছে বহু চলমান শঙ্খে শুভ্র জলোচ্ছ্বাস প্রায় এসে গিয়েছে।

সৈয়দ আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যে মাঙ্গলিক উপকরণ হিসেবে শঙ্খের প্রসঙ্গ এসেছে:

মহীগন্ধ শিলাধান্য দূর্বা পুষ্পফল।
দধি ঘৃত শঙ্খ আর সিন্দুর কাজল ॥
স্বস্তিক গোচনা সঙ্গে সিদ্ধার্থ কাঞ্চন।
রৌপ্য তাম্র কাঁসা আর নির্মল দর্পণ ॥[৩৮]

বলাকা কাব্যের 'শঙ্খ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণ, মঙ্গল আর বরাভয়ের প্রতীক হিসেবে শঙ্খধ্বনির ব্যবহার করেছেন :

বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।
তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।

ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব,
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ ॥ [৩৯]

বলাকা কাব্যগ্রন্থের 'নববর্ষের আশীর্বাদ' কবিতায় বিধাতার আহ্বান শঙ্খ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে:

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী;
ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।

পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা,
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ –
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।[৪০]

জীবনানন্দ দাশের *ঝরা পালক* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'নীলিমা', *মহাপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সিন্ধুসারস' কবিতায় শঙ্খের প্রসঙ্গ এসেছে। 'নীলিমা' কবিতায় দেখা যায়:

ডুবে যায় নীলিমায়, – স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে, নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্ম্মোক
তোমার চকিত স্পর্শে হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক।[৪১]

'সিন্ধুসারস' কবিতায় দেখা যায়:

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রান
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান।
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ।
জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায় ॥ [৪২]

বুদ্ধদেব বসুর 'শঙ্খ' শীর্ষক কবিতাটিতে শঙ্খ শব্দটি উদ্দীপনা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে :

আজি, জাগ্রত হোক শঙ্খ
ওরে, পঙ্ক-শয়ন করি পরিহার
লভুক প্রেমের অঙ্ক।
ভৈরব সুরে বাজুক মহান
নির্ভীক নিঃশঙ্ক।
মন্দ্রিত হোক, স্পন্দিত হোক
নন্দিত হোক শঙ্খ ...
অন্যায় সাথে বিদ্রোহ করি,
হউক জীবন ধন্য।
দূর হোক ভয় সব সংশয়

মরুক হীনতা দৈন্য,
ধ্বংসের সুরে নৃত্য করুক
বিদ্রোহী যত সৈন্য।
ওরে শঙ্খ,
তোর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হোক
সেই বাণী নিঃশঙ্ক।[৪৩]

৬.

পুরাণ ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনুসন্ধান করলে শঙ্খের আরো বহু তথ্যচিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শঙ্খ অলংকার হিসেবে, আবার কখনো হিন্দু বিবাহিত নারীর অস্তিত্বের স্মারক বা স্বীকৃতির চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আবার অনেক সময় যুদ্ধারম্ভে, যুদ্ধ-বিরতিতে, মঙ্গলসূচক আহ্বানেও শঙ্খধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সাদা রং যেহেতু সত্ত্বগুণের প্রতীক, শঙ্খের রংও সাদা তাই তার ধ্বনি মঙ্গলের প্রতীক এবং আদিকাল থেকেই অমঙ্গল-অশুভকে বিনাশ করার জন্য শঙ্খধ্বনির ব্যবহার হয়ে আসছে। শঙ্খের ধ্বনিটিও শ্রুতিমধুর। সেই সুপ্রাচীন যুগ থেকেই শঙ্খ ধর্মীয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

তথ্যনির্দেশ

১. সুবোধকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *দেবীভাগবত*, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লি., কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৮, পৃ. ২৫৮
২. উদ্ধৃত, সৌগত চট্টোপাধ্যায়, *অথ শঙ্খশিল্প কথা*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ.৫২
৩. গুরুসদয় দত্ত, *পটুয়া সঙ্গীত*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৩৩৯, পৃ. ৩১-৩২
৪. শিপ্রা সরকার, *শঙ্খশিল্প* , বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ৯
৫. কালিদাস, *মেঘদূত*, কানাই লাল রায় (অনূদিত ও সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ৮৫
৬. মাঘ, শিশুপালবধ, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (৫ম খণ্ড), মুরারিমোহন সেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৮, পৃ. ৬৯
৭. ঐ, পৃ. ৮৭
৮. নীলরতন সেন (সম্পা.), *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* (২য় খণ্ড), সাহিত্যলোক, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৯
৯. ঐ, পৃ. ১০৯
১০. ঐ, পৃ, ১৯
১১. বিজয়গুপ্ত, *পদ্মাপুরাণ*, জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পাদিত), নাভানা প্রিটিং ওআর্কস প্রা. লি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ৭৯
১২. ঐ, পৃ. ৪৮০
১৩. ঐ, পৃ. ৪৩১
১৪. শ্রীরায় বিনোদ, *পদ্মাপুরাণ*, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পা.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯৯
১৫. অলোক রায় (সম্পাদিত), *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪, পৃ. ২৩

১৬. বুদ্ধদেব বসু, 'শঙ্খ', বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (১ম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি. কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫২৩-৫২৪
১৭. রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত), *কালিদাসের গ্রন্থাবলী*, বসুমতী কর্পোরেশন লি. কলকাতা, ৭ম সংস্করণ, ১৩৩৯, পৃ.৭৯
১৮. ঐ, পৃ. ১১৬
১৯. ঐ, পৃ. ১১৭
২০. শ্রীহর্ষ, নৈষধচরিত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (১৪ খণ্ড), জ্যোতিভূষণ চাকী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮২, পৃ. ২০৯
২১. ঐ, পৃ. ২১৪
২২. ভাস, দূতবাক্য, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (৯ খণ্ড), জ্যোতিভূষণ চাকী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ২৭৮
২৩. ভাস, দূতঘটোৎকচ,*সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (৯ খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১
২৪. বিশাখ দত্ত, মুদ্রারাক্ষস, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (৫ খণ্ড), মুরারিমোহন সেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৫, পৃ.৩৫৯
২৫. ভট্টনারায়ণ, বেণীসংহার,*সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (৪ খণ্ড), মুরারিমোহন সেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৩, পৃ.৩৪১
২৬. ঐ, পৃ. ৩৬৬
২৭. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ জোলেখা,* মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪, পৃ. ২৪৭
২৮. আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদিত), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮, পৃ. ৭৬
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলাকা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯১৬, সংস্করণ ১৩৭৭, পৃ. ১৬
৩০. ঐ, পৃ. ১১০
৩১. অমিয় চক্রবর্তী, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ভারবি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৩, পৃ. ২২
৩২. মাঘ, শিশুপালবধ,*সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (৫ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
৩৩. বিজয়গুপ্ত, *পদ্মাপুরাণ*, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ১১১
৩৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *মধুসূদন-গ্রন্থাবলী*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৬১, পৃ. ১৭৬
৩৫. কানাই লাল রায় (অনূদিত ও সম্পাদিত), *মেঘদূতম্* , পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৬
৩৬. ঐ, পৃ. ২১২
৩৭. শ্রীহর্ষ, নাগানন্দ,*সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (১৬ খণ্ড), জ্যোতিভূষণ চাকী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ. ২২৩
৩৮. আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলাকা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
৪০. ঐ, পৃ.১১০
৪১. জীবনানন্দ দাশ, *কবিতাসমগ্র*, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সংকলিত ও সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ৪
৪২. ঐ, পৃ. ১৭৯
৪৩. বুদ্ধদেব বসু, 'শঙ্খ', বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৩-৫২৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে বাংলার সমাজজীবন

সাহিনা আক্তার*

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে সাহিত্যকর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্রীধরদাস কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ *সদুক্তিকর্ণামৃত*। ১২০৬ সালে শ্রীধরদাস এই প্রকীর্ণ শ্লোকগ্রন্থটি সংকলন করেন। শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস রাজা লক্ষ্মণ সেনের অধীনে একজন 'মহাসামন্ত চূড়ামণি' বা প্রধান সামন্ত ছিলেন। শ্রীধরদাস নিজে ছিলেন 'মহামাণ্ডলিক' অর্থাৎ, বর্তমানকালে প্রদেশ শীর্ষক প্রশাসনিক ভাগের অধিকর্তা। এই গ্রন্থে প্রায় পাঁচশত কবির লিখিত ২৩৭০টি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এই শ্লোকগুলো বিবিধ প্রকৃতির। এই শ্লোকগুলোতে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে নানা দেবতার লীলা ও দোষগুণ তেমনি আছে বিভিন্ন ঋতু ও প্রকৃতির গাছ, লতাপাতা ও রাজাদের প্রশংসা ও কীর্তির বর্ণনা। তৎকালীন বাংলায় সমাজজীবনের সুন্দর ও বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই সংকলিত গ্রন্থে।]

ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে সেন বংশের শাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে সে যুগের প্রথম দিকটি ছিল পালযুগের অনুবর্তী। সে যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো সাংস্কৃতিক ইতিহাসও ছিল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। পাল রাজবংশের শাসনামলে বৌদ্ধ ধর্মমতের সহজিয়া সাহিত্য ধারায় যে বেগবান গতি ছিল সেন যুগে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তার ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূলত সেন বংশের শাসনামল ছিল বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সেন শাসকগণ নিজেরা যেমন প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তেমনি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশসাধিত হয়। এই সময়ে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো সংকলিত কাব্যগ্রন্থ *সদুক্তিকর্ণামৃত*।

শ্রীধরদাস সংকলিত কাব্যগ্রন্থ হলো *সদুক্তিকর্ণামৃত*। *সদুক্তিকর্ণামৃত* এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীন বাংলায় প্রাপ্ত সংকলিত দ্বিতীয় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ। *সুভাষিতরত্নকোষ* প্রথম সংস্কৃত কোষকাব্য।[১] *সদুক্তিকর্ণামৃত* কাব্য গ্রন্থটি ১১২৭ শকাব্দে (১২০৬ খৃস্টাব্দে) রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস ছিলেন লক্ষ্মণসেন-এর সামন্ত অধিপতিদের মধ্যে

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সবচেয়ে শক্তিশালী সামন্ত।[২] গ্রন্থের শেষে শ্রীধরদাস নিজেকে 'মহামাণ্ডলিক'[৩] বা প্রশাসনিক ইউনিট 'মণ্ডল'-এর একজন শাসক হিসাবে পরিচয় দেন।

সদুক্তিকর্ণামৃতে 'প্রবাহ' নামে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রতিটি প্রবাহ আবার অনেকগুলি 'বীচি' বা তরঙ্গে বিভক্ত। প্রবাহগুলো হলো: 'অমর প্রবাহ', 'শৃঙ্গার প্রবাহ', 'চাটুপ্রবাহ', 'অপদেশ প্রবাহ', এবং 'উচ্চাবচ প্রবাহ'।[৪] এই গ্রন্থে ৪৮৫ জন কবির ২৩৭০টি কবিতা (শ্লোক) আছে। লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, যুবরাজ দিবাকর, উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, আচার্য গোবর্ধন এবং কবিরাজ ধোয়ী ছাড়াও বহু বাঙালি কবির কবিতা (শ্লোক) এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের ১১টি, কেশবসেনের ১০টি, হলায়ুধের ৫টি, শরণের ২০টি, ধোয়ীর ২০টি, উমাপতি ধরের ৯১টি, জয়দেব-এর ৩১টি শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলোতে দেবতাদের বিচিত্র লীলা, প্রেম, অনুরাগ, ঋতুবৈশিষ্ট্য, রাজার প্রশংসা, দেশ, গাছ, লতাপাতা এবং পশু-পাখির বিবরণ প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীধরদাসের *সদুক্তিকর্ণামৃত* এবং বিদ্যাকরের *সুভাষিতরত্নকোষ* গ্রন্থে উদ্ধৃত সাধারণ শ্লোক সংখ্যা ৬৩২টি। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, পরবর্তীকালে শ্রীধরদাস তাঁর সংকলন কাজে পূর্বের বিদ্যাকরের কোষকাব্য হতে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।[৫] ধ্রুপদী যুগের লেখক যেমন কালিদাস, ভবভূতি, অমর, রাজশেখর এবং সমকালীন বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখকের কাব্য থেকে নিয়ে শ্রীধরদাস তাঁর কাব্যগ্রন্থটি সংকলন করেন। তিনি যোগেশ্বর, শতানন্দ, ধরণীধর, বরাহ, অচল, বল্লাল, মনোবিনোদ, শুভঙ্কর, চক্রপাণি, লক্ষ্মীধর প্রমুখ কবির উদ্ধৃতি দেন। সম্ভবত এঁরা সকলেই ছিলেন বাঙালি কবি অথবা নিদেনপক্ষে পূর্বভারতবাসী বা বাংলা, বিহার নিয়ে গঠিত পাল সাম্রাজ্যের অধিবাসী। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কবি শ্রীধরদাস বল্লালসেন, লক্ষ্মনসেন, কেশবসেন প্রমুখ রাজ কবির শ্লোকও গ্রহণ করেন তাঁর এই সংকলনে। রাজা লক্ষ্মণসেন শ্রীধরদাসেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলায় সেন শাসনামল ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিপত্তির যুগ। এই সময় বাংলায় সংস্কৃতভাষা সাহিত্যের চর্চা শীর্ষে পৌঁছে। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ দেবদেবীর ৪৭৫টিরও অধিক শ্লোক উদ্ধৃত করার মাধ্যমে শ্রীধরদাস তাঁর সংকলিত কাব্যগ্রন্থে উপর্যুক্ত দেব-দেবীর প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেন। এতে অন্যান্য বিশ্বাসের তুলনায় বৈষ্ণববাদের প্রতিই তাঁর ঝোঁক বেশি প্রকাশ পায়।

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে সমাজজীবন

শ্রীধরদাসের আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি সংকলিত হয় মূলত বাংলার সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে। এই সংকলিত কাব্যগ্রন্থের শ্লোকগুলিতে তৎকালীন সমাজজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সেন শাসনামলের বাংলার সমাজ বর্ণপ্রথায় বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক দিক থেকেও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যই ধন উৎপাদনের মাধ্যম ছিল।[৬] সমাজে কিন্তু সকল মানুষের সম-অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কারণ তখন রাষ্ট্রই ছিল সকল ক্ষমতার অধিকারী ও সকল কিছুতেই রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় ছিল। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা

বাণিজ্যনির্ভর তৎকালীন সমাজ প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে গড়ে উঠে— সকল অধিকার সংবলিত সুবিধাভোগী শ্রেণী বা ধনিক শ্রেণী, অল্প অধিকার প্রাপ্ত শ্রেণী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সমস্ত অধিকার বঞ্চিত অধিকারহীন শ্রেণী বা দরিদ্র শ্রেণী।

সমাজের ধণিক শ্রেণীর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাজা। এরপর রাজার অধীনে সামন্তরাজা, রাজন্যক, সামন্ত-মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক ও মহামাণ্ডলিকদের স্থান। 'বিষয়পতি', অমাত্য সান্ধিবিগ্রহিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, দণ্ডনায়ক, রাজপণ্ডিত, কুমারামাত্য, মহাসেনাপতি ছিলেন তারপরের স্তরে। এদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ভুক্ত।[৭] এদের পরেই ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থান। ভূমিস্বত্ববান কৃষক বা ক্ষেত্রকর, শিল্পী, ব্যবসায়ী, করণ-কায়স্থ, সূত্রধর, চিত্রকর, রজক, আভীর, নট, কৌয়ালা, তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক প্রভৃতি ছিল এ স্তরের অন্তর্গত। নিম্নবিত্তের অধিকারী ছিল অন্ত্যজ ও আদিবাসী কৌমের মানুষ। এরা শুধু বর্ণগত দিক দিয়ে নয় অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবেও সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ। চণ্ডাল, ব্যাধ, পুলিন্দ, পুক্কস, শবর, বরুড়, ডোম, জোলা, বাগদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের অবস্থান ছিল এই শ্রেণীতে। সমাজের এই নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জীবন অতিবাহিত হতো অত্যন্ত দৈন্যদুর্দশার মধ্য দিয়ে। *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে এর আভাস পাওয়া যায়:

> তার দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র। ক্ষুধায় তার শিশুদের চোখ কুক্ষিগত এবং উদর বসে গেছে। দীনাদুঃস্থা রমণী চোখের পানিতে প্রার্থনা করছে, একমণ তণ্ডুলে তাদের যেন একশত দিন চলে।[৮]

তৎকালীন সমাজে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছিল সাপুড়ে ও ব্যাধ বা শিকারী। তাদের সম্পর্কে *সদুক্তিকর্ণামৃতে* উল্লেখ পাওয়া যায়। উমাপতিধর সাপুড়েদের জীবনাযাত্রার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

> ভাই বিষবৈদ, তোমার মুখোচ্চারিত মন্ত্রপূত ধূলি যাদের মস্তক নত করে, সেই সাপগুলি ছোট। এই সাপটি বৃদ্ধ, যার মস্তক তোমার মত গুণিগণাধ্যুষিত পৃথিবীতে বিচরণ সত্ত্বেও এতটুকু নম্রভাব ধারণ করে না।[৯]

গদাধর বৈদ্য তাঁর রচনায় শিকারীদের জীবন সম্পর্কে লিখেছেন:

> অম্ভো ভজস্ব চিরমস্য যথাভিলাষ-
> মেতন্ন তাণ্ডবয় সৈরিভ কাননং চ।
> দুশ্চেষ্টিতেন যদনেন ভৃশং তবৈষ
> ধক্ষস্তাশয়ো ভবতি নিষ্কলুষস্তড়াগঃ ॥[১০]

হে ব্যাধ, (আমি) কৃতাঞ্জলি হইয়াছি; পৃথিবীতে অনেক প্রকার জীবিকা নাই কি? তুমি পশু-পক্ষিগণকে নিহত করে এই অরণ্যকে কেন বাক্‌শূন্য করিতেছ?[১১]

মানবজীবন ও সমাজজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ধর্মীয় জীবন বা ধর্মাচরণ। ধর্মীয় জীবনের পশ্চাতে থাকে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধ্যান-কল্পনা। কাল ও সময়ের বিবর্তনে এর রূপও পরিবর্তন হয়। বাংলায় এই ধরনের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বাংলায় ছিল ধর্ম-কর্ম-ভাবনা ও সংস্কার, বর্ণ, শ্রেণী ও কৌম ভিত্তিক সমাজ। বাঙালির ধর্মকর্ম যথা পূজা, আচার,

অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি জন ও কৌমের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে বাংলায় ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাসের চিত্র ধরা পড়ে তৎকালীন কবিদের শ্লোকে। লৌকিক দেবতার পূজা অনেক সময় গাছকে কেন্দ্র করে হতো। এই গাছগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা পূজাস্থানগুলোর অবস্থান হতো সাধারণত গ্রামের বাইরে। *সদুক্তিকর্ণামৃতে* নিম্নের শ্লোকে অশ্বত্থ বৃক্ষের গুণকীর্তন করা হয়েছে:

সাক্ষান্নৈষ করোতি কামপি মুদং নাদৃত্য হন্ত্যাপদো
ন প্রীণাতি মনীষিণাং শ্রবণমপ্যাশ্বাসনাসূক্তিভিঃ।
তস্যাম্ভোধিসুতাপতের্ভগবতোধিষ্ঠানমাত্রাদসৌ
দুঃস্বপ্নান্বিনিবেদিতানপহরত্যশ্বত্থভূমীরুহঃ ॥[১২]

এই অশ্বত্থবৃক্ষ সাক্ষাৎ কোন আনন্দ দান করে না; আদর করিয়া (কাহারও) বিপদ দূর করে না; সান্ত্বনা বাক্যে মনীষিগণের কর্ণ তৃপ্ত করে না; শুধু সেই ভগবান লক্ষ্মীপতির অধিষ্ঠান হেতুই সে দুঃস্বপ্নের কথা বলিলে তাহা নষ্ট করে।[১৩]

সদুক্তিকর্ণামৃত অপর একটি শ্লোক লৌকিক পূজা অর্চনার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়:

অসংখ্য পশু বলি দিয়া গ্রাম্য লোকেরা পাথরের পূজা করে, রক্ত দিয়া কান্তার দুর্গার পূজা করে, বৃক্ষতলে ক্ষেতপালের পূজা করে এবং অন্তে তাহাদের যুবতী সহচরীদের লইয়া তূম্বীবীণা বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে বেলের খোলায় মদ্যপান করিয়া আনন্দ উপভোগ করে।[১৪]

এই শ্লোকের বক্তব্য ও কবির ইঙ্গিত হতে এটা বোঝা যায় যে, এ জাতীয় পূজাচার সমাজের নিচু স্তরেই প্রচলিত ছিল। এছাড়া দেখা যায়, এই সমাজে গঙ্গাকে অতি পবিত্র বলে মনে করা হতো।[১৫] *সদুক্তিকর্ণামৃত* ও ধোয়ীর *পবনদূতেও* এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া নদনদী পরিবেষ্টিত এই বাংলায় অসংখ্য সর্পাদি বিদ্যমান থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সাপ ছিল মানুষের ভয়ের কারণ। মানুষ ভয়ে সর্পকে দেবতারূপে কল্পনা করতে থাকে এবং তুষ্টিসাধনের জন্য পূজা শুরু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল সর্পাঘাত হতে রক্ষা পাওয়া। এ ধরনের সর্পভীতি ও পূজার কথা তৎকালীন সাহিত্যে *সদুক্তিকর্ণামৃতে* পাওয়া যায়:

হে প্রভু খঞ্জন, তুমি সর্পফণায় আরোহণের অধ্যবসায় ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। বন্দনার্হ তোমাকর্তৃক আমাদিগকে যে ফল দেয়, তাহা না হউক। দৈববশে যদি প্রদীপ্তগরল এই সর্প তোমাকে দংশন করে, তাহা হইলে বিশ্বদ্রষ্টা এই শরৎকাল নেত্রহীন হইবে।[১৬]

শ্রীধর সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত* কোষকাব্যের বিভিন্ন শ্লোক আবহমান বাংলার খাদ্যশস্য হিসাবে ধান, ইক্ষু ইত্যাদির উল্লেখ আছে:

"পর্যাপ্ত জল পেয়ে ধান চমৎকার গজিয়া উঠেছে। ধেনুগুলো ঘরে ফিরে এসেছে, ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাচ্ছে; কাজেই অন্য কোন ভাবনা নেই; ঘামক্লান্তিমুক্ত স্ত্রী ঘরে এই অবসরে উশীর প্রসাধন করছে; বাইরে আকাশ হতে প্রচুর জল ঝরছে, গ্রাম্য যুবক সুখে শুয়ে আছে। কৃষকের গৃহ এখন কর্তিত শালি ধান্যে সমৃদ্ধ। গরু, বলদ, ছাগলগুলো ঘরে ফিরে নতুন খড় পেয়ে আনন্দিত। দিন শেষে গ্রামে ছড়িয়ে আছে শালিধান। এক মুঠি শুষ্ক তৃণের আশায় পথিক কৃষকের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে তার দানশীলতার তুলনা করে কর্ণের সাথে।[১৭]

সুতরাং, বলা যেতে পারে ধান ছিল বাংলার প্রধান খাদ্যশস্য এবং ভাত ছিল বাঙালির প্রধান খাদ্য। এছাড়া শস্য হিসাবে ইক্ষুর বর্ণনাও আমরা পেয়েছি।[১৮] ইক্ষুর রস, নারিকেলের পানি, দুধ, তালরস প্রভৃতির সংমিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের মদ প্রস্তুত হতো। সাধারণত নিম্নশ্রেণী বা স্তরের লোকেরা এই মদ পান করত। ফল হিসেবে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, তাল ইত্যাদির উল্লেখ তৎকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। *সদৃক্তিকর্ণামৃতের* একটি শ্লোকে আমের সুগন্ধ নির্গত হওয়ার সুন্দর বর্ণনা আছে বলা হয়েছে:

> কোন পুষ্প প্রস্ফুটকালে সুগন্ধিযুক্ত হয়, কোন পাদপ ফলোদ্‌গমে আমোদিত হয়, কোন তরু ফল পক্ব হইলে সুরভিত হয়। কিন্তু এইমাত্র আম্রবৃক্ষ হইতে ফল পাকা পর্যন্ত সুগন্ধ নির্গত হয়।[১৯]

গ্রামীণ নারীদের অনেক বাস্তবচিত্র *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থের বহু কবির কবিতায় পাওয়া যায়। নারীরা সারাদিন ব্যস্ত থাকত তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে। এই গ্রন্থের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে:

> চাঁদের আলোতে দীর্ঘ গীতধ্বনিজনিত আনন্দ উপভোগ করে মেয়েরা মুষল দিয়ে চাল কাঁড়ছে— মুষলোত্তনের ফলে তাদের উৎক্ষিপ্ত বাহুলতার বলয়গুলি আন্দোলিত হচ্ছে। ঘরের চাষী নেই সকালে বাইরে গেছে; তাদের ফিরে আসার সময় হয়ে এসেছে ভেবে মেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে পথ ছেদন করছে; (আবার সেই অবস্থাতেই) হাটের ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য হিসাব করতে তাদের অঙ্গুলিগ্রন্থিগুলি ব্যস্ত।[২০]

ধর্মীয় অনুশাসন এবং বাল্যবিবাহের কারণে প্রাচীনকালে বাংলার মেয়েরা শিক্ষালাভের সুযোগ তেমন পেত না। অবশ্য এই দিক থেকে নগরের অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। তবে *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে গ্রামের সাধারণ নারীদের গান রচনার উল্লেখ আছে। এছাড়া অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পর্দা বা ঘোমটার প্রচলন থাকলেও সমাজের দরিদ্র অসহায় শ্রেণীর চিত্র ছিল আলাদা। এই সমাজে নারীদের স্বামী, সংসার ইত্যাদির কাজে সহায়তা করতে হতো। তাই তাদের ভিতর ঘোমটার বা পর্দার কোনো বালাই ছিল না বা এর কোনো প্রয়োজনও তারা অনুভব করত না।

তৎকালীন সমাজে নারীর কর্তব্যকর্মের মধ্যে ছিল স্বামী, সন্তান ও গুরুজনদের সেবা-যত্ন, অতিথি আপ্যায়ন এবং সাংসারিক অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালন। নারীকে এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হতো পরিবারের গুরুজনদের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে। *সদুক্তিকর্ণামৃতের* একটি শ্লোক কুলস্ত্রীদের উপদেশ দেয়া হয়েছে এভাবে:

> শ্বশুরকে অতিশয় ভক্তি করবে, শ্বশ্রূমাতার পদে
> আনত থাকবে, ভৃত্যদের স্নেহ করবে, দ্বারে সমাগত
> বান্ধব ও স্বজনদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবে।[২১]

তবে নারীর কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন তার স্বামী। তাই উপর্যুক্ত শ্লোকে আরো বলা হয়েছে যে, গৃহে অথবা কুঞ্জে সহচরীরূপে স্বামীকে নিত্য বন্দনা করবে। নারীদের সেকালে বিশেষ কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। তাদেরকে পুরুষের করুণা, বিবেচনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করতে হত। প্রাচীন বাঙ্গালি নারীর পরিবারে ও সমাজে অবস্থান, মর্যাদা ও মূল্য অল্প

কথায় ফুটে উঠেছে *সদুক্তিকর্ণামৃতে*র একটি কবিতায়। কবিতাটির উল্লেখ *সুভাষিরত্নকোষেও* আছে। ক্রুদ্ধা স্ত্রী বিশ্বাসহন্তা স্বামীকে বলেছেন:

আমার পদযুগলের সম্মুখে দয়া করে আনত হয়োনা,
কারণ এটা সত্যি যে স্বামীগণ তাদের নিজেদের প্রভু।
কিন্তু কালের জন্য তুমি অন্যত্র আনন্দ আহরণ করেছো,
এতে দোষ কোথায়?
আমিই পাপী, যেহেতু তোমার অনুপস্থিতিতেও আমি
দেহত্যাগ করিনি,
কারণ তারা বলেন স্ত্রীদের জীবন
স্বামীর জীবনের মধ্যেই নিহিত।
তাই এটা নিশ্চিত যে আমারই তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।[২২]

গ্রামের নারীরা কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকলেও তারা সাজসজ্জা করত। তারা নানা ধরনের অলংকার ব্যবহার করতো যেমন কুণ্ডল, কঙ্কণ, বলয়, নূপুর, মেখলা, মনিমেখলা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে *সদুক্তিকর্ণামৃতে*র একটি শ্লোক বলা হয়েছে:

কুপ হতে রজ্জু দিয়ে পানি তুলে
বার বার পানি সিঞ্চন করছে পামরী
সূত্রচ্ছেদহেতু তার শঙ্খ বলয় গুলি ঝনঝন করছে
সুমধুর গান গেয়ে গ্রাম্য রমণীরা
শীতের চাল কাঁড়ছে
তাদের গানে সুরের সাথে সাথে মিলিত হচ্ছে
তাদের হাতের আন্দোলিত চুড়ির ধ্বনি।[২৩]

এছাড়া আরো একটি শ্লোকে পল্লীনারীদের বেশ-ভূষার বিবরণ পাওয়া যায়:

কপালে কাজলের টিপ
হস্তে ইন্দুকিরণস্পর্ধী-শাদাঁ পদ্মমৃণালের বালা,
কর্ণে কচি রীঠা ফুলের কর্ণাভরণ,
সিঙ্ধ কেশ করবীতে তিলপল্লব পল্লব রমণীদের
এই ভূষণ পথিকদের গতি মন্থর করিয়া আনে।[২৪]

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* ও গ্রীক *পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি* নামক গ্রন্থে সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্রের জন্য বাংলা ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে সুবিখ্যাত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই সূক্ষ্ম বস্ত্র দরিদ্র পল্লীবাসীর নাগালের বাইরে ছিল। তাদের ভাগ্যে জুটত মোটা কার্পাস বস্ত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল ছিন্ন ও জীর্ণ। পল্লীবাসী নারীরা অনেকে নিজেরাই সুতা কেটে নিজের পরিধানের কাপড় তৈরি করত। তার উল্লেখ পাওয়া যায় *সদুক্তিকর্ণামৃতে* শুভাঙ্কের একটি শ্লোকে:

কার্পাসাস্থি প্রচয়নিচিতা নির্ধনশ্রোত্রিয়াণাং
যেষাং বাত্যাপ্রবিততকুটীপ্রাঙ্গণান্তা বভূবুঃ।
তৎসৌধানাং পরিসরভুবি ত্বৎপ্রাসাদাদিদানীং
ক্রীড়াযুদ্ধচ্ছিদুরযুবতীহারমুক্তাঃ পতন্তি॥

যেসব দরিদ্র শ্রোত্রিয়দিগের ঝটিকাহত কুটিরের প্রাঙ্গণ কার্পাস বীজের দ্বারা আকীর্ণ ছিল, (হে মহারাজ), এখন তোমার কৃপায় সেখানকার সৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্নহারের মুক্তাসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।[২৫]

কবি উমাপতিধর বাঙালি পল্লীবাসিনী নারীর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর একটি শ্লোকে। *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে তা এমনিভাবে উদ্ধৃত হয়েছে:

দূরোদঞ্চিত বাহুমূলবিলসচ্চীনপ্রকাশস্তনা–
ভোগ্যব্যয়তমধ্যলম্বিসনা-নির্মুক্ত নাভিহ্রদা।
আকৃষ্টোজ্জিত-পুষ্পমঞ্জরিরজঃপাতাবরুদ্ধেক্ষণা
চিন্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্রদুঃস্থা তনুঃ॥

একবসনা পল্লীবাসিনী বাঙালী নারী ঢুকেছেন ফুল আহরণের জন্য, একটু উঁচুতে নাগালের বাইরে গাছের ডালে ফুল ফুটে আছে, পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বাহু উপরের দিকে তুলে সুন্দরী ফুল পাড়ছে। নাভিহ্রদ বসনমুক্ত, একদিকের স্তন প্রকাশিত।[২৬]

তৎকালীন বাংলায় গ্রামীণ জীবন ছিল সরল, শান্ত ও স্বাভাবিক। সমকালীন নগরজীবনের বিলাসিতা ও অসংযত আচরণের দ্বারা সমাজ খুব একটা প্রভাবিত হয়নি। কবি শুভাঙ্কের একটি কবিতায় সহজ, সরল, শান্ত গ্রামীণ সমাজজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে এইভাবে:

বিষয়পতিরলুব্দো ধেনুভির্ধার্ম পূতং
কতিচিদাভিমতায়াং সীম্নি সীরা বহন্তি
শিথিলয়তি চ ভার্যা নাতিথেয়ী-সপর্য্যাং
মিতি সুকৃতিমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন।

বিষয়পতি (অর্থাৎ স্থানীয় শাসনকর্তা) লোভহীন, ধেনুদ্বারা গৃহ পবিত্র, নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ হয়, অতিথি পরিচর্যায় গৃহিণী কখনও ক্লান্ত হয় না। এইসব ফল দ্বারা এর পুণ্য (বা সুকৃতি) আমাদের নিকট ব্যঞ্জিত হয়েছে।[২৭]

প্রাচীন বাংলার দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে দুঃখ কষ্ট লেগেই থাকত। দুঃখ কষ্টে তাদের দিন অতিবাহিত হতো। সমসাময়িক সাহিত্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। *সদুক্তিকর্ণামৃতের* একটি শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে:

দরিদ্র শিশুরা প্রায়শ অন্যের বাড়ীর দ্বারে দাঁড়িয়ে অভ্যন্তরে যারা খাচ্ছে তাদের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে থাকে। তাদের দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র। ক্ষুধায় শিশুদের চোখ কুক্ষিগত এবং উদর বসে গেছে।[২৮]

দরিদ্র নারীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। তাদের পরিবারের জন্য পরের দিনের খাদ্যদ্রব্যের কথা চিন্তা করে রাতের পর রাত অতিবাহিত করতে হতো। তারা ঘরে ও মাঠে কাজ করত। সংসার জীবন নির্বাহের জন্য হাটবাজারেও যেতে হতো আবার পুত্রকন্যা স্বামী ও পরিবার পরিজনদের পরিচর্যাও করতে হতো। এর একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় কবি শরণের একটি শ্লোকে :

এতাস্তা দিবসান্তভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ
স্কন্ধপ্রস্খলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদরাঃ।
প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুত্য বর্ত্মচ্ছিদো
হট্টকৃত পদার্থমূল্যকলনব্যগ্রাঙ্গুলি গ্রন্থয়ঃ ॥[২৯]

এই পুরনারীগণ অস্তায়মান তপন দর্শন করিয়া ধাবিত হইতেছেন; তাঁহাদের স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল ধারণে তাঁহার ব্যগ্র, প্রভাতে বহির্গত কৃষকগণের আগমনের ভয়ে তাঁহার অবগাহন করিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন, হাটে ক্রয়যোগ্য বস্তুর মূল্য হিসাব করিতে তাঁহার অঙ্গুলিগ্রন্থিগুলি ব্যস্ত।[৩০]

উপসংহার

প্রায় দেড়শত বছর ব্যাপী বাংলায় সেনবংশের শাসন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনয়ন করে। কর্ণাট হতে আগত সেনরাজারা সংস্কৃত সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর ফলে এই ভূখণ্ডে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়। সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলিত গ্রন্থ *সদুক্তিকর্ণামৃত থেকে* প্রাচীন যুগের সমাজজীবনের নানা চিত্র বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। বাংলায় সংকলিত সংস্কৃত শ্লোকগ্রন্থ *সদুক্তিকর্ণামৃতে* বর্ণিত তৎকালীন সমাজের বর্ণ ও শ্রেণী বিন্যাস, ধর্মীয় জীবন, গ্রামীণ জীবন, সমাজে নারীর অবস্থা সম্পর্কিত শ্লোকসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এগুলোকে যদি একসূত্রে আবদ্ধ করা যায় তাহলে আমরা প্রাচীন বাংলায় সমাজজীবন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হব।

তথ্যনির্দেশ

১ পালরাজা রামপালের শাসনকালে জগদ্দল মহাবিহারে বসেই বৌদ্ধ আচার্য বিদ্যাকর এই সংস্কৃত কোষকাব্যটি সংকলন করেন। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে এই সংকলন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই কোষকাব্যটিতে কালিদাস, রাজশেখর, ভবভূতি প্রভৃতি সবভারতীয় কবির শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া অনেক কবির শ্লোক এই কোষকাব্যে স্থান পেয়েছে যাঁরা নিঃসন্দেহে বাঙালি ছিলেন। *সুভাষিতরত্নকোষ* কাব্যটি পঞ্চাশটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং শ্লোকের সংখ্যা ১৭৩৮টি। দ্রষ্টব্য: Daniel H.H. Ingalls (tr.), *An Anthology of Sanskrit Court Poetry Vidyakara's 'Subhasitaratnakosa'* (Cambridge: Harvard University Press, 1965), pp. 1-53

২ Sures Chandra Banerji (ed.), *Sadukti-Karnamrita of Sridharadasa,* Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1965, *Introduction*.

৩ 'ভুক্তি' ছিল প্রাচীন ও প্রাথমিক মধ্যযুগের বাংলার কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভাগের নাম। গুপ্ত আমলে ভুক্তির নিম্নতর বিভাগ ছিল যথাক্রমে 'বিষয়' ও 'মণ্ডল'। তবে পাল আমলে 'ভুক্তির' নিম্নতর বিভাগ 'বিষয়' না 'মণ্ডল' ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি। মণ্ডলের অধিপতি বা প্রশাসককে বলা হতো 'মহামাণ্ডলিক'। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব (কলিকাতা: দেজ' পাবলিশিং, ১৪০২), পৃ. ৩১৬

[৪] সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালির দান*, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৬৯, পৃ. ৫৬
[৫] শাহানারা হোসেন, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২, পৃ. ১০২
[৬] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১
[৭] *তদেব*, পৃ. ২৬৯
[৮] শাহানারা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[৯] সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৬
[১০] *তদেব*, পৃ. ৪৩৫
[১১] *তদেব*, পৃ. ৪৯৯
[১২] *তদেব*, পৃ. ৪২৮
[১৩] *তদেব*, পৃ. ৪৯৫
[১৪] *তদেব*, পৃ. ৪২৮
[১৫] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫২
[১৬] সুরেশ বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ৫০২
[১৭] শাহানারা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
[১৮] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
[১৯] এস.এম. রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১, পৃ. ১৫৩
[২০] শাহানারা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, ১০৩
[২১] *তদেব*, পৃ. ২১৫
[২২] *তদেব*, পৃ. ২১৭
[২৩] *তদেব*, পৃ. ১০৩
[২৪] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ৪৬২
[২৫] *তদেব*, পৃ. ৪৬৩
[২৬] *তদেব*, পৃ. ৪৭৫
[২৭] শাহানারা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪; নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৭
[২৮] *তদেব*, পৃ. ১০৪
[২৯] সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৩
[৩০] *তদেব*, পৃ. ৫১৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: একটি পর্যালোচনা

মোহাঃ ইমরান কবির*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনার লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও কাহিনীর গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। এতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (বাংলা)-এর উদ্দেশ্য এবং শিখনফলকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করাই ছিল শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণীত হয়। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও শিখনফলের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু (প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও কাহিনী) শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য এবং শিখনফল অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকলেও এখানে ধারাবাহিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অধিকতর আরো বিষয়বস্তু সংযোজন করার প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য এবং শিখনফল অর্জনে পুরোপুরি সহায়ক হয়নি। আর উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়বস্তুর উপযোগিতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উদ্দেশ্য ও শিখনফল সম্পূর্ণভাবে অর্জন উপযোগী নয়। সুতরাং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়বস্তুর (প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও কাহিনী) উপযোগিতা মূল্যায়ন পূর্বক নতুন করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আরো প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও কাহিনী অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. ভূমিকা

আগামী প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা চালিয়েছে সরকার। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও

* সহকারী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং এম.ফিল গবেষক, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লক্ষ্য বর্ণনায় বলা হয়েছে- "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ ও তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎজীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো এবং জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা"[১]। মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে, আমাদের সাহিত্য জগতকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ গৌরব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। মূলত আমাদের সাহিত্যে উৎকর্ষসাধনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ড।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ছিল দেশে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে তোলা। এ জন্যে নতুন প্রজন্মের মানসলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগিয়ে তোলা জরুরি। তাহলে তারাই হবে সোনার বাংলা গড়ে তোলার কারিগর[২]। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তাদের জানতে হবে। শিক্ষানীতিতে তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুর শারীরিক, আত্মিক ও বৌদ্ধিক বিকাশসাধনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কাছে এ ইতিহাস পৌছানোর জন্য স্তরভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকে পর্যায়ক্রমে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষাস্তরের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা। এ বয়সের শিক্ষার্থীরা তাদের আবেগ, ভালোবাসা ও অনুভূতির পূর্ণ প্রয়োগ ঘটিয়ে জ্ঞান অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে[৩]। এ কারণেই এ স্তরে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে পরিকল্পিতভাবে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার অন্যতম মাধ্যম হলো বাংলা পাঠ্য বই। বিভিন্ন লেখক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও কবিরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছ। এ সাহিত্যে বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও কবিতার মাধ্যমে মুক্তি সংগ্রামের কথা বিধৃত হয়েছে। দেশের সম্ভাবনাময় বিশাল তরুণ সমাজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যে মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তথাপি অন্যান্য প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও কবিতার তুলনায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কিভাবে তা বর্ণিত হয়েছে সেটা পর্যালোচনা করাই এ রচনার মূল উদ্দেশ্য।

২. পটভূমি ও পর্যালোচনার যৌক্তিকতা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর মূলে এবং বর্ণিত লক্ষ্য ও আদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সংবিধানের মূল দিকনির্দেশনা। সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে, তার আলোকে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

ও লক্ষ্য হচ্ছে- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা; তাদের চিন্তা-চেতনায় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার উজ্জীবন ঘটানো; রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির সঙ্গে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় করা; শিক্ষার্থীদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী ও সচেতন করে তোলা; তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ তিরিশটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। যেখানে সার্বিকভাবে বলা হয়েছে: 'এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক ও মান-সম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে[৪]।' মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত কয়েকটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা;

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা;

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো;

৪. ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা;

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা; এবং

৬. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা[৫]।

নানা কারণে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। বরং মহান এ ইতিহাসকে ইচ্ছাকৃত ও নানাভাবে বিকৃত করা হয়েছে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থাও করা হয়নি। যার ফলে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানছে না, অনেকে আবার বিকৃতভাবে উপস্থাপিত ইতিহাস দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে[৬]। ফলে বর্তমান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্তর ভিত্তিক বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উপস্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এর ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বাংলা সাহিত্যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিভিন্ন গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশাবলীকে সামনে রেখে প্রবন্ধটি পর্যালোচনা করা হয়েছে:

১. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতিফলন পর্যালোচনা;
২. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা শিক্ষাক্রমে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নির্ধারিত শিখনফল ও বিষয়বস্তুর প্রতিফলন অনুসন্ধান করা; ও
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ।

৩. পর্যালোচনায় অনুসৃত পদ্ধতি

এই প্রবন্ধে মাধ্যমিক স্তর বলতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী ও উচ্চমাধ্যমিক বলতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। উল্লিখিত প্রবন্ধে পাঠ্যপুস্তক সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনার জন্য পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি[৭] ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি পূর্বে অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে[৮] এমন পদ্ধতি এই গবেষণায়ও ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বাংলা শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বাংলা শিক্ষাক্রমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে একজন শিক্ষার্থী বাংলা বিষয়ে যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে তা নিরূপণ করা হয়েছে। এই যোগ্যতাগুলোকে বলা হচ্ছে 'শিখনফল'। শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমে বাংলা সাহিত্যের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উক্ত বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যবই তৈরি করা হয়েছে[৯]। নির্ভরযোগ্য উপায়ে উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রতিটি শিখনফল ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে, একই সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর তুলনা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনার সময় প্রতিটি বিষয়বস্তু (গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস ও কবিতা) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে দেখা হয়েছে। উক্ত নির্বাচিত বিষয়বস্তুতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

শিক্ষাকে দেশব্রতী, বিশ্বব্রতী, মানবব্রতী, কল্যাণমুখী, বিজ্ঞানমনস্ক, উন্নয়নমুখী, কর্মমুখী এবং অসাম্প্রদায়িক, সৃজনশীল ও মুক্তচেতনাসম্পন্ন মানুষ গড়ার উপযোগী করা, দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নমুখী পরিবর্তন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দায়িত্ববান ও কর্তব্যনিষ্ঠ দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে[১০]। আর এ লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছে বর্তমান সরকার।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২'-এ বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যের (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) ২৩টি উদ্দেশ্য ও ৩০টি প্রান্তিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে[১১]। জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণীত বাংলা সাহিত্যের (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীর জন্য) উদ্দেশ্যের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলো হলে: (ক) দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া; (খ) বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এবং দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব অর্জন[১২]। আর ৩০টি প্রান্তিক শিখনফলের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিখনফলে বলা হয়েছে: শিক্ষার্থীরা (ক) দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় তুলে ধরতে পারবে; (খ) বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের সাধারণ পরিচয় দিতে ও ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে; এবং (গ) দেশ ও জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে[১৩]। নিম্নে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শ্রেণীভিত্তিক উপস্থাপন করা হলো-

ষষ্ঠ শ্রেণী : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য চারুপাঠে গদ্য আছে ৯টি ও কবিতা আছে ৯টি[১৪] এবং আনন্দপাঠে (বাংলা দ্রুতপঠন) গল্প আছে ৭টি, নাটিকা ১টি এবং ভ্রমণকাহিনী আছে ২টি[১৫]। ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য চারুপাঠে ৯টি গদ্য ও ৯টি কবিতার মধ্যে শওকত ওসমান রচিত 'তোলপাড়' নামক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গদ্য আছে ১টি, ৯টি কবিতার মধ্যে একটিও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা নেই। উল্লেখ্য যে, আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রথমধাপ হিসেবে পরিচিত ভাষা আন্দোলন নিয়ে ১টি গদ্য ও ১টি কবিতা রয়েছে। তবে চারুপাঠে রোকনুজ্জামান খান রচিত 'মুজিব' নামক কবিতার পাঠ পরিচিতিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদান বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে[১৬]। লক্ষ্যণীয় যে, ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য চারুপাঠে ৯টি গদ্যে মোট ৮৫১টি বাক্য ও ৭,২৩৬টি শব্দ এবং ৯টি কবিতায় ১৮৩টি লাইন ও ৭৯৯টি শব্দ আছে। যেখানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাক্য আছে ১৩৯টি ও শব্দ আছে ৮৭৫টি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-তে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিখনফলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে- শিক্ষার্থীরা (ক) ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার বিবরণ দিতে পারবে, বিষয়বস্তুতে বলা হয়েছে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে জানবে; এবং (খ) দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয়

দিতে পারবে[১৭]। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা সাহিত্যের শিখনফলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানীদের অত্যাচারের দৃশ্য দেখে একজন কিশোর কীভাবে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতিজ্ঞা করে— শতকত ওসমানের তোলপাড় গল্পে তাই ব্যক্ত হয়েছে। এ পাঠের উদ্দেশ্য ছিল: মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা। এ গল্পে পাকিস্তানীদের অত্যাচার, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা অনুভব করার মাধ্যমে কিশোর হৃদয় কিভাবে বেদনায় ভরে ওঠে এবং এর ফলে পাকিস্তানিদের প্রতি তার ঘৃণা ও ক্ষোভের যে বহিঃপ্রকাশ হয়েছে[১৮] তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া 'মাদার তেরেসা' নামক গল্পে মাদার তেরেসা কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ-ত্যাগী মানুষদের সেবা করার মহান ব্রতের[১৯] কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে। আর চারুপাঠের কবিতাংশে 'মুজিব' নামক কবিতায় বঙ্গবন্ধুর কথা বলা হলেও মূলত পাঠ পরিচিতিতে ফুটে উঠেছে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের কথা, যেখানে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাই ছিল মুখ্য[২০]। এছাড়া রফিকুল ইসলাম রচিত 'অমর একুশে' নামক গল্প ও হুমায়ুন আজাদ রচিত 'ফাগুন মাস' নামক কবিতায় আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে, যা ছিল মূলত আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণা।

ষষ্ঠ শ্রেণীর দ্রুতপঠন আনন্দপাঠে ৭টি গল্প, ১টি নাটিকা ও ২টি ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে ২টি গল্প মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। আনোয়ারা সৈয়দ হক কর্তৃক রচিত 'কাঠের পা' ও ফরিদুর রেজা সাগর কর্তৃক রচিত 'অমি ও আইসক্রিম'অলা' নামক গল্প দু'টি হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। 'কাঠের পা' নামক গল্পে লেখক নয় নম্বর সেক্টরে যুদ্ধরত একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনের কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন[২১]। অন্যদিকে ফরিদুর রেজা সাগর তাঁর রূপকাশ্রয়ী গল্প 'অমি ও আইসক্রিম'অলা'-তে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন[২২]। উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠ শ্রেণীর আনন্দপাঠে মোট বাক্য আছে ১,১৬৮টি ও শব্দ আছে ৭,৪০৮টি। যার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাক্য হলো ৪০৭টি ও শব্দ হলো ২,৮৩১টি।

সপ্তম শ্রেণী : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য সপ্তবর্ণায় গদ্য আছে ১০টি ও কবিতা আছে ১০টি[২৩] এবং আনন্দপাঠে গল্প আছে ১০টি[২৪]। সপ্তম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য সপ্তবর্ণায় রণেশ দাশগুপ্ত রচিত 'মাল্যদান' নামক গদ্যটি এবং ফয়েজ আহমদ রচিত 'স্মৃতিসৌধ' নামক কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। এছাড়া আবু বকর সিদ্দিক রচিত 'লখার একুশে' নামক গদ্য প্রবন্ধে ও মহাদেব সাহা রচিত 'এই অক্ষরে' নামক কবিতায় আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস[২৫] এবং কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'বঙ্গবন্ধু' নামক কবিতায় আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান উল্লেখসহ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা[২৬] উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সপ্তম শ্রেণীর সপ্তবর্ণায় ১০টি গদ্যে ১,০০৭টি বাক্য ও ৯,২৪১টি শব্দ আছে এবং ১০টি কবিতায় ২৩৬টি

লাইন ও ১২৭৯টি শব্দ আছে। যেখানে গদ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাক্য আছে ৯৩টি ও শব্দ আছে ৭৫৩টি এবং কবিতায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক লাইন হলো ১৪টি ও শব্দ হলো ৬২টি।

জাতীয় শিক্ষাক্রমেও সপ্তম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের শিখনফলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বতন্ত্র শিখনফল অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে। শিখনফলে বলা হয়েছে: শিক্ষার্থীরা (ক) শহীদ দিবস, জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে; (খ) ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিচয় দিতে পারবে; এবং (গ) দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে স্বকীয় অভিমত ব্যক্ত করতে পারবে[২৭]। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মাতৃভাষায় বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

'মাল্যদান' গল্পে লেখক রণেশ দাশগুপ্ত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বর্বর গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছে। মূলত এ গল্পে মুক্তিযুদ্ধে নাম না জানা অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের প্রতিফলন ঘটেছে[২৮]। আর 'স্মৃতিসৌধ' নামক কবিতার ভাববস্তু হলো মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্মরণ। মূলত এ কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে: জাতির সাত বীর সন্তানসহ লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা, আমদের গৌরবময় বীরত্বের কথা ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের জাতির সন্তানদের আত্মত্যাগের ইতিহাস[২৯]। এছাড়া 'বঙ্গবন্ধু' নামক কবিতার পাঠ-পরিচিতিতে- ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত সকল মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর যে অসামান্য অবদান[৩০] সেটি এখানে বিবৃত হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণীর দ্রুতপঠন আনন্দপাঠে ১০টি গল্পের মধ্যে ১টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও ১টি ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গল্প রয়েছে। সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন রচিত 'উনিশ শ একাত্তর' নামক গল্পটিতে ছোট্ট একটি মফস্বল শহরের মুক্তি সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। এখানে মূলত: পাকিস্তানি মিলিটারী বাহিনীর ভয়ে সাধারণ লোকদের দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়া এবং একজন নিরীহ ও অসহায় ছেলের আত্মদানের কথা[৩১] আলোচিত হয়েছে। এছাড়া অজিত কুমার গুহ তাঁর 'বুলু' নামক গল্পে আমাদের ভাষা আন্দোলনের কথা তুলে ধরেছেন। লেখক নিজেই এ আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার হন এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তিনি তরুণ প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস[৩২] বর্ণনা করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, সপ্তম শ্রেণীর আনন্দপাঠে ১,৩৩৪টি বাক্য ও ১০,৬৯১টি শব্দ আছে। যার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাক্য হলো ২৩৫টি ও শব্দ হলো ১,৬৫৫টি।

অষ্টম শ্রেণী : অষ্টম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বাংলা সাহিত্য 'সাহিত্য কণিকা'য় গদ্য আছে ১১টি ও কবিতা আছে ১১টি[৩৩] এবং দ্রুতপঠন 'আনন্দপাঠ'-এ গল্প আছে ৭টি (ভ্রমণকাহিনীসহ)[৩৪]। সাহিত্য কণিকার ১১টি গদ্যের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অনুলিখন 'এবারের

সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' নামক গল্পটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক, এছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বাঙালির বাংলা' নামক গল্পটিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের আত্মদানের বিষয়টি স্থান পেয়েছে[৩৫]। অষ্টম শ্রেণীর সাহিত্য কণিকায় ১১টি গদ্যে ১,৩৩৮টি বাক্য ও ১১,৬২৪টি শব্দ আছে এবং ১১টি কবিতায় ৩৬২টি লাইন ও ১,৭৮৭টি শব্দ আছে। যেখানে গদ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাক্য মাত্র ১০৭টি ও শব্দ আছে ১,১৩৫টি । এখানে ১১টির কবিতার মধ্যে একটিও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কবিতা নেই। উল্লেখ্য যে, অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ড নির্ধারিত দ্রুতপঠন আনন্দপাঠের ৭টি গল্পে ১,৫৪১টি বাক্য ও ১৪,১৬২টি শব্দ আছে (ভ্রমণকাহিনীসহ)। কিন্তু এখানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি গল্পও নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রমে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলার জন্য নির্ধারিত শিখনফলে বলা হচ্ছে: শিক্ষার্থীরা (ক) শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান দেখে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে; (খ) ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিচয় দিতে এবং এর তাৎপর্য ব্যক্ত করতে পারবে; ও (গ) দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে পারবে এবং এ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে[৩৬]।

অষ্টম শ্রেণীর সাহিত্য কণিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুলিখনে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' নামক যে গল্পটি লেখা হয়েছে তা মূলত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সমগ্র বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। যে ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ ভাষণ থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের কথা উচ্চারিত হয় যা ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে পরিচিত। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বাঙালিদের রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। আর এ বিষয়টি বক্তব্য আকারে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানানো হয়েছে[৩৭]। তাছাড়া এ ভাষণটিকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক গেটিসবার্গ ভাষণের সাথে তুলনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, অষ্টম শ্রেণীর সাহিত্য কণিকায় ও আনন্দপাঠে ১৯টি গল্প ও ১১টি কবিতার মধ্যে মাত্র ১টি গল্প মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। তবে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বাঙালির বাংলা' নামক গল্পের এক পর্যায়ে স্বাধীনতার জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামে বাঙালির আত্মত্যাগের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে[৩৮] এবং আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত 'একুশের গান' নামক কবিতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে[৩৯]।

নবম-দশম শ্রেণী: জাতীয় শিক্ষাক্রমে নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে: (ক) ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া; এবং (খ) বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং মমত্বের মনোভাব অর্জন করা[৪০]। আর শিখনফলে বলা হয়েছে: শিক্ষার্থীরা

(ক) মহান ভাষা আন্দোলনের আলোকে মাতৃভাষাপ্রীতি, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিতে পারবে; (খ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গঠনে সক্রিয় হওয়ার গুরুত্ব ব্যক্ত করতে পারবে; (গ) মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামী দেশপ্রেমিক ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে; ও (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারবে[৪১]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষাক্রমে নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও শিখনফলে মুক্তিযুদ্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এ শিক্ষাক্রমের আলোকেই রচিত হয়েছে নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য।

নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত গদ্য আছে ১৫টি ও কবিতা আছে ১৫টি[৪২] এবং বাংলা সহপাঠ-এ উপন্যাস আছে ১টি ও নাটক আছে ১টি[৪৩]। মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যের ১৫টি গদ্যের মধ্যে জাহানারা ইমাম রচিত 'একাত্তরের দিনগুলি' হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক[৪৪] ও ১৫টি কবিতার মধ্যে শামসুর রাহমান রচিত 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'[৪৫], সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'আমার পরিচয়' নামক কবিতাটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রায় প্রত্যেকটি সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়[৪৬]। নির্মলেন্দু গুণ রচিত কবিতা 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' এবং কামাল চৌধুরী রচিত 'সাহসী জননী বাংলা' নামক কবিতাটি হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। আর বাংলা সহপাঠের সেলিনা হোসেন রচিত 'কাকতাড়ুয়া' নামক উপন্যাসটি হলো আমাদের মুক্তি সংগ্রামভিত্তিক উপন্যাস[৪৭]। উল্লেখ্য যে, নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যে ১৫টি গদ্যে ১,৭৪৭টি বাক্য ও ২২,১২৯টি শব্দ আছে এবং ১৫টি কবিতায় ৪৯৭টি লাইন ও ২,৭০৫টি শব্দ আছে। যেখানে গদ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাক্য আছে ১৭১টি ও শব্দ আছে ১,৭০৫টি এবং কবিতায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক লাইন আছে ১৩৫টি ও শব্দ আছে ৭৩২টি। এছাড়া নবম ও দশম শ্রেণীর ৬৮ পৃষ্ঠার বাংলা সহপাঠে ২,৯২৬টি বাক্য ও ১৯,৮৫৫টি শব্দ আছে। যার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাক্য আছে ১৭০৩টি ও শব্দ আছে ৯,৬৪৭টি।

'একাত্তরের দিনগুলি' নামক গল্পে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিনে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের অবতারণা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল, ১০ মে, ১২ মে, ১৭ মে, ২৫ মে, ৫ সেপ্টেম্বর, ১১ অক্টোবর ও ১৬ ডিসেম্বর-কে গুরুত্ব দিয়ে লেখিকার ছেলে রুমির আত্মদানের কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে[৪৮]। কবি শামসুর রাহমান রচিত 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' নামক কবিতায় মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানীদের গণহত্যা, গ্রাম ও শহর পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নারীদের আত্মদানের কাহিনী ও কৃষক, শ্রমিক, জেলে, রিক্সাওয়ালা প্রমুখের আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতাকে স্মরণ করা হয়েছে[৪৯]। চাঁদ-সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা, কৈবর্ত বিদ্রোহ, পালযুগের চিত্রকলা আন্দোলন, বৌদ্ধবিহারের জ্ঞানচর্চা, মুসলিম ধর্ম ও সাহিত্য-

সংস্কৃতির বিকাশ, বারো ভূঁইয়াদের উত্থান, ময়মনসিংহ গীতিকার জীবন, তিতুমীর আর হাজী শরীয়াতুল্লাহর বিদ্রোহ, রবীন্দ্র-নজরুলের কালজয়ী সৃষ্টি, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং পরিশেষে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ অনবদ্যরূপ লাভ করেছে 'আমার পরিচয়' নামক কবিতার মাধ্যমে[৫০]। 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' নামক কবিতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে[৫১]। আর 'সাহসী জননী বাংলা' নামক কবিতায় আমাদের অনাদি অতীতের সংগ্রাম, ভাষার জন্য রক্তদান, মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় বিজয় এবং প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এ দেশের জনজীবনে যে প্রতিরোধ আর সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে সেটিই আলোকপাত করা হয়েছে।

মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠে সেলিনা হোসেন রচিত 'কাকতাড়ুয়া' নামক উপন্যাসে বুধা নামক একজন গ্রাম্য সাহসী কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা আলী ও মিঠুর উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহসী এ কিশোর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রথমে সে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সির বাড়ি এবং পরবর্তীতে রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাবা-মা হারা কিশোর বলে কেউ তাকে তেমন একটা সন্দেহ করে না। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা শিল্পী শাহাবুদ্দিন এ কিশোর মুক্তিযোদ্ধাকে পাকিস্তানী মিলিটারি ক্যাম্পে মাইন পোতার দায়িত্ব দেন। বাঙ্কার খোঁড়বার সময় কৌশলে সে তার ভেতর মাইন পুঁতে রাখে। এর কিছুক্ষণ পরে পাকিস্তানী সেনারা বাঙ্কারে ঢুকতেই পুরো ক্যাম্পটা মাইনের বিস্ফোরণে ধ্বংশ হয়ে যায়। আর এভাবেই এতিম এ কিশোর মুক্তিযোদ্ধা নিজের জীবনের মায়া না করে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানী মিলিটারী ক্যাম্পসহ রাজাকার ও আল-বদরদের আস্তানায় হামলা করতে ভয় পেত না। তাঁর সাহসিকতায় ঐ এলাকার মিলিটারী ক্যাম্প ও রাজাকার আল-বদরদের আস্তানা ধ্বংস হয়। মূলত: এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখিকা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আপামর জন-সাধারণের অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরেছেন[৫২]।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী : জাতীয় শিক্ষাক্রমে এ স্তরের বাংলা সাহিত্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে: (ক) ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ সমুন্নত রাখতে উদ্বুদ্ধ হওয়া; ও (খ) বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন[৫৩]। আর শিখনফলে উল্লেখ করা হয়েছে: শিক্ষার্থীরা (ক) ভাষা আন্দোলনের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ সমুন্নত রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে; (খ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে দেশ ও জাতির প্রতি মমত্বের গুরুত্ব ব্যক্ত করতে পারবে; ও (গ) বাংলার ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে পারবে এবং সে-সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব ব্যক্ত করতে পারবে[৫৪]। এ স্তরের বাংলা শিক্ষাক্রমে মুক্তিযুদ্ধকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। শিক্ষাক্রমকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে এ স্তরের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

হয়েছে বাংলা সাহিত্য 'সাহিত্য পাঠ' ও বাংলা 'সহপাঠ'। বাংলা সাহিত্য 'সাহিত্য পাঠ-এর নির্ধারিত ১২টি গল্পের ১টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও ১টি ভাষা আন্দোলনভিত্তিক আর ১২টি কবিতার ২টি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ইতিহাস[৫৫] স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত বাংলা সহপাঠে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কোনো উপন্যাস বা নাটক নেই। উল্লেখ্য যে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা সহপাঠে ১টি উপন্যাস ও ১টি নাটক আছে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সাহিত্য পাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'বায়ান্নর দিনগুলো' ভাষা আন্দোলনভিত্তিক। এখানে মূলত ফুটে উঠেছে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর জেলে যাওয়া, তাঁর জেল জীবনের দিনগুলো ও মৃত্যু আসন্ন জেনেও ভাষার দাবিতে অটল থাকার ইতিহাস। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'রেইনকোট' নামক গল্পটিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তান বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে ঢাকায় যে গেরিলা আক্রমণ শুরু হয় সেটিই এ গল্পের বিষয়বস্তু। এখানে একজন কলেজ শিক্ষকের ব্যবহৃত 'রেইনকোট'-এর প্রতীকী তাৎপর্যের মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরা হয়েছে[৫৬]। বাংলা সাহিত্যে শামসুর রাহমান রচিত 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' নামক কবিতায় ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান বিরোধী গণ-আন্দোলন ও তার পটভূমি আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' নামক কবিতার বিষয়বস্তু হলো: ১৭৮৩ সালে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের কৃষক নেতা নূরলদীনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধারণ মানুষ যেমন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল কবির বিশ্বাস ঠিক তেমনি ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালো রাতের পরে বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলতে এতটুকুই। উল্লেখ্য যে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সাহিত্য পাঠে নির্ধারিত ১২টি গল্পে ২,১৮৯টি বাক্য ও ২৫,০০০টি শব্দ আছে এবং ১২টি কবিতায় ৪৪০টি লাইন ও ২,৭৪১টি শব্দ আছে। যেখানে গল্পে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাক্য আছে ৫৯৬টি ও শব্দ আছে ৪,১৯৭টি এবং কবিতায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক লাইন আছে ৬৯টি ও শব্দ আছে ৪৬০টি। এছাড়া একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ১৪৮ পৃষ্ঠার বাংলা সহপাঠে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কোনো উপন্যাস বা নাটক নেই।

৫. পর্যালোচনা ও সুপারিশ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যে ৯টি গদ্যের মধ্যে মাত্র ১টি হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। যেখানে পাকিস্তানিদের বর্বরতার কথা ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে ৯টি কবিতার মধ্যে 'মুজিব' নামক কবিতায় মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া দ্রুতপঠন 'আনন্দপাঠ'-এর ১০টি গল্পের (ভ্রমণকাহিনীসহ) মধ্যে 'কাঠের পা' নামক গল্পে ৯নং সেক্টরের একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবন

কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আর 'অমি ও আইসক্রিম'অলা'-তে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে গদ্যে মোট বাক্যের- ১৬.৩৩% ও শব্দের- ১২.০৯% এবং দ্রুতপঠন আনন্দপাঠে মোট বাক্যের- ৩৪.৯৩% ও ৩৭.৯৩% শব্দে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও শিখনফলের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জনে সহায়ক। তথাপি শিক্ষাক্রমে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি কবিতা থাকার কথা বলা হলেও বাস্তবে সেটি অনুসরণ করা হয়নি। অথচ ভাষা আন্দোলন নিয়ে একটি গল্প ও একটি কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে। বরং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি কবিতা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় জাতীয় শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও শিখনফলের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে ১০টি গল্পের মধ্যে 'মাল্যদান' নামক গল্পটি ও ১০টি কবিতার মধ্যে 'স্মৃতিসৌধ' নামক কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণীর ন্যায় সপ্তম শ্রেণীতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি কবিতা রচিত হয়েছে। যেখানে আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রসহ মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া আনন্দপাঠের ১০টি গল্পের মধ্যে 'উনিশ শ একাত্তর' নামক গল্পে আমাদের মফস্বল শহরের মুক্তি সংগ্রামের কথা বিধৃত হয়েছে। সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে গদ্যে মোট বাক্যের- ৯.২৪% ও শব্দের- ৮.১৫%, কবিতায় মোট লাইনের- ৫.৯৩% ও শব্দের- ৪.৮৫% এবং দ্রুতপঠন আনন্দপাঠে মোট বাক্যের- ১৭.৬২% ও ১৫.৪৮% শব্দে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়বস্তুর প্রতিফলন হয়েছে। সার্বিকভাবে বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জাতীয় শিক্ষাক্রমে সপ্তম শ্রেণীর বাংলার জন্য নির্ধারিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জনে খুব বেশি সহায়ক নয়। সুতরাং এ পর্যায়ে আরো বিস্তৃত আকারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টি তুলে ধরা গেলে শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জন শিক্ষার্থীদের জন্য সহজতর হতো।

অষ্টম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ১১টি গল্প ও ১১টি কবিতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত (অনুলিখন) 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' নামক গল্পটিই শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। যেখানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটাই তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া আনন্দপাঠের ৮টি গল্পের মধ্যে ১টিও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প নেই। । অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে গদ্যে মোট বাক্যের- ৮.০০% ও ৯.৭৬% শব্দে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বাংলা সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জন সম্পূর্ণরূপে সহায়ক নয়। কারণ শুধুমাত্র একটি গল্পের (অনুলিখন) মাধ্যমে পাঠের উদ্দেশ্য ও শিখনফল শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে না। সুতরাং, এখানে দেখা যাচ্ছে বাংলা

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও শিখনফলকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণীকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় এবং এ স্তরের শিক্ষাকে তারা স্বাভাবিকভাবে অন্য স্তরের শিক্ষার চেয়ে ভালোভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে থাকে।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বাংলা পাঠ্যবই রচিত হয়েছে। মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যে ১৫টি গদ্যের মধ্যে ১টি হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এবং ১৫টি কবিতার মধ্যে ৪টি কবিতা হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। এছাড়া এস্তরে ১টি উপন্যাস ও ১টি নাটকের মধ্যে উপন্যাসটি হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে গদ্যে মোট বাক্যের- ৯.৭৯% ও শব্দের- ৭.৭০%, কবিতায় মোট লাইনের- ২৭.১৬% ও শব্দের- ২৭.০৬% এবং বাংলা সহপাঠে মোট বাক্যের- ৫৮.২০% ও ৪৮.৫৯% শব্দে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়বস্তুর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ১টি গদ্য, ৪টি কবিতা ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায়, এস্তরের জন্য শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জন সহায়ক হবে। তথাপি মূল বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কবিতার সংখ্যা বেশি হলেও গল্প মাত্র ১টি। ৪টি কবিতার পরিবর্তে ২টি কবিতা ও ২টি গল্প সংযুক্ত করলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শিক্ষার্থীদের অনুধাবন করতে আরো বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারত। কারণ আমাদের প্রচলিত শিক্ষা স্তর হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এটি মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যায় এবং এই স্তরের পরেই শুরু হয় উচ্চমাধ্যমিক স্তর। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো নবম-দশম শ্রেণী। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে গল্প ও কবিতার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাটা জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সাহিত্যের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১টি গল্প ও ২টি কবিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জাতীয় শিক্ষাক্রমে বাংলার জন্য নির্ধারিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জন করতে হবে। এখানে বাংলা সাহিত্যে গল্পে মোট বাক্যের- ২৭.২৩% ও শব্দের- ১৬.৭৯%, কবিতায় মোট লাইনের- ১৫.৬৮% ও ১৬.৭৮% শব্দে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়বস্তুর প্রতিফলন ঘটেছে। বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১টি গল্প ও ২টি কবিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ স্তরের জন্য নির্ধারিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জনে সমর্থ হবে না। কারণ যে ২টি কবিতা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বলা হচ্ছে তা মূলত মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ভিন্ন দু'টি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত। যদিও এর একটি (১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান) আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য রচিত বাংলা সহপাঠে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কোনো রচনা বা উপন্যাস বা নাটক নেই। সুতরাং, এ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা বিষয়ে নির্ধারিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জন করতে হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আরো গল্প, কবিতা ও উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ জাতীয়ভাবে গৃহীত ও সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে। সে অনুযায়ী এবং পরিবর্তনশীল সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের আলোকে পাঠ্যবই প্রণয়ন ও প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোয় আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক নাগরিক সৃষ্টির ওপর। এর লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের নবচেতনায় অভিষিক্ত করে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নির্মাণে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা[৫৭]। আর সেজন্য পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্নপর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস বিভিন্নভাবে প্রতিফলনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। তথাপি তা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত এ স্তরের বাংলা সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও শিখনফলের তুলনায় অনেকাংশে কম। সুতরাং এ স্তরের বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর নিমিত্তে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। সুপারিশগুলো হলো:

- আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এ প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে হবে।
- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে গল্প ও কবিতার মধ্যে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা খুবই জরুরি।
- অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য বইয়ে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি গল্প ও নতুন একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কোনো গল্প বা কবিতা নতুন ভাবে সংযোজন এবং বাংলা সহপাঠে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মওলানা ভাসানী, তাজউদ্দীন আহমদসহ স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের জীবনী গল্প আকারে তুলে ধরলে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে পারবে।
- ক্ষেত্র বিশেষ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের নিয়ে লেখা কোনো গল্প বা কবিতা এ স্তরের বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো মহিলা মুক্তিযোদ্ধার (যেমন: তারামন বিবি ও সেতারা বেগম) জীবনকাহিনী তুলে ধরতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও রণাঙ্গনে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তাঁদের অবদানও যে স্মরণীয় সে উপলব্ধি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত হবে।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শিক্ষার্থীরা যাতে ধারণ করতে পারে এবং এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্য আরো কোন গল্প বা কবিতা নতুন করে পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনার সময় শিক্ষার্থীর বয়স, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

- শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক হারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পূর্ব নির্ধারিত আরো গল্প ও কবিতা পাঠের আয়োজন করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যে নতুন করে আরো গল্প ও কবিতা অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- বস্তুত, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যসহ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর ব্যাপারটি আরও গভীর ও বিশদভাবে ভেবে দেখা দরকার। কারণ, আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই হচ্ছে প্রেরণাময় চালিকাশক্তি।
- সর্বোপরি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়বস্তুর (প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও কাহিনী) উপযোগিতা মূল্যায়নে আরও অধিকতর গবেষণা করা যেতে পারে।

সুতরাং, উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্য প্রণয়ন করা গেলে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর উদ্দেশ্য ও শিখনফল শতভাগ অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। আর তরুণ প্রজন্মও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলে আগামীর সমাজ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

৬. উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল আত্মত্যাগের ইতিহাস নয় বরং, তা অসাধারণ সাহসিকতার, বীরত্বের এবং গৌরবের। এ বীরত্ব এবং গৌরবের কথা জানতে পারলেই তরুণ প্রজন্মের মনে জাগবে দেশের জন্যে গভীর মমতা, ভালোবাসা এবং তারা দেশকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারবে। তাদের মনে জন্ম নেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে গড়ে তোলার মহান প্রেরণা। তরুণ প্রজন্মের মনে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের জন্য পরিকল্পিতভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যসহ অন্যান্য সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। কেননা এ স্তরে অতি দ্রুত শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক বৃদ্ধি ঘটে এবং এ স্তরে তাদের বহুবিধ চাহিদার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাই শিক্ষার্থীরা এ বয়সে যে চেতনা ধারণ করে বড় হয় তা তার সমগ্র জীবনে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যসহ অন্যান্য সাহিত্যের বিষয়বস্তুর উপযোগিতা যাচাই করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে আরো অধিকতর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

তথ্যনির্দেশ

১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১০, পৃ. ১-২
২ মাহবুবুল হক, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৪, পৃ. ২১
৩ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৯, পৃ. ১২৭-১২৮
৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১
৫ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১
৬ মাহবুবুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
৭ মোঃ খাইরুল ইসলাম ও উম্মে মুসতারী তিথি, *বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের কর্তব্যবোধ ও মানবাধিকার সচেতনতা বিকাশের সুযোগ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৪, পৃ. ৪৩
৮ M. D. C. Collado & R. L. Atxurra, æDemocratic citizenship in textbooks in Spanish primary curriculum", *Journal of Curriculum Studies,* 38(2), 2006, pp. 209-210
৯ সৈয়দা আতিকুন নাহার, *বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাক্রম অনুসৃত শিখনফল ও বিষয়বস্তুর প্রতিফলন: একটি বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী, দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১৫, পৃ. ৫২
১০ মাহবুবুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
১১ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, '*জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' বাংলা ষষ্ঠ-দশম শ্রেণী*, ঢাকা: এনসিটিবি, ২০১২, পৃ. ২৫-২৭
১২ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
১৩ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭
১৪ মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, *চারুপাঠ ষষ্ঠ শ্রেণী*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৫
১৫ ফাতেমা চৌধুরী ও অন্যান্য, *আনন্দপাঠ (বাংলা দ্রুতপঠন) ষষ্ঠ শ্রেণী*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৪
১৬ মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০
১৭ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
১৮ মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২৬
১৯ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
২০ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০
২১ ফাতেমা চৌধুরী ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৮
২২ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৪১
২৩ মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, *সপ্তবর্ণা সপ্তম শ্রেণী*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৫
২৪ ফাতেমা চৌধুরী ও অন্যান্য, *আনন্দপাঠ (বাংলা দ্রুতপঠন) সপ্তম শ্রেণী*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৫
২৫ মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩৩, ১০১-১০৪
২৬ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮৩
২৭ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৮
২৮ মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-২০

২৯ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭-১০০
৩০ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮৩
৩১ ফাতেমা চৌধুরী ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯-৫৭
৩২ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২৫
৩৩ মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, *সাহিত্য কণিকা অষ্টম শ্রেণী*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৫
৩৪ ফাতেমা চৌধুরী ও অন্যান, *আনন্দপাঠ (বাংলা দ্রুতপঠন) অষ্টম শ্রেণী*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৪
৩৫ মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-৩৩, ৬-১১
৩৬ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫৫
৩৭ মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-৩৩
৩৮ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬-১১
৩৯ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১১৬
৪০ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
৪১ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
৪২ রফিকউল্লাহ খান ও অন্যান্য, *মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য নবম-দশম শ্রেণী*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৫
৪৩ রফিকউল্লাহ খান ও অন্যান্য, *মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ নবম-দশম শ্রেণী*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৪
৪৪ রফিকউল্লাহ খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৯
৪৫ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮-২৩০
৪৬ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭-২৪০
৪৭ রফিকউল্লাহ খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-৩৪
৪৮ রফিকউল্লাহ খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৯
৪৯ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮-২৩০
৫০ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭-২৪০
৫১ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭-২৫১
৫২ রফিকউল্লাহ খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬-৩৪
৫৩ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বাংলা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী*, ঢাকা: এনসিটিবি, ২০১২, পৃ. ২৫
৫৪ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০
৫৫ ভীষ্মদেব চৌধুরী ও অন্যান্য, মাহবুবুল হক (সম্পাদিত), *সাহিত্য পাঠ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৪
৫৬ ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯-১৯৮
৫৭ মাহবুবুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষা

সাইফিন রুবাইয়াত*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ছাড়া প্রচলিত অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে যে ভাষাগুলি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে সে সকল ভাষার চিহ্নিতকরণই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। একটি ভাষা বিলুপ্তির জন্য আর্থ-সামাজিক কারণের পাশাপাশি ভাষাটির ভাষাভাষীর ভৌগোলিক অবস্থানও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। একটি ভাষা একদিনে হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়ে যায় না, একটি বিপদাপন্ন ভাষা বিপন্নতার বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে টিকে থাকতে না পেরে হারিয়ে যায় মানুষের মুখ থেকে। তাই বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত বিভিন্ন ভাষা ছাড়াও যে সকল ভাষা আর্থ-সামাজিক কারণে বিপন্ন হয়ে পড়েছে সেগুলিও চিহ্নিত করা হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক ভাষা-বিপন্নতার মানদণ্ডের ভিত্তিতে এ সকল বিপদাপন্ন ভাষা বিপন্নতার কোন স্তরে রয়েছে তাও অনুসন্ধান করা হবে।

মূলশব্দ: ভাষা-বিপন্নতা (language endangerment), ভাষা-মৃত্যু (language death), ভাষা-বিলোপ (language extinction or language disappearance), ভাষা-রক্ষণাবেক্ষণ (language maintenance) ভাষা-পরিকল্পনা (language planning), ভাষাবোধ (language competence), ভাষা-সরণ (language shift), দ্বিতীয়-ভাষা (Second Language/ L2)।

১. ভূমিকা

এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশ সত্তর বর্গ কিলোমিটার আয়তনের[১] বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও আছে অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী যাদের রয়েছে স্বতন্ত্র ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বাংলাভাষী বাঙালি জনগোষ্ঠীর বাইরে বসবাসরত এই সকল নৃ-গোষ্ঠীকে কখনো 'উপজাতি' কিংবা 'আদিবাসী', আবার কখনো 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই নৃ-গোষ্ঠীগুলোকে 'ক্ষুদ্র' কিংবা 'উপ' কিংবা 'আদি' বিশেষণে আখ্যায়িত না করে 'নৃ-গোষ্ঠী' বা 'নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' নামে উল্লেখ করা হবে। বাংলাদেশে এসকল ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষার অধিকার (এক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার বোঝানো হয়েছে) প্রতিষ্ঠার আহ্বান উপেক্ষিত হতে থাকে সংখ্যার বিচারে 'উপ' কিংবা 'ক্ষুদ্র' হবার কারণেই। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, স্বজাতির সামাজিক-

* প্রভাষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনৈতিক অধিকার ও মুক্তিচেতনার সঞ্চারণী ঘটানোর উপাদানসমূহের অভাবই এসকল জাতি-গোষ্ঠীকে অনগ্রসর করে রেখেছে। বস্তুত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পালাবদলের সমান্তরালে পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় নীতি-প্রকৌশল, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক বিভেদ তাদের অগ্রযাত্রার অন্তরায়। আর এসকল কারণে সৃষ্ট পারস্পরিক জাতিগত দ্বন্দ্বমুখর অস্থিরতার বিপরীতে সংগ্রামরত এই সকল 'উপ' কিংবা 'ক্ষুদ্র' জাতিসত্তার ভিড়ে তদপেক্ষা 'উপ' কিংবা 'ক্ষুদ্র' জাতিগোষ্ঠীকে হারিয়ে যেতে হয় কিংবা মিলিয়ে যেতে হয় বৃহত্তর জাতি-শক্তির স্রোতধারায়। অন্যদিকে, ভাষাবিলুপ্তির কারণ হিসেবে সাধারণত একটি ভাষার ভাষীসংখ্যার ক্রমহ্রাসকে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু কেবল ভাষীসংখ্যার ক্রমহ্রাসই নয়, বরং একটি ভাষার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মর্মেই নিহিত থাকে ভাষাটির বিলুপ্তি (Language extinction) বা হারিয়ে যাওয়ার কারণ। বস্তুত বিভিন্ন ভাষার ভাষীদের পারস্পরিক সংলগ্ন ভৌগোলিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে দুটি ভাষার সমাসক্তি বা সংযোগের ফলে পিজিন-ক্রেওল প্রক্রিয়ায় নতুন কোনো ভাষার সৃষ্টি হতে পারে, আবার ওই দুটি ভাষার মধ্যে একটি ভাষার ভাষীরা নিজেদের ভাষা পরিত্যাগ করে অপর ভাষাটি গ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে তাদের মূলভাষা হারিয়ে যেতে পারে। এছাড়া ভাষা-সংযোগের কেন্দ্রে ও ভাষাটির প্রান্তীয় সীমায় সংযোগ পরিস্থিতি একরকম থাকে না, ফলে ভাষাটির ভৌগোলিক পরিসীমায় বিভিন্ন অঞ্চলে বাকমিশ্রণ পরিস্থিতিও ভিন্ন-রকম হয়। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে মাঠভিত্তিক ব্যাপক ভাষাজরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এগুলোর বিলোপের সমাজ-বৈজ্ঞানিক ও ভাষা-বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সে কারণে 'ভাষা বিলুপ্তি'র তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বিদ্যমান তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষা চিহ্নিতকরণ, কিসের ভিত্তিতেই বা তাদের আমরা বিলুপ্ত ভাষা বলব, এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতে কোন কোন ভাষা বিলোপের সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে—এসকল বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়াসেই বর্তমান প্রবন্ধ রচিত।

১.২. বিলুপ্ত ভাষা বনাম মৃতভাষা: তাত্ত্বিক নির্মাণ

পৃথিবীর মানব বৈচিত্র্যের একটি অন্যতম উপাদান তার বাকসংকেত বা ভাষা। বিশ্বায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আগ্রাসী দাপটে বিপন্ন মানব বৈচিত্র্যের সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হলো তার বাগ্‌বৈচিত্র্য বা ভাষাবৈচিত্র্য। পৃথিবীর মানচিত্রে আয়তনের হিসেবে ক্ষুদ্র হলেও ভাষাবৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্রোতে উন্নয়নশীল এ ভূ-খণ্ডের ক্ষুদ্রজাতিসত্তাসমূহের স্বাতন্ত্র্যিক ভাষা-সংস্কৃতিও ঝুঁকির সম্মুখীন। এছাড়া ভূ-গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের কিছু অঞ্চলের ক্ষুদ্রজাতিসত্তার ভাষাও হারিয়ে যাওয়ার

ঝুঁকিতে রয়েছে। সমকালীন নানা ভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণায় গবেষকরা দেখিয়েছেন একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রায় নব্বই শতাংশ ভাষাই হারিয়ে যাবে।[২] ভবিষ্যৎ ভাষা-বিপন্নতার এমন অনুকল্পিত চিত্র আমাদেরকে, অর্থাৎ, পৃথিবীর মানুষকে ততটা আলোড়িত করে না যতটা বিচলিত হই পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তির আশঙ্কায়। কিন্তু ওই বিপন্ন ভাষাগুলোর তালিকায় প্রত্যেকের নিজের ভাষাকে কল্পনা করে নিলে বর্তমান শতাব্দীর অনুকল্পিত ভাষা-বিপন্নতার ভয়াবহ চিত্র আমাদের দৃষ্টিতে খুব সহজেই মূর্তমান হয়ে উঠবে। এ কারণেই পৃথিবীব্যাপী সমকালীন ভাষাবৈজ্ঞানিক চর্চায় ভাষামৃত্যু, ভাষা বিলোপ, ভাষা রক্ষণাবেক্ষণ, ভাষা পরিকল্পনা— এসকল বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশের ভাষা-বিপন্নতার চিত্র বর্ণনার পূর্বে 'বিপন্ন ভাষা' বা 'বিপদাপন্ন ভাষা' কিংবা ভাষা-মৃত্যু (language death) ও ভাষা-বিলোপ (language extinction)-এর তাত্ত্বিক বিভাজনটি উপস্থাপন করা প্রয়োজন যা বস্তুত 'ভাষা-বিপন্নতা'র তাত্ত্বিক পটভূমি পর্যবেক্ষণে আমাদেরকে সহায়তা করবে। 'বিপন্ন-ভাষা' বলতে সাধারণত কোনো একটি ভাষার ভাষীসংখ্যার ক্রমহ্রাসমানতাকে নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ, ওই ভাষাটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা এতটাই কমে গিয়েছে যে, অব্যবহিত অল্প কিছু কালের মধ্যেই ভাষাটিতে কথা বলবার মতো আর কেউ থাকবে না। ভাষা-বিপন্নতা বর্ণনায় 'মৃত-ভাষা' (dead language) কিংবা 'বিলুপ্ত-ভাষা'—এ দুটি ভাষাবৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায়শই সমার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩] সাধারণত কোনো একটি ভাষার যখন মৌখিক ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় তখন ভাষাটির মৃত্যু ঘটে বলে বর্ণনা করা হয়।[৪] একটি ভাষার মৌখিক ব্যবহার বন্ধ হবার প্রধান কারণ হিসেবে ভাষাটির ব্যবহারকারী জনসংখ্যার ক্রমহ্রাসকে দায়ী করা হয়। তবে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কোনো ভাষার সর্বশেষ ভাষীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভাষাটির মৃত্যুর বর্ণনা ভাষাবিজ্ঞানসম্মত নয়। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, ভাষা-বিপন্নতা নির্ধারিত হয় কোনো ভাষার তিনটি অবস্থাকে ভিত্তি করে: এক. ভাষাটির ব্যবহারকারী জনসংখ্যা; দুই. ওই ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক সমৃদ্ধি বা ভাষিক সামর্থ্য; এবং তিন. ভাষাটির লিপিবদ্ধ রূপ। কোনো একটি ভাষার বিপন্নতা নির্ধারণের প্রথম মাপকাঠি হলো ওই ভাষার ব্যবহারকারী জনসংখ্যার উপস্থাপন। যে ভাষার ব্যবহারকারী জনসংখ্যা যত বেশি তার মৃত্যু বা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তত কম। উল্লেখ্য, ব্যবহারকারী জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীর ভাষাগুলোকে শ্রেণীকরণ করা হয় ক্ষুদ্রভাষা ও বৃহত্তর ভাষা—এ দুটি ভাগে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ ও গণহত্যা, এবং কোনো ভৌগোলিক সীমানার অর্ন্তভুক্ত বৃহত্তর ভাষাটির ভাষীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও দমনের ফলে ক্ষুদ্রভাষাটির মৃত্যু ঘটে বা হারিয়ে যায় কিংবা মিলিয়ে যায় বৃহত্তর ভাষাটির মাঝে।[৫] সংখ্যার বিচারে কোনো ভাষার বিপন্নতা নির্ণয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো- প্রজন্মান্তরে বিপন্নভাষাটির ব্যবহারকারী জনসংখ্যা কমে যায়। অর্থাৎ, ভাষা-সংযোগের ফলে বিপন্ন-ভাষার ভাষী-শিশুটি ইতোমধ্যেই পরিবর্তিত নতুন

ভাষা-পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হতে থাকে। এরকম অবস্থায় ওই ভাষার ভাষী কোনো বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির তুলনায় একটি শিশুর ভাষাবোধ (language competence) নিশ্চিতভাবে সীমিত হয়ে থাকে এবং এক পর্যায়ে নতুন প্রজন্মে ভাষাটি ব্যবহার করার মতো আর কেউ থাকে না। তবে একটি ভাষার ভাষী-সংখ্যার ক্রমহ্রাসই ওই ভাষাটির বিলুপ্তির একমাত্র ও প্রধান কারণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিপন্ন ভাষার ভাষীরা সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাষা পরিত্যাগ করে অন্য একটি ভাষা গ্রহণ করতে পারে যাকে সমাজভাষাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'ভাষা-সরণ'।[৬] ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর স্বাধীন হওয়ার পরে সেখানে মালয়ীজ ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষাকেই দেশটির প্রথম ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। আবার সিঙ্গাপুরের চীনা ভাষার বিভিন্ন উপভাষার ভাষী-অভিবাসীদের সরণ ঘটেছে চীনা ম্যান্দারিন ভাষায়। এ রকম ভাষা-পরিস্থিতিতে যদি বিপন্ন-ভাষাটি আর অন্য কোথাও প্রচলিত না থাকে এবং যদি ভাষাটির কোনো লিখিত নিদর্শন না থাকে তাহলে ক্রমেই ভাষাটি হারিয়ে যায় মানুষের মুখ থেকে। ভাষার বিপন্নতা নির্ণয়ে দ্বিতীয় মাপকাঠি হিসেবে ভাষাতাত্ত্বিক সমৃদ্ধি বলতে বোঝানো হয়েছে একটি ভাষার সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার, ভাষাটির সৃষ্টিশীলতা, অর্থাৎ, প্রয়োজনে নতুন পদ এবং বাক্য সৃষ্টির ক্ষমতা, যেকোনো ভাষার লিখিত টেক্সট বা পাঠ উপকরণকে ওই ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব কিনা, এবং সম্ভাব্য সংজ্ঞাপনের সকল ক্ষেত্রে ভাষাটিতে যোগাযোগের সম্ভাব্যতা। তৃতীয়ত, একটি ভাষার লিপি ও লিখিত রূপ ভাষাটিকে স্থায়িত্ব দেয়। একটি ভাষার ভাষীদের মৃত্যু, কিংবা প্রভাবশালী ভাষাটির দ্বারা ভাষিক দমন, এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে সংঘটিত ভাষা সংযোগ—যেকোনো কারণেই হোক ভাষাটির মৌখিক ব্যবহার সীমিত হতে হতে বন্ধ হয়ে গেলেও লিপিবদ্ধ রূপ থাকার কারণেই ভাষাটি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় না; ভাষাটির অস্তিত্ব একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পায়। উদাহরণ হিসেবে সংস্কৃত ভাষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক সমৃদ্ধি এবং নিজস্ব লিপি ও লিপিবদ্ধ রূপ, অর্থাৎ, নিজস্ব লিখনরীতিতে রচিত সমৃদ্ধ সাহিত্যিক এবং দালীলিক নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও ভাষাটি একটি মৃতভাষায় পরিণত হয়েছে কেবল ভাষাটিতে সমাজের মানুষের মৌখিক পারস্পরিক যোগাযোগ না থাকার কারণে। কিন্তু নিজস্ব লিপি ও লিপিবদ্ধ রূপ থাকার কারণেই ভাষাটি হারিয়ে যায়নি পৃথিবী থেকে, বরং সংস্কৃত ভাষা প্রায় দুই হাজার বছর ধরে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবেই টিকে আছে। ভারতের সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ২২টি ভাষার একটি হলো সংস্কৃত ভাষা এবং ভারত সরকার ইতোমধ্যেই ভাষাটির ব্যাপক প্রচলনের জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।[৭] এ কারণে সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা বলা হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশও রয়েছে।[৮] সুতরাং, এ পর্যায়ে মৃতভাষা হিসেবে সেসকল ভাষাকে চিহ্নিত করা যায় যে ভাষাগুলোর বর্তমানে আর কোনো বাস্তব যোগাযোগীয় ব্যবহারিক ভিত্তি নেই,

কেবল নথিভিত্তিক প্রমাণ হিসেবে টিকে আছে ইতিহাসে, সাহিত্যিক নিদর্শনে। অন্যদিকে, যে ভাষা একই-সঙ্গে হারিয়ে গেছে মানুষের মুখ থেকে এবং কোনো লিখিত নিদর্শন না থাকার কারণে ভাষাটির কোনো ভাষিক তথ্য-উপাত্তও আর পাওয়া যায় না সেই ভাষাগুলোকে হারিয়ে যাওয়া ভাষা কিংবা লুপ্ত-ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বিবর্তন বাকপ্রবাহের এক অমোঘ স্বভাব। বিবর্তনের ফলে ভাষা বিকশিত হয়, উন্নত হয়; আবার বিবর্তিত হতে হতে একটি ভাষা তার মূল থেকে এতটাই দূরে সরে যায় যে ভাষাটি অন্যকোনো ভাষাবংশের পরিচয়ে নবজন্ম লাভ করে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে চাকমা ভাষার উল্লেখ করা যেতে পারে। চীনা-তিব্বতী ভাষাবংশের তিব্বতী-বর্মী শাখার ভাষা চাকমা ইন্দো-আর্য ভাষা বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে এতোটাই বিবর্তন লাভ করেছে যে এক পর্যায়ে ইন্দো-আর্য ভাষাবৈশিষ্ট্য অর্জন করে।[৯] এই ভাষা-সংযোগের কারণেও ভাষার বিপন্নতা, মৃত্যু কিংবা বিলোপ ঘটে থাকে। তবে বিবর্তন সকল ভাষার জন্য অমোঘ হলেও বিলুপ্তি সকল ভাষার জন্য অবশ্যম্ভাবী নয়। এমনকি বিবর্তনের ফলে ভাষার বিলোপ ঘটে তাও বলা যাবে না। এছাড়া একটি ভাষা হঠাৎ করে হারিয়ে যায় না; ভাষাটি হারিয়ে যায় দীর্ঘকালের পরিক্রমায়। তাই যে ভাষাগুলো ইতোমধ্যেই হারিয়ে গেছে সেই ভাষাগুলোকে চিহ্নিত করা কিংবা পুনরুদ্ধারের চেয়ে যেই ভাষাগুলো বিলোপের প্রক্রিয়ায় আছে সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা সহজ। এসকল দিক বিবেচনায় বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষার পাশাপাশি সেসকল ভাষাকেও চিহ্নিত করা হবে যেগুলো হারিয়ে যাওয়া বা বিলোপের প্রক্রিয়ায় আছে। ভাষা-বিলোপের প্রক্রিয়া বস্তুত ভাষাটির বিপন্নতার মাত্রাকেই নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভাষা বিপন্নতা কোনো স্থির অবস্থা নয়, বরং ভাষা-বিপন্নতা বলতে বিপন্ন-ভাষাটির এমন একটি অবস্থাকে নির্দেশ করে যা একই সঙ্গে চলমান এবং তা ভাষাটির বিভিন্নমাত্রিক বিপন্নতাকে বোঝায়।

২. বাংলাদেশের ভাষা

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রথম ভাষা বাংলা—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার রয়েছে সাংবিধানিক মর্যাদা।[১০] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু থেকেই এ দেশের শিশুরা ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে। সেদিক থেকে ইংরেজী বাংলাদেশের মানুষের দ্বিতীয় ভাষা। তবে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকলেও কোনো দ্বিতীয় ভাষা কিংবা বাংলা ব্যতীত অন্যকোনো রাষ্ট্রীয় দাপ্তরিক ভাষার উল্লেখ নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ হিসেবে ইংরেজী ভাষার চর্চা এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার ব্যবহারের কারণে ইংরেজীকে এ দেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু

দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষার নেই কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি আর সেই কারণেই ইংরেজীকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের 'দাপ্তরিক ভাষা' হিসেবে উল্লেখ করা না গেলেও চর্চার দিক থেকে কার্যত ইংরেজী বাংলাদেশের দাপ্তরিক ভাষা। এ দেশে বাংলাভাষী বাঙালি জনগোষ্ঠীর বাইরে রয়েছে প্রায় চল্লিশটি অন্য নৃ-গোষ্ঠী এবং এদের মধ্যে অনেকের রয়েছে পৃথক ভাষা, আবার কোনো কোনো নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত ভাষাকে কোনো ভাষার আরেকটি উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সেদিক থেকে এসকল নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার সংখ্যা ছাব্বিশটি।[১১] বাংলাদেশের এই সকল নৃ-গোষ্ঠী এবং তাদের ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা নিয়ে রয়েছে মতানৈক্য। বাংলাদেশে বাঙালি এবং অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছে কিছু সংখ্যক বিহারী যাদের প্রথম ভাষা এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হলো উর্দু।[১২] সুতরাং, আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে ক্ষুদ্রতর একটি দেশ হলেও ভাষাবৈচিত্র্য দেশটি অনন্য। উৎসের বিচারে বিভিন্ন ভাষা-পরিবারের ভাষা এই দেশে প্রচলিত আছে। সভ্যতার যে পর্যায়ে বিদেশ ভ্রমণে ভিসা-পাসপোর্ট লাগতো না সেই কালে মানুষ খুব সহজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, রাজসীমা বিস্তার, ধর্ম প্রচার ও তীর্থস্থান পরিদর্শন, শিক্ষা অর্জন বিভিন্ন কারণে এক দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে ভ্রমণ করতে পারত। আর এরই সূত্রে সংলগ্ন ভাষাগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্তঃসংযোগের ফলে একটি ভাষা অন্য ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রভাবের ফলে কোনো ভাষা পরিবর্তিত হতে হতে তার উৎস থেকে এতটাই দূরে সরে এসেছে যে তার উৎস নির্ণয় করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। যেমন, সাঁওতাল ভাষা উৎসের বিচারে অস্ট্রো এশিয়াটিক পরিবারভুক্ত।[১৩] কিন্তু ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের ইন্দো-আর্য ভাষার সঙ্গে সংযোগের ফলে এই ভাষাটিতে এত বেশি ইন্দো-আর্য শব্দ ঢুকে পড়েছে যে সাঁওতাল এবং হাজংকে ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১৪] কিন্তু সাঁওতালী ভাষার আন্তর্কাঠামো এবং ভাষিক-সূত্র অনুযায়ী ভাষাটিকে অস্ট্রোএশিয়াটিক পরিবারের সংলগ্ন হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়।[১৫] বাংলাদেশে মোট চারটি ভাষা পরিবারের ভাষা প্রচলিত আছে: ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের ইন্দো-আর্য শাখা, অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড়ীয় এবং চীনা-তিব্বতী পরিবারের তিব্বতী-বর্মী শাখা। বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে প্রচলিত ভাষাসমূহকে উৎস অনুসারে নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হলো:

ভাষা-পরিবার/ বংশ	উপদল/ বর্গ	শাখা	ভাষা	উপভাষা-বৈচিত্র্য	ভাষা-অঞ্চল
ইন্দো-ইউরোপীয়	ইন্দো-ইরানীয়	ইন্দো-আর্য	বাংলা	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা	সমগ্র বাংলাদেশ

			বিহারি/ উর্দু		ঢাকা, খুলনা, দিনাজপুর সহ বাংলাদেশের ১৩টি জেলা
			পাঞ্জাবী		
			মনিপুরী/ বিষ্ণুপ্রিয়া	মাদাইগাঙ, রাজারগাঙ	সিলেট, মৌলভীবাজার হবিগঞ্জ
			অহমিয়া		
			চাকমা/ সাকমা/ তাকাম	তঞ্চঙ্গ্যা	পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান
			হাজং		রংপুর, সিলেট
			সাদরি	ওঁরাও	রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার হবিগঞ্জ, খুলনা, ঝিনাইদহ, মাগুরা
			বাংলা ইশারা ভাষা		
			রাজোয়ার		বিলুপ্ত (সিকদার, ২০১১)
			গুজরাটি / হিন্দি		
			রোহিঙ্গা		চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
অস্ট্রো-এশিয়াটিক	মন্-খমের	উত্তর মন্-খমের	খাসি		সিলেট
			লিঙ্গাম		নেত্রকোণা
			প্নার		সিলেট, মৌলভীবাজার
			ওয়ার-জৈন্তিয়া		সিলেট, মৌলভীবাজার
	মুন্ডারি	উত্তর মুন্ডা	সাঁওতালি কোল / হোর/হো		রাজশাহী, রংপুর

			এাহালি		রাজশাহী বিলুপ্ত (সিকদার, ২০১১)
			মুন্ডা	হাসাদা, কেরা, লাতার, নাগুরি	রাজশাহী, দিনাজপুর, সিলেট
চীনা-তিব্বতী	তিব্বতী-বর্মী	কুকি-চিন	পাংখউয়া/ পাংখু/ পাংখো		রাঙামাটি
			মিজো/ হুলাংগো লেই/লুসাই/ লুশাই		রাঙামাটি
			মৈতেয়ি/ মিতেই/ মৈথেয়ি	হিন্দু মৈতেয়ি পাংগান (পাংগাল)	সিলেট, মৌলভীবাজার
			ম্রু/ মারু/ মুরুং/ম্রুং	আনক, দৌপ্রেং, সুংমা	বান্দরবান
			খুমি		বান্দরবান
			উম		বান্দরবান, রাঙামাটি
			খিয়াং/ হিয়ো/ আ-শো		বান্দরবান
		বোড়ো	উসোই/ উশোই	পানজি, জোলোই	বান্দরবান
			ককবরোক	আনং, আসলং, দেনদাক, গাবিং, কেউয়া,খালি, নাইতুং, ফাতুং, তংপাই	খাগরাছড়ি, চট্টগ্রাম
			ত্রিপুরা/ টিপরা		
			মেগাম/ মিগাম/ নেগাম		নেত্রকোণা
			রিয়াং/ রেয়াং/ কাউব্রু		রাঙামাটি
			মান্দি		ময়মনসিংহ, মধুপুর, সিলেট

			কোচ		মধুপুর,গাজীপুর, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, রংপুর-দিনাজপুর
			লালং/পাত্র		সিলেট
			ঈালিয়া		
			রাজবংশী		ময়মনসিংহ, রংপুর, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, পাবনা, বগুরা, যশোর, ঢাকা
			রেংমিত্সা/ রংমিতচা		বান্দরবান (প্রায় বিলুপ্ত)
		সাক-লুইশ	চাক		পার্বত্য চট্টগ্রাম
			ঠার/থেক		(বিলুপ্তির পথে)[১৬]
		লোলো-বার্মিজ	রাখাইন/ মগ	সিত্বে	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালি
			এারমা		রাঙামাটি, বান্দরবান খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার
দ্রাবিড়ীয়	উত্তর দ্রাবিড়ীয়		কুরুখ	ওরাওঁ/ উরাওঁ (সাদরি/ ওরাওঁ থেকে স্বতন্ত্র)	রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগ্রাম
			সৌরিয়া পাহারিয়া/ পাহারিয়া/ মালতো		রাজশাহী, রংপুর (বর্তমানে বিলুপ্ত)

সূত্রঃ Grierson, ১৯২৭;[১৭] Ethnologue, ২০১৩;[১৮] এবং সিকদার, ২০১১

২.১. ভাষা শ্রেণীকরণের সমস্যা

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে প্রচলিত ভাষাসমূকে শ্রেণীকরণ করবার জন্য যে তিনটি উৎস ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হলো জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন প্রণীত *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* (১৯০৬); বাংলা একাডেমি প্রণীত *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (২০১১) গ্রন্থে সংকলিত সৌরভ সিকদার রচিত একটি অধ্যায় 'বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা'; সৌরভ সিকদার প্রণীত *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি* (২০১১); এবং এথনোলগ (২০১৫)। এ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ভাষাগুলো সম্পর্কে সাদৃশ্যপূর্ণ তথ্যের পাশাপাশি যে ভাষাগুলোর উল্লেখ তিনটি উৎসের যেকোনো একটি উৎসে উল্লেখ রয়েছে এমন সকল তথ্যই উপরের তালিকায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে এ উৎসগুলোতে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাপরিবারের ভাষাসমূহের সংখ্যা নিয়ে রয়েছে তথ্যবিভ্রান্তি। যেমন, এথনোলগ (২০১৩)-তে বাংলাদেশে অভিবাসী বিহারী জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে উর্দু উল্লেখ করা হলেও পাঞ্জাবী কিংবা গুজরাটি কিংবা হিন্দির কথা উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু সিকদার (২০১১)-এ ভাষাগুলোর উল্লেখ রয়েছে। তবে উর্দু, পাঞ্জাবী, কিংবা গুজরাটি বা হিন্দি এদেশে অভিবাসী ভাষা বলে বর্তমান প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বিপন্ন-ভাষা চিহ্নিতকরণে এ ভাষাগুলো উল্লেখ করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যায় যে, বাংলা ইশারা ভাষাকে এর প্রতীকসংশ্রয় এবং পদগঠন ও বাক্যগঠন প্রক্রিয়ার দিক থেকে বাংলা থেকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিতকরণ যৌক্তিক নয়। বরং বাংলা ইশারা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে কেবলই এর প্রকাশের ভিন্নতর ভঙ্গির কারণে। তাই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বাংলা ইশারা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে উল্লিখিত হবে না। এছাড়া উপরের তালিকায় উল্লিখিত সবগুলো ভাষার ব্যবহারের অঞ্চল নির্দেশ করা যায়নি। কেবল এথনোলগ (২০১৩)-তে যে ভাষাগুলোর ব্যবহারের অঞ্চল নির্দেশ করা আছে কেবল সে ভাষাগুলোরই ভাষা-অঞ্চল উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, গ্রিয়ারসন সম্পাদিত ভাষাজরিপে উল্লিখিত ভাষা-অঞ্চল বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা-কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অন্যদিকে এথনোলগ (২০১৩)-তে বাংলাদেশের ২০০১ সালে সম্পন্ন জনশুমারি অনুযায়ী তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু ভাষার ঔপভাষিক বৈচিত্র্য নিয়েও ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন, সিকদার (২০১১) মারমা এবং রাখাইনকে পরস্পরের উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু এথনোলগ (২০১৩)-এ মারমা এবং রাখাইনকে দুটি ভিন্ন ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে মারমা জনশ্রুতি অনুযায়ী মারমা এবং রাখাইন স্বতন্ত্র কোনো ভাষা নয়, বরং দুটি পরস্পরের উপভাষা হিসেবেই মারমা ও রাখাইন সমাজে স্বীকৃত। এছাড়া এথনোলগ (২০১৩)-এ রোহিঙ্গ্যা ভাষার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সিকদার (২০১১) এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (২০০৭) (কামাল, ২০০৭)-তে কোনো রোহিঙ্গ্যা জাতি কিংবা ভাষা-গোষ্ঠীর নাম উল্লিখিত হয়নি।[১৯] এছাড়া

পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে অভিবাসী রোহিঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের চট্টগ্রামের উপভাষায় কথা বলে।[২০] এসকল বিষয় বিবেচনায় প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বাংলাদেশের বিলুপ্ত এবং বিপন্ন-ভাষাগুলোর বর্ণনার ক্ষেত্রে মারমা/রাখাইন ও চাকমা/তনচঙ্গ্যা-কে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হবে না, বরং মারমা-রাখাইন ও চাকমা-তনচঙ্গ্যা পরস্পরের উপভাষা হিসেবে উল্লিখিত হবে এবং একই সঙ্গে রোহিঙ্গ্যা নামে কোনো ভিন্ন ভাষাকে উল্লেখ করা হবে না। এছাড়া মাহালি ভাষা সিকদার (২০১১)-এ দ্রাবিড়ীয় ভাষা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু গ্রিয়ারসন (১৯০৬) এবং পাটি (২০০২)[২১]-তে মাহালিকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের মুণ্ডারি শাখার ভাষা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই বর্তমান প্রবন্ধে মাহালিকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হলো। সুতরাং, কেবল গ্রন্থগত গবেষণা (library research) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে প্রচলিত ভাষাসমূহের বর্তমান সংখ্যা কত, প্রতিটি ভাষার ভাষী কতজন এবং ভাষাগুলোর ঔপভাষিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে নির্ভুল সংখ্যাতাত্ত্বিক ও বর্ণনামূলক বিবরণ উপস্থাপন করা অসম্ভব। কারণ বাংলাদেশ, এমনকি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ভাষাবৈচিত্র্যের বিস্তৃত এবং বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে কেবল গ্রিয়ারসন সম্পাদিত (১৯০৩-১৯২১) *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে* যার বয়স প্রায় একশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এই একশ বছরে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানা যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি এই অঞ্চলের অপ্রধান এবং তথাকথিত ক্ষুদ্র ভাষাগুলোর পারস্পরিক সংযোগ এবং তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর ভাষাগুলোর আধিপত্যের কারণে ঘটেছে ভাষা-পরির্তন। সাম্প্রতিক গবেষণায় (সিকদার, ২০১১) কোনো কোনো ভাষাকে বিলুপ্ত হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন দ্রাবিড়ীয় মাহালি ও পাহাড়িয়া বা মালতো ভাষা এবং ইন্দো-ইন্দোরোপীয় রাজোয়ার ভাষা। এসকল কারণে বাংলাদেশের ভাষাসমূহ সম্পর্কে অন্তত সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য হালনাগাদ করবার জন্য বাংলাদেশের সামগ্রিক এবং সামন্বয়িক ভাষা জরিপ এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

৩. বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষা

যে ভাষাটি ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই ভাষাটি চিহ্নিতকরণ নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য। কারণ যে ভাষায় আর কেউ কথা বলে না, যে ভাষাটি সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না, কিংবা যে ভাষার কোনো লিখিত নিদর্শন নেই সেই রকম একটি ভাষা সম্পর্কে বলতে গেলে সমসাময়িক মানুষের কাছে তা রীতিমতো কাল্পনিক বলে মনে হয়। তাই কোনো বিলুপ্ত ভাষা চিহ্নিতকরণে প্রথম পদক্ষেপে ওই অঞ্চলের ভাষাগুলো সম্পর্কে কালানুক্রমিক বিভিন্ন জরিপ কিংবা গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে সমসাময়িক কালের কোনো গবেষণা কিংবা জরিপে যে ভাষাগুলো অনুপস্থিত সেগুলোকে বিলুপ্ত হিসেবে বিবেচনা

করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমসাময়িক কালের তথ্য-উৎসে যে ভাষাগুলোর উল্লেখ নেই সেগুলোকে চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ গবেষণার মাধ্যমে সেই ভাষাগুলোর বর্তমান অবস্থা, অর্থাৎ, তার বিলোপ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ গবেষণার কোনো সুযোগ নেই বলে কেবল গ্রন্থগত উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন আইরিশ ভাষাবিদ এবং ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তা স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনের সম্পাদনায় ১৮৯৮ সাল থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া*। এর পরে অবিভক্ত ভারত এবং দেশবিভাগ পরবর্তী পাকিস্তান এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে এরকম সামগ্রিক ভাষা-জরিপের আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ করা যায় যে, জাতিসংঘের ইউনেস্কো প্রণীত বিশ্বের ভাষা-বিপন্নতার বৈদ্যুতীন মানচিত্রে (e-map) বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষা হিসেবে কোনো ভাষাকে চিহ্নিত করা হয়নি।[২২] তারপরও সাম্প্রতিক গবেষণায় যে ভাষাগুলোকে ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে কেবল সেগুলোকেই বর্তমান প্রবন্ধে বিলুপ্ত ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সিকদার (২০১১) বাংলাদেশে প্রচলিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের ইন্দো-আর্য শাখার রাজোয়ার এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের মাহালি ও দ্রাবিড়ীয় পরিবারের পাহাড়িয়া বা মালতো ভাষাকে বর্তমানে বিলুপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ আছে যে, মাহালি, মালতো (পাহারিয়া) ও রাজোয়ার-ভাষীরা বর্তমানে ইন্দো-ইউরোপীয় সাদরি ভাষা ব্যবহার করে।

৩.১. বাংলাদেশে ভাষার বিলুপ্তি ও বিপন্নতা

ভাষা -বিপন্নতা প্রসঙ্গে একটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ্য যে, বিপন্ন ভাষাকেন্দ্রিক সচেতনতা কেবল যে ভাষাগুলো ইতোমধ্যেই মৃত, কিংবা বিলুপ্ত, কিংবা বিলুপ্তপ্রায় সেগুলোকে নিয়েই আবর্তিত হবে তা বাস্তবসম্মত নয় এবং কাম্যও নয়। কারণ চলতি শতাব্দীর মধ্যে যদি পৃথিবীর প্রায় নব্বই শতাংশ ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে সংখ্যার বিচারে বর্তমান পৃথিবীর অনেক প্রভাববিস্তারী ভাষাও আমরা হারিয়ে ফেলব। সুতরাং, বিপন্নতার চিত্র এবং আভাস নিশ্চয়ই সব ভাষার জন্য এক রকম নয়। আন্তর্জালে (internet) আবদ্ধ সমকালীন পৃথিবীতে ভাষার ব্যবহার ও ভাষিক যোগাযোগের অন্যতম ক্ষেত্র হলো আন্তর্জাল। আন্তর্জালিক যোগাযোগে ভাষিক প্রকাশ ও উপস্থাপন সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির উন্নতি এবং একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রযুক্তি-ঘনিষ্ঠতার কারণে। আগামীর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী ভাষার আগ্রাসনের বলয় থেকে সেসকল ভাষাই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে থাকবে যারা ভাষাকে আর্ন্তজালের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে পারবে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বাংলাভাষার কথাই বলা যায়। ২০১০-এর হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় বাংলার স্বভাষী বাইশ কোটি মিলিয়ে বর্তমানে পৃথিবীতে বাংলার সর্বমোট

ভাষীর সংখ্যা প্রায় তিরিশ কোটি।[২৩] প্রায় বারোশ বছর বয়সী বাংলা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রথম ভাষা; ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আরো দুটি রাজ্যে প্রভাববিস্তারী ভাষা। এ ভাষায় প্রায় বারো শতাব্দীকাল ধরে রচিত সমৃদ্ধ সাহিত্যদৃষ্টে এবং ভাষা চর্চারইতিহাস পর্যালোচনায় বাংলাকে পৃথিবীর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত এবং বিকশিত ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একই সঙ্গে ভাষিক সামর্থ্যের দিক থেকেও বাংলা উন্নত ভাষা হিসেবে আজ স্বপ্রতিষ্ঠিত। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলার ভাষার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনায় একটি বিষয় প্রায়শ:ই আলোচিত হয়- ইংরেজি ভাষার অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও সামাজিক আধিপত্যে বাংলার 'ভাষাদূষণ' এবং এর থেকে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ বিপন্নতার অনুকল্পনও লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে আন্তর্জালিক প্রকাশে বাংলার স্থিতি এবং বাংলাভাষার আন্তর্জালিক প্রকাশগত সামর্থ্যের প্রাযুক্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে আগামী একশো বছরে পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া ভাষাদের তালিকায় আমাদের অন্তত বাংলাভাষাকে দেখতে হবে না। সুতরাং, একটি বিষয় স্পষ্ট যে বাংলাদেশের অন্যান্য অপ্রধান ভাষাগুলোর বিপন্নতার তুলনায় বাংলা বিপন্ন-ভাষা নয়। কিন্তু যে ভাষাগুলোর ভাষীর সংখ্যা ক্রমশ নিম্নগামী, এবং ভাষিক সামর্থ্য ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং একই সঙ্গে নিজস্ব লিখনরীতিতে উপস্থাপনের সামর্থ্যের দিক থেকে দুর্বল সে ভাষাগুলোকেই বিপন্ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। বিপন্নতার মানদণ্ডে যে ভাষাগুলোর অবস্থান সর্বনিম্নে, নিঃসন্দেহে সেই ভাষাগুলোই আগে হারিয়ে যাবে। যে অবস্থাগুলোর ভিত্তিতে একটি ভাষার বিপন্নতার স্তর নির্ধারণ করা যায় সেগুলো হতে পারে প্রথমত, ভাষাটির আন্তর্জাতিকতা, অর্থাৎ, বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কিনা; দ্বিতীয়ত, যোগাযোগীয় সামর্থ্য, অর্থাৎ, যোগাযোগের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ভাষাটির ভাষিক প্রকাশের সামর্থ্য; তৃতীয়ত, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা; ব্যবহার-স্থিতি, অর্থাৎ, প্রতিটি প্রজন্মের সকলেই ভাষাটিতে মৌখিক যোগাযোগ করে থাকে কিনা; চতুর্থত, শিশু-প্রজন্ম ভাষাটি ব্যবহার করে না কি অন্য কোনো ভাষায় কথা বলে; পঞ্চমত, ভাষাটির ব্যবহারকারী কেবল বয়োজ্যেষ্ঠরা কিনা যারা সংখ্যায় নিতান্তই অল্প; এবং ষষ্ঠত, ভাষাটির অস্তিত্ব কেবলই ঐতিহাসিক সত্য কিনা এবং কেবল বিশেষ প্রয়োজন ও পরিবেশে ভাষাটির প্রতীকী ব্যবহার রয়েছে কিনা। বস্তুত এসকল বিবেচনায় একটি ভাষার বিপন্নতা এবং ভাষাটি আশু বিলুপ্ত হতে চলেছে কিনা তা নির্ধারণ করা য়ায়। উল্লেখ্য, এথনোলগ (২০১৩) দশটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে ভাষার বিপন্নতার স্তর নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে ইউনেস্কো ভাষার বিপন্নতার ছয়টি স্তর নির্ধারণ করেছে, ক. সংকাটপন্ন (vulnarable); খ. বিপন্ন (definitely endangered); গ. অতি বিপন্ন (severly endangered); ঘ. চরম বিপন্ন (critically endangered); ঙ. বিলুপ্ত (extinct); এবং চ. পুনরুদ্ধারকৃত (revitalised)।[২৪] সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে ভাষাগুলো উপরে উল্লিখিত বিপন্নতা মাত্রার চতুর্থ, অর্থাৎ, 'চরম বিপন্ন' স্তরে আছে সেই ভাষাগুলোই আশু বিলুপ্ত হতে চলেছে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের

বিপন্ন-ভাষা চিহ্নিতকরণে কেবল ভাষীসংখ্যা এবং নিজস্ব লিখনরীতির ব্যবহারকে ভিত্তি করে নিচের ছকটি প্রণয়ন করা হয়েছে; কারণ বিপন্নতার সকল মানদণ্ডের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিপন্ন-ভাষাগুলোকে বর্ণনা করার জন্য প্রত্যক্ষ উপাত্ত (empirical data) প্রয়োজন যা বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়।

ভাষা	ভাষী-সংখ্যা		লিপি	বিপন্নতার স্তর	মন্তব্য
	সিকদার (২০১১)	এথনোলোগ (২০১৩)			
রাজোয়ার	—		অহমিয়া		বিলুপ্ত
বিষ্ণুপ্রিয়া		৪০,০০০	নেই	শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত	বিকাশমান
অহমিয়া	—		নেই		নিজেদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত
চাকমা	২,৫২,৯৮৬	১,৫০,০০০	মন্-খমের	বৃহত্তর যোগাযোগের মাধ্যম	বিকাশমান
হাজং	১১,৪৭৭	৮,০০০	নেই	সংকটাপন্ন	বিকাশমান
সাদরি	৫৯৮৭ ?	১,৬৬,০০০	নেই	সংকটাপন্ন	বিকাশমান
খাসি	১৩,৪১২	ন্যূনতম	নেই	চরম বিপন্ন	চরম-বিপন্ন
লিঙ্গাম	—	১,০০০	নেই	অন্য ভাষায় সরণ ঘটেছে	(লিঙ্গাম ভাষাকে খাসির একটি উপভাষা মনে করা হয়)
প্নার	—	৪,০০০	লাতিন	সংকটাপন্ন	নিজেদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত
জৈন্তিয়া	—	১৬,০০০	নেই	সংকটাপন্ন	
সাঁওতালি	২০২৭৪৪	২,২৫০০০	বাংলা / রোমান	শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত	বিকাশমান
কোল		১,৬৬০	নেই	সংকটাপন্ন	নিজেদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত
এাহালি			নেই		বিলুপ্ত (সিকদার,২০১১)
মুণ্ডারি/ মুণ্ডা	২,১১২	২,৫০০	নেই	সংকটাপন্ন	নিজেদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত
পাংখওয়া	৩,২২৭	৩,২০০	নেই / রোমান	সংকটাপন্ন	
মিযো/	৬৬২	২৫০	নেই	চরম-বিপন্ন	

লুসাই					
মৈতেয়ি	—	১৫,০০০	অহমিয়া / রোমান	সংকটাপন্ন	বিকাশমান
ম্রো	২২,১৭৮	৩০,০০০	নেই/ রোমান	সংকটাপন্ন	বিকাশমান
খুমি	১,২৪১	১০,০০০	নেই	সংকটাপন্ন	নিজেদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত
বম	৬,৯৭৮	২,০৯০	নেই	সংকটাপন্ন	বিকাশমান
হিয়ো	২৩৪৫	—	নেই	সংকটাপন্ন	বিকাশমান
উশোই	—	২২,৪০০	নেই	সংকটাপন্ন	বিকাশমান
টিপরা	—	৫০,০০০	নেই	সংকটাপন্ন	নিজেদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত
মেগাম	—	৬,৮৭০	নেই	সংকটাপন্ন	নিজেদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত
রিয়াং	—	৫০০	নেই	চরম-বিপন্ন	সরণ পর্যায়ে রয়েছে
মান্দি	৬৮,২১০	১,২০,০০০	রোমান	সংকটাপন্ন	
কোচ	—	৬,০০০	নেই	সংকটাপন্ন	
পাত্র/লালং	২,০৩৩		নেই	সংকটাপন্ন	
পালিয়া	—		নেই	সংকটাপন্ন	
রাজবংশী	৫,৪৪৪/ ২০,০০০ (?)		নেই	সংকটাপন্ন	
রেংমিত্সা	৩০ (Alo, ২০১৫)		নেই		পুনরুদ্ধারকৃত
সাক	২,০০০	৩,০০০	নেই	চরম-বিপন্ন	
ঠার	৪০,০০০		নেই	সংকটাপন্ন	
মারমা	১,৫০,০০০	বর্মি / মন্-খমের	নেই	(বৃহত্তর যোগাযোগের মাধ্যম)	বিকাশমান
রাখাইন	২,০০,০০০			(বৃহত্তর যোগাযোগের মাধ্যম)	বিকাশমান
কুরুখ	৮৫,০০০	৫০,০০০	নেই	চরম-বিপন্ন	
পাহারিয়া (মালতো)	১,৮৫৩	৭,০০০	নেই		বিলুপ্ত (সিকদার, ২০১১)

লক্ষণীয় উপরের ছকে কেবল যে ভাষাগুলোর বিলোপ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে কেবল সেগুলোকেই বিলুপ্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এথনোলগ এবং ইউনেস্কো প্রদত্ত বিপন্নতার কাঠামোর অনুসারে অন্যান্য ভাষাকে বিপন্নতার বিভিন্ন স্তরে দেখানো হয়েছে।

তবে এ শ্রেণীকরণ পদ্ধতিগতভাবে সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন নয় কারণ এ দুটি সংস্থার শ্রেণীকরণ পদ্ধতিও ভিন্ন। এছাড়া বাংলাদেশের বিপন্ন-ভাষাগুলোকে বিপন্নতার স্তর অনুযায়ী শ্রেণীকরণের কোনো স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। আর তাই এথনোলগ এবং ইউনেস্কো প্রস্তাবিত কাঠামো অনুসরণ করে বাংলাদেশের অপ্রধান ভাষাগুলোর বিপন্নতার মাত্রা নির্ণয় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এ দুটি কাঠামোর কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং এ দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত ও উপস্থাপিত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও রয়েছে দ্বিধা। তাই বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত ও সীমাবদ্ধ সুযোগের পরিসীমায় এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহেই উচ্চাভিলাষী।

৩.২. বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষা : ভাষা পরিস্থিতি

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিপন্ন-ভাষাগুলোর বিপন্নতা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি ভাষাকে বিলুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়: রাজোয়ার, মাহালি ও মালতো (পাহারিয়া)। লক্ষণীয়, সিকদার (২০১১)-তে রাজোয়ার ভাষাটির উল্লেখ রয়েছে কিন্তু পরবর্তী গবেষণা এথনোলগে (২০১৩) রাজোয়ার নামে কোনো ভাষাকে তালিকাবদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং, ধরে নেওয়া যায় এথনোলগ (২০১৩) মৌখিক সংজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে রাজোয়ার ভাষার অস্তিত্ব পায়নি বলেই ভাষাটিকে তালিকাবদ্ধ করেনি। সে কারণে বর্তমান গবেষণায় রাজোয়ার ভাষাকে বিলুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, মাহালি ও মালতো দুটি ভাষাকেই পূর্ববর্তী গবেষণা, অর্থাৎ, সিকদার (২০১১)-তে ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সিকদার (২০১১) প্রদত্ত তথ্য অনুসারে মাহালি এবং মালতো উভয় ভাষার ভাষীরা বর্তমানে সাদরি ভাষা ব্যবহার করে। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, এ দুটি ভাষার ভাষীদের ভাষা সরণ ঘটেছে সাদরি ভাষায়।

রাজোয়ার (Rajwar)

সিকদার (২০১১)-তে রাজোয়ার ভাষাকে একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হিসেবে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে এবং এ ভাষার ভাষীরা বর্তমানে সাদরি ভাষা ব্যবহার করে বলে উল্লিখিত হয়েছে। তবে গ্রিয়ারসন সম্পাদিত ভারতের ভাষাজরিপে এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। রাজোয়ার নৃ-গোষ্ঠীর বাস ভারতের বিহারে এবং এরা হিন্দির কোনো একটি উপভাষা ব্যবহার করে।[২৫] তবে কোনো কোনো তথ্যসূত্রে বাংলাদেশেও এ নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] লক্ষণীয় এ ক্ষেত্রে রাজোয়ার আদিবাসী গোষ্ঠী বাংলাভাষা ব্যবহার করে বলে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'রাজোয়ার' সম্পর্কিত দুটি তথ্যউৎসের (Martin, ১৮৩৮ এবং Joshua Project, Rajwar in Bangladesh) কোনোটিতেই একে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। এ দুটি তথ্য-উৎস অনুসারে বলা যেতে পারে যে, রাজোয়ার একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বাংলাদেশ ও ভারতের বিহারে

এরা বসবাস করে এবং বাংলাদেশের রাজোয়ারদের ভাষা বাংলা,[২৭] অথবা সাদরি।[২৮] সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, রাজোয়ার-ভাষীদের বাংলা এবং সাদরি ভাষায় সরণ ঘটেছে।

মাহালি (Mahle/ Mahili/ Mahali)

গ্রিয়ারসন মাহালিকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের মুণ্ডারি শাখার ভাষা মাহালি এবং এটি সাঁওতাল ভাষার একটি ঔপভাষিক বৈচিত্র্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন।[২৯] সিকদার (২০১১) মাহালি ভাষাকে দ্রাবিড়ীয় পরিবারের ভাষা হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে মাহালি ভাষা বিলুপ্ত এবং বর্তমানে এ ভাষার ভাষীরা ইন্দো-ইউরোপীয় সাদরি ভাষা ব্যবহার করে। তবে সিকদার (২০১১) ছাড়া অন্যান্য তথ্য-উৎসে গ্রিয়ারসন (১৯০৬) অনুসারে বাসু[৩০] এবং কোলে[৩১] মাহালি ভাষাকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের মুণ্ডারি শাখার ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গ্রিয়ারসন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম ও ময়ুরভঞ্জকে মাহালির ভাষা অঞ্চল হিসেবে নির্দেশ করেছেন। এছাড়াও এথনোলগ (২০১৩) অনুসারে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের রাজশাহী অঞ্চলে মাহালিভাষী রয়েছে। সুতরাং, মাহালি ভাষার বিলুপ্তির বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে বলে কেবল গ্রন্থগত উপাত্তের ভিত্তিতে মাহালি ভাষা বিলুপ্ত কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

মালতো (Malto)

গ্রিয়ারসন (১৯০৬) সম্পাদিত *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার* চতুর্থ খণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল পরগনার রাজমহল পাহাড় অঞ্চল, হুগলি, দিনাজপুর, দার্জিলিং, ভাগলপুর, মালদা এবং বাঙালি ও বিহারি অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে মালতোর ভাষা অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। [৩২] লক্ষণীয়, এখানে তৎকালীন পূর্ববাংলার কোনো অঞ্চল নির্দেশ করা হয়নি। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, গ্রিয়ারসনের ভাষাজরিপ অনুসারে বাংলাদেশে কোনো মালতোভাষী ছিল না। একই সঙ্গে ১৮৯০ সালে ভারতে পরিচালিত জনশুমারিতে মালতোর কোনো ভাষীসংখ্যা নির্দেশ করা হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে মালতো ভাষা সম্পর্কে গ্রিয়ারসন বলেন, æ...turned out to be a corrupt Bengali”।[৩৩] গ্রিয়ারসনের এ মন্তব্য নিঃসন্দেহেই মালতো ভাষার বাংলায় ভাষাতাত্ত্বিক সরণ (shift) সম্পর্কে আলোকপাত করে। স্যানফোর্ড জানাচ্ছেন, বিহারের রাজমহল পাহাড় ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং ত্রিপুরার নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে মালতো-ভাষীরা রয়েছে।[৩৪] এ ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশে মালতো ভাষার ভাষী রয়েছে কিনা সে সম্পর্কিত কোনো তথ্যের উল্লেখ নেই। মালতো ভাষার দুটি ঔপভাষিক বৈচিত্র্যের কথা জানা যায়, তবে, সিকদার (২০১১) মালতো ভাষীরা বর্তমানে সাদরি ভাষা ভাষা ব্যবহার করে বলে উল্লেখ করেছেন।

৪.

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষাসমূহ সম্পর্কিত বর্তমান গবেষণায় তিনটি ভাষা: রাজোয়ার, মাহালি ও মালতোকে বিলুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করলেও নির্দেশিত তথ্য-উৎসের আলোকে রাজোয়ার ভাষাকে কোনো স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। সেদিক থেকে বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভাষা হিসেবে দুটি ভাষাকে চিহ্নিত করা যায়: মাহালি ও মালতো। বাংলাদেশের বিলুপ্ত এবং বিলুপ্তপ্রায় ভাষার অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ভাষাগুলোকে কোনো একটি উৎসে হয়ত বিলুপ্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, আবার অন্য কোনো উৎসে তাকে বিপন্নতার অন্য একটি স্তরে দেখানো হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে মোট কতটি ভাষা রয়েছে এবং প্রতিটি ভাষীর সংখ্যাকেন্দ্রিক বিভ্রান্তি একটি অন্যতম সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের ভাষা বিপন্নতা পর্যালোচনায়। এরকম একটি অবস্থায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর চিহ্নিতকরণে বাংলাদেশের সকল ভাষার সামগ্রিক সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক ও সামন্বয়িক ভাষাজরিপ। এ ভাষাজরিপের মাধ্যমে অপ্রধান ভাষাগুলো যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য ভাষাগুলোর বিপন্নতার মাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন যেই ভাষাটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই ভাষাটিকে পুনর্গঠন পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। অন্যদিকে, যে ভাষাটি বিলুপ্তপ্রায় তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভাষাটির লিপি না থাকলে লিপির প্রণয়ন করে লোকসাহিত্য লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে ভাষাটির লিপিবদ্ধ রূপ নির্মাণের প্রচেষ্টা নেওয়া যেতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে অন্তত শিশুদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া অন্য ভাষার সাহিত্য ওই ভাষাটিতে অনুবাদের মাধ্যমে ভাষাটির ভাষিক সামর্থ্য বা ভাষাতাত্ত্বিক সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব হবে। কিন্তু এসকল কার্যক্রম কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী ও সামগ্রিক ভাষাপরিকল্পনা যা একইসাথে ভাষাগুলোর অবস্থান ও অবয়ব পরিকল্পনা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেবে।

তথ্যনির্দেশ

১ Mohammad Shaheed Hossain Chowdhury & Masao Koike & Shigeyuki, Critical Analysis of the Forest Policy of Bangladesh: Highlights on Conservation and People's Participation, *Forest Conservation in Protected Areas of Bangladesh* ed. by Mohammad Shaheed Hossain Chowdhury, (Springer 2014), p. 46

২ David Bradley & Maya Bradley, Introduction, *Language Endangerment and Language Maintenance*, (Routledge Curzon 2002), p. xi

৩ K David Harrison, *When Languages Die*, (Oxford University Press 2007), p. 5

৪ Dadid Crystal, *Language Death*, (Cambridge University Press 2000), p. 1

৫ Julia Sallabak, Language Endangerment, *The Sage Handbook of Sociolinguistics,* (Sage, 2011), p. 501

৬ মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ*, (নয়া উদ্যোগ ১৯৯৯), পৃ. ২৫৪

৭ BBC, BBC বাংলা retrieved from *http://www.bbc.com/bengali/multimedia/ 2014/08/ 140814_mrk_india_sanskrit* on (2016, August, 24).

৮ Rajiv Malhotra, The Battle for Sanskrit: is Sanscrit political, sacred, obsessive or liberating, dead or alive (New Delhi: Harper Collins Publisher, 2016), p. 276

৯ মনিরুজ্জামান, *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*, (বাংলা একাডেমী ১৯৯৪), পৃ. ১৫৮

১০ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৭২)।

১১ সৌরভ সিকদার, বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, (বাংলা একাডেমী ২০১১), পৃ. ১৭৯

১২ Ethnologoe, Urd, *Languages of the World* retrieved from https://www. ethnologue.com/language/urd on 2015, November 04

১৩ Ethnologoe, Santhali, *Languages of the World* retrieved from https://www. ethnologue.com/language/sat on 2015, November 04

১৪ সিকদার, ২০১১

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ সৌরভ সিকদার, বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা-সংস্কৃতি ও অধিকার, (মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ২৯

১৭ Grierson, G. A., *Linguistic Survey of India*, Vol. I, Part 1. (Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1906)

১৮ Ethnologoe, Bangladesh, *Languages of the World* retrieved from https://www.ethnologue.com/country/BD on 2015, November 04

১৯ মেসবাহ কামাল, ভূমিকা, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. xxxiii

২০ Wikipedia, *Rohingya* retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_ people#Language on 2015, January 24

২১ Rabindra Nath Pati, *Reproductive Child Health,* (APH Publishing Corporation: New Delhi 2002), p. 121

২২ UNESCO.org. *UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger*:UNESCO retrieved from http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/ on 2015, February 25.

২৩ Wikipedia, *Bengali Language* retrieved from http://en.wikipedia.org/ wiki/Bengali_language on 2015, February 25

২৪ UNESCO.org. (2015, February 25).

২৫ Robert Montogomery Martin. *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India,* (W. H. Allen and Company 1838), p 129.

২৬ Joshua Project, *Rajwar in Bangladesh*, retrieved from https://joshuaproject.net/people_groups/17934/BG on 2015, June 29

২৭ Joshua Project, 2015

২৮ সিকদার, ২০১১

২৯ Grierson, G. A., *Linguistic Survey of India*. Volume iv. (Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1906), pp. 74, 77

৩০ Sajal Basu, *Jharkhand Movement: ethnicity and culture of silence*. (The University of Michigan 1994) p. 20

৩১ Swapan Kumar Kolay, *Ecology, Economy and Tribal Development*. (Mohit Publications 2002) p. 45

৩২ Grierson, G. A., *Linguistic Survey of India*. Vol. iv. (Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1906), p. 446

৩৩ Grierson, 1906|

৩৪ Rosenblatt Lois & Stanford B. Steever, *The Dravidian Languages,* (Routledge 2015), p. 359

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬

বৌদ্ধ জাতকের আলোকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণ

মৈত্রী তালুকদার*

সারসংক্ষেপ

এ প্রবন্ধে বৌদ্ধ জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে অন্যান্য পালি গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক পর্যালাচনাপূর্বক প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণ করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে দু'প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল: প্রাক্-বৌদ্ধ যুগীয় এবং বৌদ্ধযুগীয়। বৈদিক শিক্ষাই মূলত প্রাক্-বৌদ্ধ যুগীয় শিক্ষা নামে অভিহিত। বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে সাদৃশ্য থাকলেও বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রচার-প্রসার লাভপূর্বক ভারতীয় সমাজজীবন ও শিক্ষা জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করে। কারণ বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রবর্তিত শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য ছিল উন্মুক্ত। এ শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা তথা প্রাকৃত ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে বিশাল জনগোষ্ঠী মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ লাভ করে এবং শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রবর্তিত শিক্ষার মূলকেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহার। ফলে বৈদিকযুগে প্রচলিত নগরকেন্দ্রিক শিক্ষা বৌদ্ধযুগে রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘের কল্যাণে গুরুগৃহের পরিবর্তের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ব্যবস্থা এবং বিদ্যায়তন ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাছাড়া, নারীশিক্ষা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার আর এক অভিনব সূচনা। ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ফলে নারীশিক্ষার হার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, সংস্কৃতি সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত লোক সংস্কৃতির অনন্য উপাদান বিশেষত আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, উৎসব, কলা-কৌশল বা ভোজবাজি প্রদর্শন, খেলাধূলা-প্রতিযোগিতা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার, লোক বিশ্বাস প্রভৃতি প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। উপর্যুক্ত কারণে ধারণা করা হয় যে, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধযুগে প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কৃতিই বর্তমান ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি দান করেছিল।

১. ভূমিকা

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সমাজজীবনের অন্যতম দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ দু'টি বিষয়ের বর্ণনা ব্যতীত কোনো জাতির পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত ইতিহাস রচিত হতে পারে না। এ কারণে শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে এবং সংস্কৃতিকে জাতির দর্পণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শিক্ষা একদিকে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করে, অপরদিকে জাতীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে সহযোগিতা করে। অনুরূপভাবে, সংস্কৃতি মননশীলতাকে ঋদ্ধ করে মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়। এতে বোঝা যায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে যে জাতি যত বেশী সমৃদ্ধ সেজাতি বিশ্ব দরবারে তত বেশী মর্যাদার আসনে সমাসীন। বৌদ্ধ জাতকে প্রাচীন

* সিনিয়র সহকারী (সেমিনার) গ্রন্থাগারিক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে বহু তথ্য পাওয়া যায়। সেসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচন করাই এ প্রবন্ধের মৌল অভীপ্সা।

২. জাতক পরিচিতি

'জাতক' শব্দটি 'জাত' হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'জাত' শব্দটি 'জনেতি' ক্রিয়ার অতীতকালের ক্রিয়া বাচক বিশেষণ, যার অর্থ উৎপন্ন, উদ্ভূত, প্রসূত, জন্ম ইত্যাদি।[১] সুতরাং, 'জাতক' শব্দের অর্থ যিনি উৎপন্ন বা জন্মলাভ করেছেন। টি. ডব্লিউ রীচ ডেবিডস্ এবং উইলিয়াম স্টিড (T.W.Rhys Davids and Willam Stede)[২] 'জাতক' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ করেছেন এরূপ : Jāta+ka = Jātaka, that means belonging to, connected with what has happened, a birth story as found in the earlier books; this is always the story of a previous birth of the Buddha as a wise man of old. রবার্ট সিজার চাইল্ডার্স (Rober Caesar Childers) রচিত *Dictionary of the Pali Language*[৩] গ্রন্থ মতে জাতক শব্দের অর্থ হলো : Birth, nativity; a birth or existence in the Buddhist sense; a jātaka, or story of one of the former births of Buddha. সমীক্ষায় দেখা যায়, জাতকে মূলত গৌতম বুদ্ধের পূর্বজীবন কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। অতএব, উপরে বর্ণিত বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে বলা যায়, 'জাতক' শব্দের অর্থ 'যিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন'— এরূপ অর্থ বোঝালেও পালি সাহিত্যে একমাত্র গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বোঝাতেই 'জাতক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনী বৌদ্ধ সাহিত্যর ভাণ্ডারে 'জাতক' নামে অভিহিত। কাহিনীগুলো যে গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সে গ্রন্থও 'জাতক' নামে পরিচিত। বৌদ্ধ সাহিত্য মতে, সিদ্ধার্থ গৌতম এক জন্মের পুণ্য কর্মের ফলে বুদ্ধ হননি। বুদ্ধত্ব বা বোধিজ্ঞান লাভের জন্য তাঁকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে পারমী[১] সাধনা করতে হয়েছিল। পালি সাহিত্যে উল্লেখ আছে, বুদ্ধ দশ পারমী[৪] চর্চা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের মধ্য দিয়ে তাঁর জাতিস্বর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জাতিস্বর জ্ঞানের দ্বারা তিনি অতীত জীবনের কাহিনী বলতে পারতেন। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক বা ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষাদানের জন্য তিনি শিষ্যদের তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী বলতেন। নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট এসব কাহিনী অতীব চিত্তাকর্ষক, মনোরম এবং চমকপ্রদ।

জাতকের একটি নির্দিষ্ট গঠনশৈলী রয়েছে। প্রতিটি জাতক প্রধানত প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কথা, অতীত বস্তু, সমাধান বা সমবধান—এ তিনটি অংশে বিভক্ত।[৫] প্রথম অংশে গৌতম বুদ্ধ কখন, কার উদ্দেশ্যে এবং কি উপলক্ষে জাতকটি ভাষণ করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। এই অংশটিকে জাতকের উপক্রমণিকা বা ভূমিকাও বলা হয়। এ অংশে গৌতমবুদ্ধের সমকালীন ঘটনা বা বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এটিই

হলো প্রকৃত জাতক বা মূল কাহিনী। তৃতীয় অংশে অতীতবস্তুতে বর্ণিত চরিত্রগুলোর সঙ্গে প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রগুলোর সম্পর্ক প্রদর্শন করা হয়েছে।

সমীক্ষায় দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচারকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে জাতকগুলো ভাষণ করেছিলেন। এ কারণে জাতকে বিক্ষিপ্তভাবে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট বহু তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্য মূলত জাতকের 'প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কথা' নামক অংশে পাওয়া যায়। এ অংশে বর্ণিত বিষয় জাতক রচয়িতার বা জাতক ভাষণকারীর সমকালীন। এ অংশের তথ্যসমূহ জাতক ভাষণকারীর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ বা দৃষ্ট হওয়ায় এসব তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এ কারণে গবেষকগণ জাতকের এ অংশটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা থাকেন। মূলত জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু অংশে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকেই প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

৩. উৎস সমীক্ষা

উল্লেখ্য যে, সকল জাতকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় না। তাই জাতক গ্রন্থ সমীক্ষাপূর্বক কোন কোন জাতকে আলোচ্য বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় সেসব জাতক প্রথমে চিহ্নিত করা হলো এবং বন্ধনীতে লণ্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হতে প্রকাশিত জাতক গ্রন্থের খণ্ড সংখ্যা ও পৃষ্ঠা নম্বর প্রদত্ত হলো :

লোসকজাতক (I., pp. 236-241), তক্কজাতক (I., pp. 295-299), বরণজাতক (I., pp. 317-319), ভীমসেনজাতক (I., pp. 356-359), অসাতরূপজাতক (I., p. 409-411), সঞ্জীবজাতক (I., pp. 510-511). লাঙ্গলীসজাতক (I., pp. 447-449), কটাহকজাতক (I., pp. 451-454), অলীনচিত্তজাতক (II., pp. 18-22), সুসীমজাতক (II., pp. 46-50), অনভিরতিজাতক (II., pp. 100-101), পলায়িজাতক (II., pp. 217-218), উপাহনজাতক (II., pp. 221-224), গুপ্তিলজাতক (II., pp. 248-257), বীতিচ্ছজাতক (II., pp. 257-259), তিলমুট্ঠিজাতক (II., pp. 277-282), চূল্লকালিঙ্গজাতক (III., pp. 3-8), তুসজাতক (III., pp. 122-125), সেতকেতুজাতক (III., p. 232-237), আদিত্তজাতক (III., p. 470-474), তিত্তিরজাতক (III., pp. 537-543), জনসন্ধজাতক (IV., pp. 176-178), দূতজাতক (IV., p. 224-227), সুরুচিজাতক (IV., p. 316), চিত্তসম্ভূতজাতক (IV., pp. 390-400), ভদ্দসালজাতকে (IV., p. 153-155), মহানারদকস্সপজাতক (VI., pp. 220-255), মহাউম্মগ্গজাতক (VI., pp. 330-478), মহাসূতসোমজাতক (V., pp. 457-511) ইত্যাদি।

জাতক ছাড়াও বিভিন্ন পালি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান উৎসসমূহ হলো: দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, থেরগাথা, থেরীগাথা, বিনয়পিটক, ধম্মপদট্ঠকথা, বিমানবত্থুট্ঠকথা, থেরগাথাট্ঠকথা, থেরীগাথাট্ঠকথা, অঙ্গুত্তনিকায় অট্ঠকথা এবং মিলিন্দপ্রশ্ন।

উপর্যুক্ত উৎস ছাড়াও বিভিন্ন সংস্কৃত এবং ঐতিহাসকি আকর গ্রন্থ, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশাসন এবং নিদর্শনেও প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায। এসব তথ্যের সঙ্গে জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধনপূর্বক আলোচ্য বিষয়টি প্রকটিত করা হবে। প্রথমে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে, তৎপর সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৪. প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

৪.১. প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার উৎপত্তি

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর্যদের অবদান অনস্বীকার্য। আর্য মুনি-ঋষিরাই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সমীক্ষায় দেখা যায়, আর্যগণ নানা দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতেন। কতকগুলো পরিবার নিয়ে একেকটি দল গঠিত ছিল। পরিবারের কর্তা ছিলেন পিতা, অপর দিকে দলের কর্তা ছিলেন রাজা। পরিবারের শিক্ষাদীক্ষার ভার কর্তার উপর অর্পিত ছিল। দলের সংস্কৃতির বাহক ছিলেন পুরোহিত বা গুরু। তিনি দলের মঙ্গলের জন্য পূজা-পাঠ করতেন এবং দলের শৌর্যবীর্যের অতীত ইতিহাস গুণকীর্তন করে দলের সকলকে বীরত্ব প্রদর্শনে উৎসাহিত করতেন। ভারতে আর্যদের বসতি স্থাপনের প্রথম যুগে যুদ্ধ দেবতা ইন্দ্রের পূজা প্রচলিত ছিল। ইন্দ্রই ছিল আর্যদের প্রকৃত দেবতা। পরে বাস্তু দেবতা অগ্নির পূজা প্রচলন শুরু হয়।[৬] এ সময় উপসনার জন্য পুরোহিত বা ঋষিগণ মন্ত্রাদি রচনা করতে শুরু করেন। ঋষিদের রচিত ঋগ্ববেদকে মানবসমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। ঋক্ বা মন্ত্রের সমষ্টি বলে গ্রন্থটিকে ঋগ্বেদ বলা হয়। বৈদিক সূত্রানুসারে ঋগ্বেদ আর্যগণের সপ্ত-সিন্ধু অঞ্চলে বসবাসকালে রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদে সূত্রের সংখ্যা ১০২৮, যা দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। ধারণা করা হয় যে, একেক ঋষি বা ঋষিবংশের রচনা একেকটি মণ্ডলে সংগৃহীত হয়ে ঋগ্বেদ সংকলিত হয়েছিল। প্রথিতযশা ঋষিগণ মননের দ্বারা ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ ধারণ করতেন এবং সুর সংযোগে সেগুলো প্রকাশ করতেন। ঋষি পরিবারের লোকেরা এগুলো শ্রবণ করে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। এঁরা 'শ্রুতর্ষি' নামে অভিহিত হতেন। ঋষিগণ বনে বসবাসপূর্বক সরল ও পবিত্র জীবনযাপন করতেন। সমাধিস্থ থেকে তাঁরা সত্যজ্ঞান লাভে ব্রতী হতেন। শ্রুতর্ষিগণ ঋষিদের মতো ন্যায়-নিষ্ঠ আচরণ পূর্বক বেদমন্ত্র সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এভাবে তপোবনে ঋষি পরিবারে বেদ অধ্যয়ন ও পাঠের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ করে বলে ধারণা করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত প্রণিধান যোগ্য :

> ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবন শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছ-পালা নদী-সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল, সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল—ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকা ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল।

> ভারতবর্ষের যে দুই বড় বড় প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগ—সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন—রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি—বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল। সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি।[৭]

উপর্যুক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায়, ভারতবর্ষে ঋষিদের প্রজ্ঞালোক থেকেই শিক্ষার প্রথম রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। তৎপর ঋষি পরিবারের মাধ্যমেই তা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যপ্ত হয়। ঋষিগণই ছিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষক বা শিক্ষাগুরু।

৪.২. শিক্ষাব্যবস্থার প্রকারভেদ

পালি সাহিত্য প্রাচীন ভারতে দু'প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : প্রাক্-বৌদ্ধ যুগীয় এবং বৌদ্ধ যুগীয়। বৈদিক শিক্ষাই মূলত প্রাক্-বৌদ্ধ যুগীয় শিক্ষা নামে অভিহিত, যা পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ—এ দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত গড়ে তুলেছিল। নিম্নে উপর্যুক্ত দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

৪.২.১. প্রাক্-বৌদ্ধ যুগীয় তথা বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা

জাতক গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, বৈদিক শিক্ষা ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক। বরণজাতক (I., p. 317), ভীমসেনজাতক (I., p. 356) এবং সঞ্জীবজাতক (I., p. 510) হতে জানা যায় যে, আচার্যের সুখ্যাতি শুনে প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যা অর্জনের জন্য নগরে আগমন করতেন। আচার্যগণ পরমযত্ন ও দক্ষতাসহকারে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। উক্ত জাতকসমূহে আরো উল্লেখ আছে যে, আচার্যগণ ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ। চিত্তসম্ভূতজাতক (IV., pp. 391) পাঠে জানা যায়, বৈদিক যুগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণই বিদ্যা অর্জনের সুযোগ লাভ করতেন। নারী এবং শূদ্রের শিক্ষালাভের অধিকার ছিল না। এ জাতকে উল্লেখ আছে, চিত্ত এবং সম্ভূত নামক চণ্ডাল্লয় ব্রাহ্মণ সেজে তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণের গৃহে বিদ্যাশিক্ষা করছিলেন। অসাবধানতাবশত চণ্ডালভাষায় কথা বলায় তাদের জাতি পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা কেবল তাদের স্বকীয় শিক্ষার মধ্যে গণ্ডীভূত ছিল। তবে সে বিদ্যাও ব্রাহ্মণ গুরুর মাধ্যমে অর্জন করতে হতো। এতে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত তন্ত্রের লাভ-সৎকার বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। সে যুগের বহুল প্রচলিত কথ্য ভাষা, অর্থাৎ, প্রাকৃত ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণে ধারণা করা হয় যে, বৈদিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠী শিক্ষালাভের অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল।

বৈদিকসমাজে গুণানুসারে কর্ম-বিভাগ প্রবর্তিত হয়েছিল। মূলত সমাজের নানারকম প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে বিশেষত জীবনযাত্রা সুশৃঙ্খল করার মানসে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। বৈদিক সমাজব্যবস্থা মতে, প্রত্যেক মানুষ একেকটি বিশেষ কর্ম করবার অধিকার লাভ করতেন।

এই প্রয়োজনের তাগিতেই বর্ণাশ্রম-ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। একই কারণে কর্ম বা ব্রত-গ্রহণের উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থারও প্রচলন হয়। মানসিক উৎকর্ষ অনুসারে বৈদিক যুগে ছাত্রদের তিনভাগে বিভক্ত করে শিক্ষা প্রদান করা হতো: বেদবিদ্যা লাভে সমর্থ ব্রাহ্মণ-ঋষিগণ উন্নত মানসিক বৃত্তির অধিকারী হতেন এবং এঁরা 'উত্তমপ্রজ্ঞা' নামে অভিহিত হতেন। পরবর্তী স্তরের শিক্ষার্থীরা 'মধ্যমপ্রজ্ঞা' এবং সর্বনিম্ন স্তর 'অল্পপ্রজ্ঞা' নামে অভিহিত হতেন। সর্বনিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের জন্য পেশাভিত্তিক শিক্ষারব্যবস্থা করা হতো। এ যুগে অনার্যগণ এ শিক্ষায় অধিক নৈপুণ্য অর্জন করতেন, যার সাক্ষ্য পাওয়া যায় অলীনচিত্তজাতকে (II., p. 19)। এ জাতক সাক্ষ্য দেয় যে, সূত্রধরেরা গৃহনির্মাণকালে কাঠখণ্ড বিন্যাসের সুবিধার্থে এক, দুই ইত্যাদি অঙ্ক কাঠের উপর লিখে রাখতেন। এতে ধারণা করা যায় যে, অনার্যগণ তথাকথিত হীন পেশাজীবীরাও শিক্ষালাভ করতেন। তবে সে শিক্ষা ছিল পেশাভিত্তিক। সম্ভবত আর্যগণ বিদ্বেষবশত অনার্যগণকে এ শিক্ষায় ব্রতী করতেন।

প্রথম দিকে বৈদিক শিক্ষা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল: পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা।[৮] যে বিদ্যার মাধ্যমে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে পরাবিদ্যা বলে। পরাবিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানও বলা হয়। ঋষিগণ পরাবিদ্যা জ্ঞান বিতরণ করতে পারতেন। 'পরাবিদ্যাই' ছিল বেদ-বিদ্যা লাভের চরম লক্ষ্য। অপরদিকে যে বিদ্যার মাধ্যমে স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে জ্ঞানলাভ করা যায় তা অপরাবিদ্যা নামে অভিহিত। সংক্ষেপে বলা যায়, পরাবিদ্যা অনুভূতি নির্ভর, অপরাবিদ্যা বস্তু নির্ভর। এ দু'প্রকার বিদ্যা চতুরাশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে হতো। বৈদিকসমাজে মানবজীবনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যাকে চতুরাশ্রম বলা হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম এবং যতি বা সন্ন্যাসাশ্রম। ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে অধ্যয়নকাল বলা হয়। সংসার জীবননির্বাহ করার সময়কে গার্হস্থ্যাশ্রম বলা হয়। সংসার ত্যাগ করে অধ্যাত্ম চিন্তার সময়কে বাণপ্রস্থাশ্রম এবং মুক্তি কামনায় জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত করাকে যতি বা সন্ন্যাসাশ্রম বলে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষার সূচনা হয় গুরুগৃহে। এ শিক্ষার গভীর অনুশীলন বা চর্যা করা হয় গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম এবং যতি বা সন্ন্যাসাশ্রমে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষা গ্রহণ শেষে অনেকে গৃহী সংসার জীবন না করেই অরণ্যবাসী হতেন। তাঁরা সাধারণত লোকালয় হতে দূরে নির্জন স্থানে আশ্রম নির্মাণ করে বসবাস করতেন এবং 'অরণ্য' নামে অভিহিত হতেন।

বরণজাতক (I., pp. 317-319) এবং লাঙ্গলীসজাতকে (I., pp. 447) উল্লেখ আছে যে, প্রাক্-বৌদ্ধযুগে শিক্ষার্থীগণ গুরুগৃহে বসবাস করে বিদ্যা অর্জন করতেন। দরিদ্র ছাত্ররা অর্থের বা উপঢৌকনের পরিবর্তে সেবার দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করতেন। এরূপ ছাত্রদের 'ধর্মান্তেবাসিক' নামে অভিহিত করা হতো। অবশ্য দূতজাতক (IV., p. 224-227) সাক্ষ্য দেয় যে, দরিদ্র ছাত্ররা শিক্ষা সমাপনান্তে ভিক্ষা করে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করতেন এবং তা দিয়ে গুরুর ঋণমুক্ত হতেন। এ জাতক হতে আরো জানা যায় যে, বোধিসত্ত্বরূপী বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ বিদ্যা সমাপনান্তে ভিক্ষার দ্বারা গুরু দক্ষিণা সংগ্রহ করেন। কিন্তু নদী পার হওয়ার সময় তা নদীর মধ্যে পড়ে যায়। তৎপর

তিনি বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তকে ধর্মকথা শুনিয়ে পুনরায় গুরু দক্ষিণা লাভ করেন এবং তা দিয়ে ঋণমুক্ত হন। লোসকজাতকে (I., pp. 236-241) উল্লেখ আছে যে, বারাণসীতে প্রথা অনুসারে গ্রামবাসীগণ দরিদ্র বালকদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। এরূপ বালকরা 'পুণ্যশিষ্য' নামে অভিহত হতো। লোসকজাতক এবং তক্কজাতক (I., pp. 295-299) পাঠে জানা যায় যে, গ্রামবাসীরা নিজ সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের বাসস্থান ও বেতন প্রদান করতেন। সুসীমজাতক (II., pp. 46-50) এবং তিলমুট্ঠিজাতকে (II., pp. 277-282) উল্লেখ আছে, ধনীর পুত্রগণ বিদ্যারম্ভের পূর্বেই গুরুর 'ভাগ' বা 'দক্ষিণা' প্রদান করতেন। এরূপ শিক্ষার্থীদের 'আচার্য্যভাগদায়ক' বলা হতো। কটাহকজাতক (I., pp. 451-454) সাক্ষ্য দেয় যে, ধনীর পুত্রদের সরঞ্জামাদি বহন করে দাস-দাসীর সন্তানরাও গুরুগৃহে যেত এবং নিজেরাও লেখা পড়া শিখত। মিলিন্দ[৯] মতে, রীতি অনুসারে এককালীন গুরুদক্ষিণার পরিমাণ ছিল এক হাজার কহাপণ এবং একেজন গুরুর অধীনে পাঁচশত জনের মতো ছাত্র বিদ্যা অর্জন করত।

তিত্তিরজাতক (III., pp. 537-543) হতে জানা যায়, শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে তিল, তণ্ডুল (ধান-চাউল), তৈল বস্ত্রাদি নিয়ে যেত। আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য সমাজসেবকগণও গুরুগৃহে তণ্ডুলাদি, কাষ্ঠ এবং নানা উপকরণ প্রেরণ করতেন। এভাবে চতুষ্পাঠির ব্যয় নির্বাহ হতো। থেরগাথা[৯] গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, বিদ্যায়তনগুলো প্রধানত নগরদ্বারের নিকটে অবস্থিত ছিল। এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নগরদ্বারের নিকটে সভিয় নামক এক ব্যক্তির একটি বিদ্যায়তন ছিল যেখানে নগরবাসী শিশুরা শিক্ষালাভ করত। তিলমুট্ঠিজাতক এবং তুসজাতক (III., pp. 122-125) পাঠে জানা যায় যে, রাজপুত্রগণ এবং ব্রাহ্মণপুত্রগণ প্রথমে নিজ গৃহে বিদ্যা অর্জন করতেন, তৎপর ষোল বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গমন করতেন। নলিনীভূষণ দাসগুপ্তের মতে, পাঁচ হতে চৌদ্দ বছরের মধ্যে গৃহের শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে গুরুকুলে যোগ দিতেন।[১০] বিনয়পিটক[১১] হতে জানা যায়, রাজকুমার সিদ্ধার্থ ষোল বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। তবে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণই প্রধানত উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতেন। প্রচলিত প্রথানুসারে সম্ভ্রান্তবংশীয় সন্তানরা উচ্চশিক্ষা সমাপ্তের পূর্বে বিবাহ করতেন না এবং বিষয়কর্মেও হাত দিতেন না। দূতজাতক (IV., p. 225) এবং তিলমুট্ঠিজাতকে (II., pp. 278-9) উল্লেখ আছে যে, উচ্চশিক্ষার জন্য তক্ষশিলা, বারাণসী এবং প্রধান প্রধান নগরসমূহে চতুষ্পাঠি ছিল। তবে তক্ষশিলার চতুষ্পাঠির খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। উক্ত জাতদ্বয়ে ষোল বছর বয়সে রাজপুত্র এবং ব্রাহ্মণপুত্রগণ তক্ষশিলায় বিদ্যা অর্জনে যেতেন বলে উল্লেখ রয়েছে। তৎকালে তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষা না করলে কারো শিক্ষা সমাপ্ত হতো না বলে মনে করা হতো। সুরুচিজাতক (IV., p. 316) পাঠে জানা যায়, মিথিলার রাজপুত্র সুরুচিকুমার এবং বারাণসীর রাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার ছিলেন সমবয়সী এবং উভয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলা গমন করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধ এবং রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবক তক্ষশিলায় অধ্যয়ন করেন বলে জাতকে বর্ণিত আছে। চূল্লকসেট্ঠিজাতক (I., p. 114) এবং সংকিচ্চজাতক (V., p. 261) পাঠে জানা যায় যে, জীবক

বৌদ্ধধর্মের অন্যতম অনুসারী ছিলেন এবং একটি বৃহৎ আম্রকানন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের জন্য দান করেন, যা 'জীবকাম্রবন' নামে পরিচিত ছিল। জানা যায় যে, উচ্চশিক্ষার গ্রহণের জন্য বা কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য প্রসিদ্ধ গুরুর অধীনে সাত বছর অধ্যয়ন করতে হতো। চূল্লবর্গ [১২] সাক্ষ্য দেয় যে, দবক্ষমল্লপুত্র নামক এক ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে সাত বছর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানের সুযোগ লাভ করেছিলেন। দীর্ঘনিকায়[১৩] গ্রন্থে উল্লেখ আছে, রাজবৈদ্য জীবক সাত বছর তক্ষশিলায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিনয়পিটক[১৪] মতে, জীবক তক্ষশিলায় চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের পরেই নিজে রোগীর চিকিৎসা করার দায়িত্ব বা অনুমতি লাভ করেছিলেন। জানা যায়, অর্থশাস্ত্র প্রণেতা চাণক্য, বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পাণিনি তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন।[১৫] এতে বোঝা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে বিদ্যার্থীরা তক্ষশিলায় আগমন করতেন এবং শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে তক্ষশিলার মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চে। তক্ষশিলার খ্যাতি প্রসঙ্গে এস. সি. দাস বলেন (S. C. Das), "এ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি পশ্চিমে পারস্য, উত্তরে ব্যাকটেরিয়া এবং পূর্বে প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[১৬] মিলিন্দ প্রশ্ন[১৭] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তক্ষশিলায় ত্রিবেদের পাশাপাশি আঠার প্রকার বিদ্যা শিক্ষাদান করা হতো। বৈদিক যুগে ত্রিবেদ (ঋগ, সাম এবং যজু) শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। কারণ সেকালে ত্রিবেদকে শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অঙ্গুত্তরনিকায়, অঙ্গুত্তরট্ঠকথা, থেরগাথা প্রভৃতি গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সময়ে পিণ্ডোলভারদ্বাজ নামক এক ব্রাহ্মণকে ত্রিবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের পর ব্রাহ্মণ কুমারদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। জানা যায় যে, তিষ্য নামক রাজগৃহের এক ব্যক্তিও ত্রিবেদে পারদর্শিতা লাভের পর পাঁচশত যুবককে বৈদিক মন্ত্র শিক্ষাদানের অনুমতি লাভ করেছিলেন।[১৮] ত্রিবেদের পাশাপাশি যুদ্ধবিদ্যা, বিশেষত ধনু, অশ্ব, রথ, সৈন্য সঞ্চালন প্রভৃতিও শিক্ষাদান করা হতো। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতেন। এছাড়া, মন্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, চিকিৎসা (আয়ুর্বেদ), অর্থববেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, যাদুবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, নিধিবিদ্যা (খনিজ শাস্ত্র), দেবজনবিদ্যা (নৃত্য, গীত, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি), সর্পবিদ্যা, ব্রহ্মাবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ছন্দ, কাব্য, ব্যাকরণ, লিখন প্রভৃতিও শিক্ষাদান করা হতো।[১৯] এতে ধারণা করা যায় যে, সে সময় বেদশিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ বা সেকুল্যার শিক্ষাও দান করা হতো। এ প্রসঙ্গে নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত বলেন:

> এই সময়ের পাঠ-পরিকল্পনার বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, বর্ণাশ্রমভুক্ত সকল সম্প্রদায়কেই ধর্মানুষ্ঠানের জন্য কিছু শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভ করিতে হইত। কিন্তু পূর্বের ন্যায় সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগকে আশ্রয় করিয়া শিক্ষা-রীতির পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছিল। ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা এই সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। শব্দ-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে না পারিলে কোন শিক্ষালাভই সম্ভব হইত না। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় গণিত, বিজ্ঞান, ধনুবিদ্যা, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলন এই সময়ে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিছিল।[২০]

অনেক সময় বহু শাস্ত্রে বিদ্যালাভের জন্য শিক্ষার্থীগণ আজীবন ব্রহ্মচর্যা পালন করতেন। এঁদেরকে 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' বলা হতো।[২১] শিক্ষকগণ শিক্ষাদানকে ধর্মীয় অনুজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করতেন। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষালাভকে ধর্মের অঙ্গ মনে করত। তিলমুট্ঠিজাতক (II., pp. 277-282) সাক্ষ্য দেয় যে, অভদ্র আচরণের জন্য গুরু কখনো কখনো শিষ্যকে শারীরিক দণ্ড প্রদান করতেন। উপবাসের মাধ্যমেও দণ্ডদানের বিধান প্রচলিত ছিল।[২২] শিষ্যকে সর্বশিক্ষা তথা গুরুর অধিগত সকল বিদ্যা শিক্ষাদান করাই গুরুর কাজ। কিন্তু উপাহনজাতক (II., pp. 221-224) এবং গুত্তিলজাতকে (II., pp. 248-257) উল্লেখ পাওয়া যায় যে, গুরুরা শিষ্যদের কিছু কিছু বিষয় অব্যাখ্যাত রেখে বা গোপন রেখে শিক্ষাদান করতেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যাতে শিষ্যরা তর্কযুদ্ধে বা প্রতিযোগিতায় গুরুকে পরাজিত করতে না পারে। যেসব বিষয় অব্যাখ্যাত রাখতেন বা শিক্ষা দিতেন না তা 'আচার্য্যমুষ্টি' নামে অভিহিত। মহাসূতসোমজাতক (V., pp. 457-511) মতে, মেধাবী ছাত্ররা গুরু বা আচার্যদের অধ্যাপনাকার্যে সাহায্য করতেন। এরূপ সাহায্যকারী ছাত্ররা 'পৃষ্ঠাচার্য্য' নামে পরিচিত ছিলেন এবং আচার্য বৃদ্ধ হলে এরূপ ছাত্রদের চতুষ্পাঠির অধ্যক্ষ নিয়োজিত করতেন। কৃতকার্যের সঙ্গে শিক্ষা সমাপনান্তে কোনো ছাত্র যখন বাড়িতে ফিরে আসত, তখন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী প্রচুর আনন্দোল্লাস করত। জনসন্ধজাতক (IV., pp. 176-178) পাঠে জানা যায়, বারাণসীর রাজকুমার শিক্ষা সমাপন করে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলে রাজা খুশীতে রাজ্যের সকল বন্দীদের মুক্ত করে দেন। পলায়িজাতক (II., pp. 217-218), বীতিচ্ছজাতক (II., pp. 257-259) এবং চূল্লকালিঙ্গজাতক (III., pp. 3-8) হতে জানা যায়, শিক্ষা সমাপনান্তে যশখ্যাতি লাভের আশায় অনেক শিষ্য দূর দূরান্তে গিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে পণ বাজি রেখে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতেন। সেতকেতুজাতক (III., p. 232-237) সাক্ষ্য দেয় যে, ব্রাহ্মণবংশীয় শ্বেতকেতু নামক এক ব্যক্তি এক চণ্ডালের নিকট তর্কে পরাস্ত হয়ে অপমাণিত হয়েছিলেন।

বৈদিক যুগে প্রাথমিক শিক্ষায় মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হতো। উচ্চারণের পর শব্দ, বাক্য গঠন, অর্থ-প্রণিধানের শিক্ষা প্রদান করা হতো। সনাতন ব্যবস্থায় শুচিতা রক্ষার জন্য প্রথম দিকে বেদ বাক্যের লিখন নিষিদ্ধ ছিল। পরে পঠনের পাশাপাশি লিখনও শিক্ষা দান করা হতো। এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরু বা আচার্য কেন্দ্রিক। তপস্যালব্ধ-ঐশ্বর্যে শিষ্যকে সমৃদ্ধ করাই ছিল গুরুর ব্রত। গুরু শিষ্যের আত্মিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে চলত জ্ঞানসাধনা। গুরুর ব্যক্তিত্ব, উন্নত চরিত্র, সুগভীর প্রজ্ঞা এবং জীবনাদর্শ ছিল শিষ্যের একান্ত অনুকরণীয়।[২৩] আচার্যগণ নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে পরমযত্নে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এ কারণে সমাজে ও রাষ্ট্রে আচার্যগণ যথেষ্ট মর্যদালাভ করতেন। ছাত্ররাও আচার্যের প্রতি সম্যকভাবে দায়িত্ব পালন করতেন। এভাবে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতে তথা বৈদিক যুগে জ্ঞানচর্চা করা হতো।

৪.২.২. বৌদ্ধযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা

বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে সাদৃশ্য থাকলেও বৌদ্ধযুগে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রচার-প্রসার লাভপূর্বক ভারতীয় সমাজজীবন ও শিক্ষা জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করে। নিম্নে পালি সাহিত্যের তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক এ যুগে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

প্রথমত, বৌদ্ধযুগে প্রবর্তিত শিক্ষার দ্বার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ সকলের জন্য ছিল উন্মুক্ত। ফলে সাধারণ মানুষও ব্রাহ্মণ্য সমাজে গণ্ডীভূত থাকা শিক্ষার অধিকার লাভ করে। এভাবে বৌদ্ধযুগে শিক্ষাব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপিত হয়। মাতঙ্গজাতক (IV., pp. 376-389) সাক্ষ্য দেয় যে, মাতঙ্গ নামক এক চণ্ডাল জ্ঞানার্জন পূর্বক মাতঙ্গপণ্ডিত নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, এ যুগে শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা তথা প্রাকৃত ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে বিশাল জনগোষ্ঠী মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ লাভ করে এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২৪]

তৃতীয়ত, এ যুগে শিক্ষার মূলকেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহার। ফলে নগরকেন্দ্রিক শিক্ষা এ যুগে রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধ বিহারে সমষ্টিগতভাবে জীবনযাপন করায় শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার, ব্যক্তিত্ব গঠনের এবং সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করতেন।

চতুর্থত, এ যুগে প্রবর্তিত শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাধারণ জনগণ। মানুষের দুঃখনিবৃত্তি দিক নির্দেশনা প্রদান করায় এ শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ জনগণকে সহজেই আকৃষ্ট করে দ্রুত প্রসার লাভ করতে সক্ষম হয়।[২৫]

পঞ্চমত, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় উপাধ্যায় এবং আচার্য এ দু'জন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। উপাধ্যায় শিক্ষার্থীকে বিদ্যা বিতরণ করতেন। অপরদিকে, আচার্য বিনয়-ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিনয়পিটক[২৬] সাক্ষ্য দেয় যে, দক্ষ ও অভিজ্ঞ উপাধ্যায় ও আচার্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে যাতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করতেন। উপাধ্যায় এবং আচার্য আমৃত্যু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়রত থাকতেন। তাঁরা আজীবন কৌমার্য অবলম্বন করতেন বিধায় শিক্ষাদানে কোনো রকম বিঘ্ন সৃষ্টি হতো না। তাছাড়া, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষা দান করতেন বিধায় শিক্ষার্থীর গুণাগুণ লক্ষ্য করে শিক্ষাদান সম্ভব হতো।

ষষ্ঠত, গুরু শিষ্য ছাড়াও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্ঘের সদস্যগণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাঁরা শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশসাধনে দায়িত্ব পালন করতেন।

সপ্তমত, সঙ্ঘনায়কগণ সাধারণ জনগণের উপযোগী উদার পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়ণপূর্বক শিক্ষা দান করতেন। তজ্জন্য বর্হিবিভাগীয় বিদ্যায়তন এবং অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘ বিদ্যায়তন প্রবর্তন করা হয়।[২৭]

বর্হিবিভাগীয় বিদ্যায়তন ছিল সঙ্ঘবর্হিভূত সাধারণ জনগণের জন্য। এরা লৌকিক বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতেন। অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘ বিদ্যায়তনে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং শ্রমণগণ বিদ্যাশিক্ষা করতেন।

অষ্টমত, সাধারণ জনগণের আর্থিক অনুদানে বৌদ্ধ বিহারগুলো নির্মিত হওয়ায় বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণ বিদ্যায়তন সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় শ্রেণী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

নবমত, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় বৌদ্ধধর্ম-দর্শন শিক্ষার পাশাপাশি বেদ, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, ভাষা প্রভৃতি জীবন ঘনিষ্ট সাধারণ ও লৌকিক বিষয়েও শিক্ষা দান করা হতো।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, নারীশিক্ষা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার আর এক অভিনব সূচনা। ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ফলে নারীশিক্ষার হার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে নারীশিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। এসময় নারীরা জ্ঞানের নানা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে সুনাম অর্জন করতেও সক্ষম হন। পালি সাহিত্যে মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্না, ধর্মকথিকা, বিনয়ধরা, স্মৃতিসম্পন্না, মহাবাগ্মি, সুবক্তা প্রভৃতি নানা বিশেষণ মণ্ডিতা নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। থেরীগাথার অট্ঠকথা[২৮] সাক্ষ্য দেয় যে, ভদ্দা কুণ্ডলকেসা নিগণ্ঠদের ধর্মমত অনুসারী ছিলেন, পরে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট হতে জ্ঞানলাভ করেন। তর্কশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তর্কে বুদ্ধশিষ্য সারীপুত্র ব্যতীত অন্যকেহ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি আদর্শ শিক্ষিকাও ছিলেন। [২৯] মজ্ঝিমনিকায়[৩০] এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে[৩১] উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের সময় রাজগৃহ নগরের ধর্মদিন্না ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং দার্শনিক জ্ঞানসম্পন্ন। এ কারণে তাঁর সুখ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ সেসময় স্মৃতিচারণ ছিল শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা জ্ঞানাহরণের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতো। থেরীগাথায়[৩২] নন্দত্তরা নামক এক ভিক্ষুর উল্লেখ আছে, যিনি শিল্প-বিজ্ঞান ও বাগ্মিতায় অসীম পারদর্শী ছিলেন। পরমত্থদীপনী নামক অট্ঠকথা[৩৩] হতে জানা যায়, ভিক্ষুণী ক্ষেমা ছিলেন অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সুবক্তা। তিনি ভিক্ষুণী বিনয়েও পারদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের জটিলবিষয়সমূহ তিনি অতি সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সংযুক্তনিকায়ে[৩৪] উল্লেখ আছে যে, তিনি রাজা প্রসেনজিতকে পঞ্চস্কন্ধ বিষয়ে ধর্মোপদেশ দান করে বিমুগ্ধ করেছিলেন।

জাতকে বহু শিক্ষিত নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভদ্দসালজাতকে (IV., p. 153-155) উল্লেখ আছে, কুমার বিড়ুঢ়ব কপিলাবস্তু যাবার আগেই বাসবক্ষত্রিয় মহানামকে পত্র দ্বারা জানিয়ে দেন, তাঁর বিবাহ রহস্য যেন কুমার বিড়ুঢ়ব জানতে না পারে। অসাতরূপজাতক (I., p. 409-411) পাঠে জানা যায়, কোসলরাজ কর্তৃক বারাণসীরাজ্য করতলগত হওয়ায় বারাণসীর রাজকুমার কোসলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেন। এসময় তাঁর মাতা পত্র দ্বারা তাঁকে সাবধান করেন এবং উপদেশ স্বরূপ বলেন যুদ্ধের পরিবর্তে নগর অবরোধ করাই কুমারের জন্য শ্রেয়। আদিত্তজাতকে (III., p. 470-474) উল্লেখ আছে, সৌবীর রাজ্যের রাজা ভরতের সমুদ্র বিজয়া নামক মহিষী

ছিলেন সুপণ্ডিত এবং জ্ঞানবতী। তিনি স্বামীকে সদুপদেশ দিয়ে সর্বদা সাহায্য করতেন। মহানারদকস্সপজাতকে (VI., pp. 220-255) উল্লেখ আছে যে, রুজা নাম্নী এক বিদুষী শাস্ত্রজ্ঞ রাজকন্যা ছিলেন, যিনি যুক্তিতর্কে পিতার কুসংস্কার ও মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস অপনোদন করেন। মহাউম্মগ্গজাতকে (VI., pp. 330-47) অমরাদেবীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি স্বলিখিত প্রমাণাদি উপস্থাপনপূর্বক চারজন সভাপণ্ডিতের চালাকী অপনোদন করেছিলেন। চূল্লকালিঙ্গজাতকে (III., p. 3-8) বিভিন্ন মতবাদে পারদর্শী বৈশালীর বহু বিদুষী রমণীর উল্লেখ আছে, যাঁরা মাতা-পিতার নিকট নানা মতবাদে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। উক্ত জাতক পাঠে আরো জানা যায়, বৈশালীর সেইসব বিদুষীরা পণ করতেন, তর্কে কোনো গৃহীর নিকট পরাস্ত হলে তাঁর পত্নী হবেন, আর পরিব্রাজকের নিকট পরাস্ত হলে তাঁর শিষ্যা হবেন। জানা যায় যে, প্রাচীনকালে পুরুষের ন্যায় নারীরাও চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যার অন্তর্গত বহু বিষয়ে শিক্ষিত হতেন।[৩৫] যেসব বিষয়ে নারী অধিক শিক্ষা অর্জন করতেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ[৩৬] উল্লেখযোগ্য :

সংগীতশাস্ত্র : নৃত্য-গীত-বাদ্য

নাট্যশাস্ত্র : অভিনয়

সাজসজ্জা : পুষ্পসজ্জা, মালাগ্রন্থন, উদ্যান রচনা, সৌন্দর্য বর্ধক অঙ্গরাগাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, সুচীশিল্প, গৃহসজ্জা—অলংকরণ, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প প্রভৃতি

কৌশল বিষয়ক : ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা, ভোজবিদ্যা, প্রহেলিকাময় বাক্য বা ধাঁধাঁ

শস্ত্রবিষয়ক : তলোয়ার, সড়কী, বর্শা, ধনু প্রভৃতি চালনা

অঙ্গবিদ্যা : শরীরচর্চা, স্বাস্থ্য বিষয়ক ভেষজ জ্ঞান, কামসূত্র বা অঙ্গ বিষয়ক শিক্ষা

প্রাণী-শিক্ষা প্রণালী : মেষ, তিমির পক্ষী ও মোরগকে লড়াইয়ে প্রস্তুত করা, এবং ময়না, তোতা প্রভৃতিকে বুলি শেখানো প্রভৃতি শিক্ষা প্রণালী

বিদ্যা বিষয়ক : সাংকেতিক লিখন প্রণালী, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি

পালি সাহিত্য পাঠে ধারণা জন্মে যে, গৃহস্থ কন্যা অপেক্ষা বারবণিতাগণই অধিক সংগীত শিক্ষা করতেন। কারণ প্রাচীনকালে উচ্চশ্রেণীর বারাঙ্গনারূপে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য শুধু রূপ-যৌবনই নয়, নানাবিধ কলাবিদ্যাতেও পারদর্শিতা অর্জন করতে হতো। বিনয়পিটক[৩৭] গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, রাজগৃহের শালবতী নামক এক বারবণিতা ছিলেন, যিনি নাচ, গান এবং বংশীবাদনে পারদর্শী ছিলেন। থেরীগাথা গ্রন্থটি বিভিন্ন বিদুষী নারীর রচনার সংকলন। গ্রন্থটি সমীক্ষা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের সময়কালে নারীরা রীতিমতো শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি সম্পন্না ছিলেন। তাঁদের রচিত গাথাগুলোতে যেসব গুরুগম্ভীর অর্থবোধক শব্দ, উপমা এবং রূপকের উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে প্রতীতি জন্মে যে, তাঁরা বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের পাশাপাশি লৌকিক বিষয়েও প্রাজ্ঞ ছিলেন। শ্রী বিমলাচরণ লাহা এবং বীণা চট্টোপাধ্যায় তাঁদের রচিত গ্রন্থে বহু শিক্ষিত রমণীর উল্লেখ

করেছেন।[৩৮] বুদ্ধ বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকে 'উত্তম মঙ্গল' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৩৯] এতে বোঝা যায়, বৌদ্ধযুগে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি লৌকিক বিষয়েও জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা হতো।

বৌদ্ধযুগে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। তক্ষশিলা ছিল গান্ধারের রাজধানী। বৈদিকযুগ হতেই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি ছিল।[৪০] এটি প্রথমে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাদির কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধশিক্ষা স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হলে তক্ষশিলা বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্যবহারিক শিক্ষাদান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এখানে ষোড়শবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তি হলে ভর্তি হওয়া যেত এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে এখানে বিদ্যা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা আগমন করতো।[৪১] প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের[৪২] মতে, মূলত তক্ষশিলায় পাঠ আরম্ভ নয়, পাঠ সমাপ্তির জন্যই যাওয়া হতো। তিলমুট্‌ঠিজাতকে (II., pp. 278-9) উচ্চশিক্ষার স্থান হিসেবে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি বর্ণিত আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অভিমত প্রণিধানযোগ্য:

> প্রাচীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় যে উন্নত মান স্থাপন করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। চাণক্য ও পাণিনির গ্রন্থসমূহ বিচারবুদ্ধি-প্রসূত শিক্ষা-পদ্ধতির পরিণত ফল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কৃতবিদ্য ছাত্রদের উল্লেখ না করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবক, পাণিনি ও কৌটিল্য, তক্ষশিলার এই তিনজন ছাত্র যে কোন দেশের, যে কোন যুগের শ্রদ্ধার পাত্র।[৪৩]

পরবর্তীকালে তক্ষশিলার আদলে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নালন্দা, বিক্রমশিলা, সোমপুরী, শালবন, বলভী, সারনাথ প্রভৃতি বিদ্যায়তন গড়ে ওঠে। দেশ-বিদেশেও এসব বিদ্যায়তনের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশ-বিদেশের বিদ্যোৎসাহী শিক্ষার্থীগণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা অর্জনের জন্য আগমন করতেন। চৈনিক ভ্রমণবৃত্তান্ত হতে জানা যায় যে, চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ইৎ-সিংসহ বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত উপর্যুক্ত বিদ্যায়ত সমূহে শিক্ষালাভ করেছিলেন।[৪৪]

৫. প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির মাপকাঠি। সংস্কৃতির মর্মবাণী হলো জীবিকার প্রয়াস চালান। মানুষ নানা পেশা ও বিষয় অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা চালায়। নাচ, গান, বাজনা, ক্রীড়া-কৌতুক, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি এদের অন্তর্গত।[৪৫] সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নানাভাবে মানুষের মনে প্রেরণা যোগায়। ফলে যাঁরা সংস্কৃতি চর্চা করেন কেবল তাঁদের মননশীলতা এবং রুচিবোধ সমৃদ্ধ হয় তা নয়, যাঁরা উপভোগ করেন তাঁদেরও মননশীলতার উন্নতি ঘটায়। পালি সাহিত্যে অসংখ্য সংস্কৃতি প্রেমিক সংগীতজ্ঞ, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নট-নটী, বাদক, ক্রীড়াবিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে ধারণা করা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। নিচে প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হলো :

৫.১. আমোদ-প্রমোদ ও উৎসবাদি

ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানারকম উৎসবের প্রচলন ছিল। জাতক পাঠে জানা যায়, বার-তিথি-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে উৎসবসমূহ পালিত হতো এবং ভেরীবাজিয়ে উৎসবের সময় ঘোষণা করা হতো। দুম্মেধজাতক (I., p. 259) মতে, উৎসবের সময় গ্রাম-নগর সুন্দরভাবে সাজানো হতো। সুসীমজাতকে (II., pp. 45-50) বর্ণিত আছে যে, উৎসবের সময় জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হতো এবং শোভাযাত্রায় নানাভাবে সজ্জিত করে হাতি ব্যবহার করা হতো। উম্মাদন্তীজাতক (V., p. 210-227) মতে সর্বপেক্ষা প্রধান উৎসব পালিত হতো কার্তিক মাসে, বিশেষত কার্তিক পূর্ণিমায়, যা কার্ত্তিকোৎসব নামে পরিচিত ছিল। বট্টকজাতক (I., pp. 432-425) সাক্ষ্য দেয় যে, কাত্তিকোৎসব সাতদিন বা সপ্তাহকাল স্থায়ী হতো। এ ছাড়াও পালি সাহিত্যে আরো নানারকম উৎসব এবং মেলার আয়োজন করা হতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিত্তিরজাতক (III., p. 538), বিনয়পিটক[৪৬] এবং ধম্মপদট্ঠকথায়[৪৭] উল্লেখ আছে যে, জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে রাজগৃহ নগরের এক পর্বতের উপর প্রতিবছর 'গিরগ্গসমজ্জ' নামক এক প্রসিদ্ধ মেলার আয়োজন করা হতো। জাতক এবং দীর্ঘনিকায়[৪৮] গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, এসব উৎসবে নানা পেশার শিল্পী শিল্প দক্ষতা প্রদর্শন করে জনসাধারণকে আনন্দ দান করতেন এবং অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিশেষত নাচ-গান-বাজনা, যাদু, কৌতুক, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, নানারকম কলাকৌশল বা খেলা, বিভিন্ন প্রাণীর লড়াই প্রভৃতি ছিল উৎসবের মূল আকর্ষণ। ভেরীবাদজাতক (I., p. 283-284), গুত্তিলজাতক (II., pp. 248-257), পদকুসলমানবজাতকে (III., pp. 502-513) উৎসবের সময় নাচ, গান এবং বাদ্য পরিবেশন করে জনসাধারণ আনন্দ দান পূর্বক অর্থ উপার্জনের কথা বর্ণিত আছে। চিত্তসম্ভূতজাতক (IV., pp. 390-400) পাঠে জানা যায় যে, চণ্ডালেরা নগরের প্রবেশপথে বাঁশ-নৃত্য প্রদর্শন করে অর্থ উপার্জন করত। নারী-পুরুষের একত্রে জাঁকজমকপূর্ণ গালিচার উপর আকর্ষণীয় নৃত্য-গীত পরিবেশনের কথা বর্ণিত আছে চূল্লবর্গ গ্রন্থে।[৪৯] সেকালে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে গায়িকা এবং নৃত্যশিল্পী থাকত। তবে পেশাধারী শিল্পীরা নানাস্থানে শিল্প-কুশলতা প্রদর্শন করে অর্থ উপার্জন করতেন। নচ্চজাতকে (I., p. 207) নাচ গান পরিবেশনের সময় বীণা, ঢোল (আতত, বিতত), করতাল, খোল (সুপিরা) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধের সময়কালে আম্রপালি এবং সালবতী নাচ-গান-বাজনায় সুনিপুণা ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের রূপ-যৌবন এবং শিল্প-নৈপুণ্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের বহু রাজা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গলাভের আশায় ছুটে আসতেন। তন্মধ্যে মগধরাজ বিম্বিসার ছিলেন অন্যতম।[৫০] সালকজাতক (II., pp. 267-268) এবং অহিগুণ্ডিকজাতকে (III., pp. 198-199) উল্লেখ আছে যে, উৎসবের সময় বিভিন্ন জনপদে সাপুড়েরা সাপ ও বানর নিয়ে নানা কলাকৌশল প্রদর্শনপূর্বক দর্শকদের আনন্দ দান করে অর্থ উপার্জন করতেন। সাপ ও বানর নিয়ে কলাকৌশল প্রদর্শনপূর্বক অর্থ উপার্জনের বিষয়টি ভারতীয় উপমহাদেশে বর্তমানেও দেখা যায়। পুপ্ফরত্তজাতক (I., pp. 499-500) এবং গঙ্গমালজাতকে

(III, p. 444-453) উল্লেখ আছে যে, ধনী-গরীব নির্বিশেষে বৈচিত্র ও সুরঞ্জিত পোষাক এবং সুগন্ধি মাল্যদ্রব্য পরিধান করে উৎসবে যোগদান করতেন। গঙ্গামালজাতকে উল্লেখ আছে, এক মজুর উৎসবে গিয়ে সঞ্চিত অর্থের এক অংশ দ্বারা মাল্য, এক অংশ দ্বারা গন্ধ এবং এক অংশ দ্বারা সুরা ক্রয় করে। সুরাপান জাতকে (I., p. 361-362) নানা স্থানে পানাগার থাকার কথা এবং এসব পানাগারে সুরাপায়ীরা গিয়ে পিপাসা নিবৃত করত বলে উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায়, প্রাচীনকালে উৎসবের সময় সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য পান করার রীতিও প্রচলিত ছিল।

৫.২. কলা-কৌশল ও ভোজবাজি প্রদর্শন

জাতক এবং বিভিন্ন পালি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উৎসব ছাড়াও নানা স্থানে নানা পেশার লোক এবং ভবঘুরেরা ভোজবাজি এবং কলাকৌশল প্রদর্শন করে আনন্দ দান পূর্বক অর্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করত। দসন্নকজাতকে (III., pp. 337-341) নানা রকম কলা-কৌশল প্রদর্শনের কথা বর্ণিত আছে। এ জাতক এক কৌশল প্রদর্শনকারী বারাণসীর রাজপ্রাঙ্গণে লোকের সমাবেশে তেত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং সুতীক্ষ্ণ তরবারী গিলে লোক মনে বিস্ময় সৃষ্টি এবং আনন্দ উদ্রেক করার কথা উল্লেখ আছে। দুব্বচজাতক (I., pp. 430-431) পাঠে জানা যায় যে, বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসীতে লঙ্ঘন-নর্ত্তককুলে জন্মগ্রহণ করে এক আচার্যের নিকট শক্তিলঙ্ঘন-বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং আচার্যের সঙ্গে নানা স্থানে শক্তিলঙ্ঘনক্রীড়া প্রদর্শনপূর্বক অর্থ উপার্জনের করতেন। তিত্তিরজাতকে (III., pp. 537-543) উল্লেখ আছে, ভবঘুরেরা নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে কখনো পণ্যবিক্রয়, কখনো দণ্ডযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং পশুবধ করে জীবিকা নির্বাহ করত। ভদ্রঘটজাতকে (II., pp. 431-432) নটেরা ধনাঢ্যব্যক্তির সন্তানদের শোষণ করে জীবিকানির্বাহ করত বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এ জাতকে বর্ণিত আছে, বোধিসত্ত্বের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মদ্যাসক্ত হয়ে লঙ্ঘননট, ধাবক, গায়ক, নট প্রভৃতিকে সহস্র সহস্র মুদ্রা দিত এবং উন্মত্তের ন্যায় কোথায় গীত, কোথায় নৃত্য, কোথায় বাদ্য হতো সেসব স্থানে ঘুরে বেড়াত এবং এভাবে সে চল্লিশ কোটি মুদ্রা এবং অন্যান্য সম্পত্তি বিনষ্ট করে। তবে উচ্ছিট্‌ঠভত্তজাতক (II., pp. 167-169) সাক্ষ্য দেয় যে, নটেরা এরূপ করেও সম্পদশালী হতে পারত না এবং কখনো কখনো ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করত। জাতকে নাট্যাভিনয়ের কথা তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় নাা, তবে সুরুচিজাতকে (IV., pp. 314-325) দৃশ্যকাব্যাভিনয়ের মতো নানারকম নৃত্য, শারীরিক কসরত এবং হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে দর্শকদের চিত্তরঞ্জন পূর্বক অর্থ উপার্জনের বিষয় উল্লেখ আছে। জাতকে যে সকল নটের উল্লেখ আছে, তারা নৃত্য-গীতের পাশাপাশি ইন্দ্রজালবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সুরুচিজাতকে (IV., pp. 314-325) ভণ্ডুকর্ণ এবং পণ্ডুকর্ণ নামক দু'জন নটের অতি বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার বর্ণনা আছে। এ জাতকে বর্ণিত আছে যে, ভণ্ডুকর্ণ মুহূর্তের মধ্যে একটা বিশাল আম্রবৃক্ষ সৃষ্টি করে তার শাখা লক্ষ্য করে একটা সূত্রপিণ্ড উর্ধ্বে নিক্ষেপ করত। সূত্রের একপ্রান্ত ঐ শাখায় সংলগ্ন হলে সে তা ধারণ করে উপরে উঠত এবং

তখন যক্ষেরা তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে মাটিতে ফেলে দিত। অন্যান্য নটেরা তার খণ্ড-বিখণ্ড দেহাংশ একস্থানে জড়ো করে তাতে জল সিঞ্চন করলে ভণ্ডুকর্ণ তৎক্ষণাৎ পুষ্প আচ্ছাদিত হয়ে পুণর্বার আবির্ভূত হয়ে নৃত্য করত। তৎপর পুণ্ডকর্ণ জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের আগুনে ঝাপ দিত এবং আগুন নিঃশেষ হলে অন্যান্য নটেরা ছাইভস্মের উপর জল সিঞ্চন করত। তখন পুন্ডুকর্ণ পুষ্পাবরণে ভূষিত হয়ে পুণর্বার আবির্ভূত হয়ে নৃত্য করত। এতে বোঝা যায়, নটেরা ভোজভাজিতে বেশ পারদর্শী ছিল। ধম্মপদট্ঠকথায়[৫১] উগ্গসেন নামক রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠিপুত্রের উল্লেখ আছে, যিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী এক নারীর প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করেন এবং বিবাহের পর যাদুবিদ্যাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি সে পেশায় পারদর্শিতা অর্জনপূর্বক রাজগৃহ নগরীর এক বিশাল জনসমাবেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন।

৫.৩. খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতা

প্রাচীনকালে প্রতিযোগিতা ছিল বিনোদনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে রাজা, রানী, রাজ পরিবারের সদস্য এবং আমত্যগণ অংশগ্রহণ করতেন। সাধারণ জনগণও ব্যাপক উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করত। সংগীত, বিতর্ক এবং খেলাধূলা ছিল বিনোদনের চুম্বক অংশ। গুত্তিলজাতকে (II., pp. 248-257) এক মনোজ্ঞ সংগীত প্রতিযোগিতার বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ আছে যে, বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে এক গার্ন্ধব্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় গুত্তিলকুমার। তিনি যথাকালে গার্ন্ধব্যবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং তাঁর সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বীণার সুরের মুর্ছনায় বিমুগ্ধ হয়ে বারাণসীরাজ তাঁকে প্রাসাদে শিল্পী হিসেবে নিয়োগদান করেন। মূসিল নামক এক বীণাবাদক তাঁর নিকট সংগীত শিক্ষা করে পারদর্শিতা অর্জন করেন। কিন্তু মূসিল ছিলেন লোভী, কুবুদ্ধি ও হীনমানসিকতা সম্পন্ন। ফলে গুত্তিল বয়োবৃদ্ধ হলে তিনি বারাণসীর রাজপ্রাসাদে শিল্পী হিসেবে কর্মলাভের জন্য গুরু গুত্তিলকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অনন্যোপায় হয়ে গুরু গুত্তিল বিষয়টি রাজাকে জ্ঞাত করলে রাজা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে তাঁর সংগীত নিপুণতা নিরুপণ করতে ইচ্ছুক হন। ফলে বারাণসীর রাজা রাজপ্রাসাদের তোরণপার্শ্বে গুরু-শিষ্যের এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি রাজকর্মচারীর মাধ্যমে ভেরীবাজিয়ে প্রতিযোগিতার কথা প্রচার করান। প্রতিযোগিতার জন্য মণ্ডপ নির্মাণ করান। রাজপরিবারের সদস্য এবং অমাত্যসহ রাজা এবং নানা শ্রেণীপেশার নর-নারী মনোরমবেশে সজ্জিত হয়ে প্রতিযোগিতা উপভোগের জন্য উপস্থিত হন। প্রতিযোগিতায় গুরু গুত্তিলের নিকট শিষ্য মূসিল পরাজিত হন। চূল্লকালিঙ্গজাতক (III., p. 1) পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়কালে দার্শনিক এবং শিক্ষিত সমাজে বিতর্ক খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ জাতক সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সময়কালে বৈশালীর লিচ্ছবীরা বিতর্ক খুবই ভালবাসতেন। একদা লিচ্ছবীরাজ পঞ্চশত মতবাদে ব্যুৎপন্ন এক নিগ্রন্থ এবং নিগ্রন্থীর মধ্যে বিতর্ক আয়োজন করেন। বিচারে উভয়ে সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। ফলে উভয়ের গর্ভজাত সন্তান মহাপণ্ডিত

হবে—এরূপ ভেবে রাজা উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান। কালক্রমে তাঁদের চারকন্যা এবং এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেকে মাতার নিকট পাঁচশত এবং পিতার নিকট পাঁচশত মোট সহস্র মতবাদ শিক্ষা করে মহাবাগ্মীরূপে খ্যাত হন। কিন্তু শ্রাবস্তীতে সহস্র সহস্র লোকের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চার বোন বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্রের নিকট পরাস্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিত হন। অনুরূপ এক বিতর্কে বুদ্ধ 'নিগণ্ঠ সচ্চক' নামক এক পরিব্রাজককে পরাস্ত করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে লিচ্ছবী কুমারগণ উপস্থিত থেকে উক্ত বিতর্ক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।[৫২]

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রাণীর লড়াই, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় ছিল বলে জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘটজাতকে (III., pp. 168-170) কুস্তি প্রতিযোগিতার বর্ণনা রয়েছে। এ জাতকে বর্ণিত আছে যে, একদা এক রাজা এক কুস্তিখেলার আয়োজন করেন। এক সপ্তাহপূর্ব থেকে তিনি সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন এবং ভেরীবাজিয়ে সকলকে কুস্তি খেলার সংবাদ জ্ঞাত করান। রাজপ্রাসাদের সামনে বৃত্তাকারে প্রাচীর নির্মাণপূর্বক খেলার স্থান প্রস্তুত করান। নির্ধারিত দিনে 'চনুর' এবং 'মুত্তিকা' নামক দু'জন কুস্তিগীরের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীকে হর্ষধ্বণি প্রদান করে উৎসাহ প্রদান করা হতো। মজ্ঝিমনিকায়[৫৩] গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পাশাখেলা প্রচলিত ছিল এবং রাজকন্যাগণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যাগণ 'কুঞ্জুক' (বল) এবং 'ভিটা' (হকিজাতীয়) খেলা খেলতে ভালবাসতেন। বিদূরপণ্ডিতজাতকে (VI., p. 281) কাষ্ঠফলকে এরূপ খেলা হতো বলে বর্ণিত আছে।

অণ্ডভূতজাতকে (I., pp. 289-295), লিত্তজাতক (I., pp. 379-380) এবং বিদূরপণ্ডিতজাতকে (VI., pp. 255-328) প্রভৃতিতে অক্ষক্রীড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। অণ্ডভূতজাতকে (I., pp. 289-295) উল্লেখ আছে যে, বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। অতঃপর রাজ্যলাভ করে যথাধর্ম প্রজাপালন করতে থাকেন। তিনি তাঁর পুরোহিতের সঙ্গে পণ বাজি রেখে দ্যূতক্রীড়া করতেন এবং রজতফলকের উপর সুবর্ণ পাশক ফেলার সময় জয়ের আশায় বিশেষ মন্ত্র আবৃত্তি করতেন। ফলে প্রতিবাজিতেই রাজা জয়লাভ করতেন। এতে পুরোহিত কপর্দ্দক শূন্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাধারণ লোকেরা বিশ্বাস করত যে, মন্ত্রবিশেষের দ্বারা খেলায় জয়লাভ সম্ভব হতো। রুরুজাতক (IV., p. 255-262) এবং বিদূরপণ্ডিতজাতকে (VI., pp. 255-328) উল্লেখ আছে, সাধারণ লোকেরাও পণ রেখে বাজি ধরত এবং পণে হেরে সময়ে সময়ে সর্বস্বান্ত হতো। দীর্ঘনিকায়[৫৪] গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হাতি, ঘোড়া, মহিষ, বৃষ, অজ, মেষ, মোরগ প্রভৃতি পশু-পাখীর লড়াই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বুদ্ধ প্রাণীদের প্রতি নির্দয় আচরণ মন্দকার্য হিসেবে অভিহিত করায় বুদ্ধযুগে এসব অনুষ্ঠান হ্রাস পেতে থাকে।

৫.৪. খাদ্যাভ্যাস

সম্ভবজাতক (II., pp. 43-45) পাঠে জানা যায় যে, যাগু এবং ভাত ছিল প্রদান খাদ্য। তবে উৎসবের সময় পায়েস তৈরী করা হতো এবং পায়েসে প্রচুর ঘৃত, মধু ও শর্করা মিশ্রিত করার রীতি ছিল। ইল্লীসজাতক (I., pp. 349-354) এবং সুধাভোজনজাতক (V., p. 383) মতে, তণ্ডুল (চাউল), ঘৃত এবং গুড় দিয়ে পিষ্ঠক প্রস্তুত করা হতো। তেলোবাদজাতক (II., p. 262), নিগ্রোধজাতক (IV., pp. 37-41), মুণিকজাতক (I., pp. 195-197), শালূকজাতক (II., pp. 419-420), তুণ্ডিলজাতক (III., pp. 286-292), মহাকপিজাতক (III., pp. 370-375), মহাবোধিজাতক (V., pp. 227-246), রোমকজাতক (II., pp. 382-384) প্রভৃতিতে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে মাংস খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল তা উল্লেখ পাওয়া যায়। মুণিকজাতক (I., pp. 195-197) এবং শালূকজাতকে (II., pp. 419-420) বর্ণিত আছে যে, লোকেরা মাংসের জন্য শূকর পালন করত। তুণ্ডিলজাতকে (III., pp. 286-292) গ্রাম্য শূকরের মাংস খাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। মুণিকজাতক মতে, 'কুটুম্বিক' তথা গ্রাম্য ভূস্বামী শূকর পালন করতেন। এতে বোঝা যায়, শূকর মাংস অন্ত্যজশ্রেণী এবং অভিজাতশ্রেণী উভয়ে ভক্ষণ করত। মহাবোধিজাতক (V., pp. 227-246) হতে মর্কটমাংস ভোজনের কথা জানা যায়। মহাকপিজাতকে (III., pp. 370-375) উল্লেখ আছে যে, একদা বারাণসীরাজের আম্রের সঙ্গে বানরমাংস ভক্ষণের ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সব্বদাঠজাতকে (II., pp. 243-245) উল্লেখ আছে যে, লোকে বানরমাংসকে অখাদ্য বলে মনে করত। রোমকজাতকে (II., pp. 382-384) পারাবত তথা কপোতের (ঘুঘুর) মাংস ভক্ষণের কথা বর্ণিত আছে। নাঙ্গুট্ঠজাতক (I., p. 494) হতে জানা যায় যে, বারাণসীর ব্যাধরা এক তপস্বীর গরু হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করেছিল। গহপতিজাতকে (II., pp. 134-136) উল্লেখ আছে যে, একদা কাশীরাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেসময় গ্রামবাসীরা পরে মূল্য পরিশোধ করবে এরূপ শর্তে গ্রামভোজক হতে গরু ধার নিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করে জীবনধারণ করে। মহাসূতসোমজাতকে (V., pp. 457-511) এক নরমাংসাশী রাজার কথা উল্লেখ রয়েছে। সসপণ্ডিতজাতক (III., pp. 51-56) এবং মচ্ছজাতক (I., pp. 210-212) পাঠে মৎস্য ভক্ষণের কথা জানা যায়। জাতকে ফলমূলের উল্লেখ থাকলেও নির্দিষ্টভাবে ফলের নাম খুবই কম উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে আম্রফলের উল্লেখ অধিক পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায়, প্রাচীনকালে ফলমূল খাওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল।

৫.৫. সংস্কার ও বিশ্বাস

জাতক পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা রকম সংস্কার ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এক প্রকার লোক ছিল যারা বিভিন্ন লক্ষণ বা নিমিত্ত দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করতেন, এঁরা 'নিমিত্ত-পাঠক' নামে খ্যাত ছিলেন। আবার, এক শ্রেণীর লোক ছিল যাঁরা অঙ্গলক্ষণ দেখে ভবিষ্যতের শুভাশুভ গণনা করতেন।[৫৫] বুদ্ধ প্রচলিত এরূপ বহু সংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। মহামঙ্গলজাতকে (IV., pp. 74-78) উল্লেখ আছে যে, সকালে ঘুম থেকে ওঠে সাদা রংঙের বৃষ, রোহিত মৎস্য, নব সর্পিঃ, নতুন বস্ত্র, পায়েস এবং গর্ভিবতী স্ত্রী দেখলে শুভফল প্রাপ্তি ঘটে।

চণ্ডালের মুখ দর্শনে অমঙ্গল সূচিত হয়—এরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল বলে মাতঙ্গজাতক (IV., pp. 375-389) সাক্ষ্য দেয়। মঙ্গলজাতকে (I., p. 373) মুষিক-দষ্ট বস্ত্র পরিধান করলে বংশ নির্বংশ হয়ে যায়—এরূপ বিশ্বাসের কথা উক্ত আছে। নক্খত্তজাতকে (I., p. 258) তিথি নক্ষত্রের প্রভাবে মঙ্গল-অমঙ্গল সূচিত হয়—এরূপ বিশ্বাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ জাতকে আরো উল্লেখ আছে, সেসময় তিথি-নক্ষত্র বিচার করে বিবাহের দিন ধার্য করা হতো। তবে মঙ্গলজাতক এবং মহামঙ্গলজাতকে নিমিত্তাদির অসারতা প্রদর্শিত হয়েছে। বুদ্ধ নক্খত্তজাতকে যারা গ্রহ-নক্ষত্রের কারণে শুভাশুভ নির্ধারণ করে তাদেরকে মূর্খ হিসেবে অভিহিত করেছেন। মহাসুপিনজাতক (I., pp. 343-345), লোহকুম্ভিজাতক (III., pp. 45-46) এবং অট্ঠসদ্দজাতকে (III., pp. 428-434) উল্লেখ আছে, সর্বচুতঙ্ক যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে দুঃস্বপন সুস্বপ্নে পরিণত করা যায়—এরূপ বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। লোহকুম্ভিজাতক (III., pp. 45-46) সাক্ষ্য দেয় যে, সর্বচুতঙ্ক যজ্ঞে হস্তি, অশ্ব, বৃষ, মনুষ্য, চটক-পাখী প্রভৃতি চারটি চারটি করে বধ করে আত্মহুতি দেওয়া হতো। খণ্ডহালজাতকে (VI., pp. 131-135) দেখা যায়, রাজার স্বর্গলাভের জন্য এক পুরোহিত সর্বচতুষ্ক যজ্ঞ করেছিলেন, যাতে রাজার পুত্র এবং মহিষীদেরকেও বলিদান করা হয়েছিল। তক্কারিজাতকেও (IV., p. 245-252) স্থাপত্য নির্মাণে বিঘ্ননিবারণ এবং মঙ্গলাচরণের জন্য নরবলি প্রদানের উল্লেখ আছে। এরূপ বিশ্বাস বর্তমানেও প্রচলিত দেখা যায়। এখনো এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, বৃহৎ সেতু নির্মাণের সময় নরবলী আবশ্যক। এখনো 'ছেলেধরা' সন্দেহে বহু নিরাপরাধ লোককে আঘাত ও হত্যা করতে দেখা যায়। জাতক পাঠে আরো জানা যায় যে, লোকেরা মনে করত মন্ত্রবলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। কামনীতজাতকে (II., pp. 212-215) কথিত আছে, লোকেরা বিশ্বাস করত ভুতাবিষ্ট লোক মন্ত্র বলে নিরাময় হতো। বেদব্ভজাতকে (I., pp. 253-256) মন্ত্রবলে আকাশ হতে রত্ন বর্ষিত হতো—এরূপ বিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ আছে। এছাড়া, সব্বদাঠজাতকে (II., pp. 243-245) মন্ত্রবলে পৃথিবী জয় করা, ব্রহাছত্তজাতকে (III., pp. 115-117) মন্ত্রবলে গুপ্তধন লাভ করা যায়—এরূপ সংস্কার ও বিশ্বাসা প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। চূল্লকসেট্ঠিজাতক (I., pp.120-122), অসাতমন্তজাতক (I., pp. 285-288) এবং সন্থাবজাতক (II., pp. 43-44) প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে, লোকে বিশ্বাস করত প্রব্রজ্যা গ্রহণ বা সন্ন্যাস অবলম্বন করলে বংশ পবিত্র হয়, এ কারণে মাতা-পিতা এবং অন্যান্য অভিভাবকরা বালকদের সন্ন্যাস অবলম্বনে বা প্রব্রজ্যা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন। বিসবন্তজাতকে (I., pp. 310-311) বর্ণিত আছে, লোকের মাঝে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মন্ত্রবলে এবং ঔষধ প্রয়োগে বিষধর সাপে কাটা রোগীকে সুস্থ করা যায়, এমনকি মন্ত্রবলে যে সাপে দংশন করে সেই সাপকে এনে বিষ উত্তোলনপূর্বক রোগীকে আরোগ্য করা যায়। কচ্ছপজাতক (II., pp. 79-81) এবং অম্বজাতকে (IV., pp. 200-203) উল্লেখ আছে, লোকেরা মহামারি বা সংক্রামক ব্যাধি অপদেবতার প্রভাব বলে বিশ্বাস করত। জাতক্কয়ে আরো উল্লেখ আছে যে, এরূপ রোগ দেখা দিলে লোকেরা গ্রাম ত্যাগ করে স্থানান্তরে গমন করতেন। জাতকে রোগ নিরাময়ের নানা সংস্কারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। দধিবাহনজাতকে (II., pp. 101-106)

বর্ণিত আছে যে, পাণ্ডুরোগ হলে দধি সেবনের এবং কেহ বিষ পান করলে বমন করিয়ে বমনান্তে ঘৃত, মধু ও শর্করা খাওয়ানোর সংস্কার প্রচলিত ছিল। লিত্তজাতক (I., pp. 379-380) ও শালিত্তকজাতকে (I., pp. 418-420) উল্লেখ আছে, প্রিয়ঙ্গু বা পিপ্পলি মিশ্রিত জল পানপূর্বক বিষপানকারীকে বমন করানো হতো। এসব বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, বর্তমান কালের ন্যায় প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে নানা সংস্কার ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

৬. উপসংহার

উপর্যুক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায়, ঋষিগণই ছিলেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল উৎস। ঋষিদের প্রজ্ঞালোক থেকেই ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রথম রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল এবং ঋষি পরিবারের মাধ্যমেই তা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। জাতীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে একে রক্ষা করার উদ্দেশ্যও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যার্থীকে আত্ম-প্রত্যয় সম্পন্ন, স্বাবলম্বী, সেবা-ব্রত পরায়ণ ও সামাজিক কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা এবং ধর্মকে অভিন্ন দেখার ফলে ভারতীয় শিক্ষায় সর্বদাই আধ্যাত্মিক সম্পদ প্রাধান্য লাভ করে। এছাড়া, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় শিক্ষায় সাধারণত কোনো সংকট সৃষ্টি হতো না। মানসিক উৎকর্ষ, রুচি ও প্রবণতা অনুসারে বিষয় ও বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ পদ্ধতি নির্ধারণ; অবৈতনিক, আবাসিক এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অনন্য উপাদান। শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যেরূপ লক্ষ্য করা যায় তা আর কোনো দেশে লক্ষ্য করা যায় না।

বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করে। বৈদিকযুগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডিভূত, বৌদ্ধযুগে তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সাধারণ মানুষও শিক্ষার অধিকার লাভ করে। এভাবে বৌদ্ধযুগে শিক্ষাব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা তথা প্রাকৃত ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হলে বিশাল জনগোষ্ঠী মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ বিহারগুলো বিদ্যালয়ের ভূমিকা পালন করায় সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘের কল্যাণে গুরুগৃহের পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং বিদ্যায়তন ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ কারণে বৈদিকযুগে গুরুগৃহ ও বৌদ্ধযুগে সঙ্ঘ ছিল জনসাধারণের গর্বের বস্তু। এগুলোই ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছিল এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। সংস্কৃতি সমীক্ষায় দেখা যায়, জাতকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উপাদান বিশেষত আমোদ-প্রমোদ, উৎসব, কলা-কৌশল বা ভোজবাজি প্রদর্শন, খেলাধূলা-প্রতিযোগিতা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার, লোক বিশ্বাস প্রভৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা ভারতীয় উপমহাদেশে বর্তমানেও লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে বলা যায়,

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা এবং সংস্কৃতিই বর্তমান ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি দান করেছিল।

তথ্যনির্দেশ

১ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির (সংকলিত), *পালি-বাংলা অভিধান*, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৬৬৮; শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য আকাদেমী, কলিকাতা ১৯৬৬, পৃ. ৯৩৫-৯৩৬

২ T. W. Rhys Davids, *Pali-English Dictionary*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi 1975, p. 281

৩ Robert Caesear Childers, *A Dictionary of the Pali Language*, Rinsen Book House, Kyoto, pp. 116-167

৪ দশ পারমী : দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান এবং উপেক্ষা প্রভৃতির চর্চা

৫ বর্তমানকালের গবেষকগণ, বিশেষত উইলিয়াম গাইগার, এম. উইন্টারনীট্স, জি. পি. মালালাসেকেরা, ওসকার ভন হিনোবার, কে. আর. নরমান, কানাই লাল হাজরা প্রমুখ আরো দু'টি অংশ যুক্ত করে জাতককে মোট পাঁচটি অংশ বিভক্ত করেন। অপর দুটি অংশ বা বিভাগ হলো: গাথা ও বেয়্যাকরণ; Wilhelm Geiger, *Pali Language and Literature*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi 1991 (3rd ed.), p. 30; M. Winternitz, *History of Indian Literature*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi 1996 (reprint), vol. 2, p. 115-116; G. P. Malalasekera, *Pali Literature of Ceylon*, Karunaratne & Sons Ltd., Kandy 1994, p. 120; Oskar von Hinuber, *A Handbook of Pali Literature*, Walter de Gruyter, New York, 1966, p. 56; K. R. Norman, *A History of Pali Literature*, Wiesbaden 1983, p. 279; Kanai Lal Hazra, *Pali Language and Literature*, D. K. Printworld (P) Ltd., 1994, p. 311; শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক*, ১য় খণ্ড, করুণা প্রকাশণী, কলিকাতা ১৩৮৯ বাংলা (পুনর্মদ্রণ), পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৬ নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃ. ৮

৭ *রবীন্দ্র রচনাবলী*, 'তপোবন' ৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংস্করণ, পৌষ ১৪০৩ (পুনমুদ্রণ), পৃ. ৬৯০

৮ শ্রী শান্তিকুসুম দাশ গুপ্ত, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম* এবং *প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা ১৯৯৮, পৃ. ১৫৫

৯ স্থবির (অনু.), *থেরগাথা*, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩৫, গাথা নং ২৭৫-২৭৮

১০ *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১১ Herman Oldenberg (ed.), *Vinaya Pitaka*, London, P. T. S. 1879-1883, vol. I., p. 269.

১২ *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II, p. 74

১৩ T. W. Rhys Davids, and J. Estin Carpenter, (ed.), *Dīgha Nikāya*, London, P. T. S. 1890, vol. I, p. 157

১৪ *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I, p. 269

১৫ *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৬ S. C. Das, *Hindustan Review*, March 1906, p. 188

১৭ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (অনু.), *মিলিন্দ প্রশ্ন*, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩-৪

১৮ A. P. de Zoysa, *Indian Culture in the days of the Buddha*, Colombo 1955, p. 71

১৯ R. K. Mookerji, *Ancient Indian Education*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1986, p. xxxiii

২০ *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২১ A. S. Altekar, *Education in Ancient India*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1967, p. 94

২২ *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

২৩ *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম* এবং *প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

২৪ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৫।

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৬ *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. I., pp. 258-270

২৭ অনুকুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা*, ফার্মা কে এলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৭; *Education in Ancient India*, op. cit., p. 280

২৮ F. L. Woodward (ed.), *Paramattha-dīpanī Therigathā-Aṭṭhagathā, The Commentary of Dhammapālācariya*, London, P. T. S. 1940, vol. II., op. cit., pp. 87, 145

২৯ I. B. Horner, *Women under in Primitive Buddhism*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1930, p. 247

৩০ V. Trenckner and R. Chalmers (ed.), *Majjhima Nikāya,* London, P. T. S. 1888-1902, vol. I, p. 299

৩১ R. Morris and E. Hardy (ed.), *Aṅguttara Nikāya*, London, P. T. S. London 1885, vol. I, p. 25

৩২ ভিক্ষু শীলভদ্র (অনু.), *থেরীগাথা*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৩৫৭ বাং, গাথা নং: ৯২-৯৬

৩৩ *Paramattha-dīpanī Therigathā-Aṭṭhagathā, The Commentary of Dhammapālācariya*, vol. II., op. cit., pp. 127-128

৩৪ L. Feer, London (ed.), *Saṃyutta-Nikāya*, P. T. S. London, 1898, vol. IV, p. 374.

৩৫ *Education in Ancient India*, op. cit., p. 329

৩৬ বাণী চট্টোপাধ্যায়, *পালি সাহিত্যে নারী*, পুনশ্চ, কলিকাতা ১৯৯০, পৃ. ৬২; শ্রী বিমলাচরণ লাহা, *বৌদ্ধরমণী*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা ১৯৯৯ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৬৬-৭০

৩৭ *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. IV., p. 172

৩৮ *বৌদ্ধরমণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১৩৮; *পালি সাহিত্যে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৬৩

৩৯ H. Smith (ed.), *The Kuddakapāṭha*. P. T. S. London 1915, p. 89

"বহু সচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্খিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৪০ H. C. Roychaudhuri, *Political History of Ancient India*, Motilal Baranasidash, New Delhi, 1973, p. 61

৪১ *Ancient Indian Education*, op. cit., p. 479

৪২ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, *প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস*, পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৭

৪৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৯

৪৪ Thomas Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1996, pp. 140ff

৪৫ করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৬৯

৪৬ *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II, p. 107

৪৭ H. C. Norman (ed.), *The Commentary on the Dhammapada*, P. T. S. London, 1906, vol. I, p. 98

৪৮ *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I., p. 46

৪৯ *Vinaya Pitaka*, op. cit., vol. II., p. 177-189

৫০ *Digha Nikāya*, op. cit., vol. II., p. 147

৫১ *The Commentary on the Dhammapada*, vol. IV, op. cit., pp. 59-65

৫২ চূল্লকালিঙ্গজাতক (Vol. III, p. 1)

৫৩ *Majjhima Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 234

৫৪ *Digha Nikāya*, op. cit., vol. I, p. 46

৫৫ শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক*, ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা ১৩৮৯ বাংলা (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

আবুল বারকাত, *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা ২০১৬, মূল্য: ৫০০ টাকা, পৃষ্ঠা: ২৯৮

মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা থেকে সম্প্রতি আবুল বারকাত-এর *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি* শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি ইতোমধ্যেই যেমন চিন্তাশীল মহলে সাড়া জাগিয়েছে তেমনি একেবারেই সাধারণ, বিদ্যোৎসাহী মানুষ ও শিক্ষার্থী সমাজের দৃষ্টি কেড়েছে।

লেখক নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক আকারে গ্রন্থটি উপস্থাপন করেছেন। ফলে অনুসন্ধানী পাঠক মাত্রই এ থেকে প্রচুর তথ্য পাবেন। এ দেশের কৃষি-ভূমি-জলা বিষয়ে বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ এক ব্যতিক্রমী, মননশীল বিশ্লেষণ রয়েছে গ্রন্থটিতে। শব্দের ব্যাপ্তি, সংগীতময়তা ও গভীরতা এ লেখায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এতে কৃষি-ভূমি-জলা নিয়ে গত ৩০০ বছরের ও সাম্প্রতিক সময়ের নানা প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। উঠে আসে কৃষি-ভূমি ও জলার সাথে আজন্ম সম্পৃক্ত মানুষজনের বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা, সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কোলাজ। বিশ্লেষণে অনাবশ্যক প্রহেলিকা নেই, কিন্তু ব্যঞ্জনা আছে। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে, প্রতি অধ্যায়ে লেখকের ইতিহাস চেতনা আমাদের পাঠক মনকে দীপ্তিময়, উদ্ভাসিত করে তোলে।

এভাবে কখনো প্রজ্ঞার আলোয়, কোথাও বা বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতায় লেখার পাঠ কেবলই বদলে গেছে কৃষি-ভূমি-জলার প্রতি সাধারণ মানুষের কষ্ট, ভালোবাসায় নিচুতলার মানুষের রাজনৈতিক চাহিদার কথা ভেবে। বারকাত গ্রাম-গঞ্জের ব্রাত্যজীবনের রূপকার, সমাজনিষ্ঠ, নির্মোহ আত্মসমালোচক। কৃষি-ভূমি-জলার রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিতর্কাতীত সমগ্রতাকে কত অনায়াসে ছুঁয়ে গেছেন তিনি। তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ হলো নিজের বহুপঠন-অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপ্ত ভূ-খণ্ডে স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের অপরিসীম কৌতূহল জাগায়, জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র প্রসারিত করে, যেক্ষেত্র তথ্য-তত্ত্বের নিরেট বিচার-বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ।

মার্কসীয় চিন্তাধারায় আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকেও লেখক কিভাবে সমাজতন্ত্রের ধারাকে গণতন্ত্র ও মানবতাবোধের সঙ্গে অন্বিত করেছেন তারই একটি পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ আমরা খুঁজে পাই আলোচ্য গ্রন্থে। এর প্রতিটি অধ্যায় তিনি সাজিয়েছেন নানা উপাচারে, অনুষঙ্গে। লেখায় সময় ও প্রেক্ষাপট ধরার চেষ্টা করেছেন। তার অন্তর্লোকের স্বতোজ্জ্বল ভাবনার ছায়া ধরা পড়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনায়। প্রতিটি অধ্যায়ে বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও নিষ্ঠা পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা জাগায়।

গ্রন্থের শুরুতেই লেখক এদেশের কৃষি ও কৃষক আন্দোলনে সম্পৃক্ত পুরোধা ব্যক্তিত্বদের অসামান্য অবদান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন, এর শেষে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিষয়ে পক্ষপাতহীন ইতিহাস রচনার তাগিদ দিয়ে জ্ঞানতত্ত্ব বিনির্মাণের কথা বলেছেন। গ্রন্থের বিভিন্ন দিক তিনি সাজিয়েছেন ভিন্ন এক আঙ্গিকে। প্রথাসিদ্ধ আলোচনার পথ ছেড়ে পদচারণা করেছেন বিচিত্র ভাবনার অলিন্দে।

এ উপমহাদেশে কৃষক আন্দোলন-সংগ্রাম-বিদ্রোহের পথিকৃতদের নামে গ্রন্থটি উৎসর্গীত। ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায়, অবলুপ্ত, অচর্চিত কাহিনী, অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া ঘটনাবলী তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় এনে দাঁড় করিয়েছেন। মনে হয়, অভিজ্ঞ ডুবুরির মতো অতলান্ত থেকে তুলে এনেছেন এক একটি সুপ্তিমুক্তো। আদ্যোপান্ত পড়লে মনে হবে, গ্রন্থের প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি ভাবনা যেন এক 'নিকষিত হেম'।

উৎসর্গ পর্বে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে বাবা তিলকা মাঝির (ওরফে জবার পাহাড়িয়া, ১৭৫০-১৭৮৫) কথা। এরপর একে একে সিধু-কানু মুরমু, কার্ল মার্কস, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, আদিবাসী বিরমা মুণ্ডা, আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, স্বামী শাহাজানন্দ স্বরস্বতী, নাওউকুলু গোগিনেনি রাংগা, আচার্য নরেন্দ্র দেব, আলুরি সিতারাম রাজু, ইন্দুলাল কানাইয়ালাল ইয়াগনিক, অমূল্যনাথ লাহিড়ী, হাজী মো. দানেশ, কানসারি হালদার, অমল সেন, বরুণ রায়, মনি সিং, বারিণ দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ইলামকুলাম মানাককাই শংকরণ, নাম্মুদিরিপাদ, চন্দ্র রাজেস্বর রাও এবং পুচলাপল্লি সুন্দরাইয়া, হরেকৃষ্ণ কোঙার, হরকিষাণ সিং সুরোজিত, ইলামিত্র, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ অগ্রণী ব্যক্তিত্বের নামোল্লেখ লেখকের ইতিহাস-অনুরাগ মনে করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আধুনিক ফরাসি সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সম্প্রতি প্রয়াত কবি ইভ বনফোয়া'র সেই অবিস্মরণীয় উক্তি: If someone asks me what I do, I say, I'am a critic, or a historian—যা বারকাতের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য।

লেখক ছ'টি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত এ গ্রন্থে একে-একে কৃষি-ভূমি-জলার বিভিন্ন বিষয় ছুঁয়ে, লক্ষ্যে ও লেখার অবয়বে পরিসর বাড়িয়েছেন। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার নিয়ে কিছু ভূমিকা, কিছু প্রাক্-কথন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোকে তিনি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাঁর অবিচল বিশ্বাস: উন্নয়ন ও জীবন-সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের এবং পশ্চাৎমুখী আর্থ-সামাজিক প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার। তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার সংশ্লিষ্ট প্রধান বিষয়গুলোর রাজনৈতিক অর্থনীতি: খাস জমি-জলায় দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের অধিকারের প্রশ্ন; চরের জমি, চরের মানুষের প্রান্তিকতা; ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আদিবাসী মানুষ এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রান্তিকতা ও তাদের অধিকারহীনতা; লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের অভিজ্ঞতা দারিদ্র্য ও বঞ্চনার এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভাগ-চাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ভোগ দখল স্বত্ব; নারীর ক্ষমতায়ন, জমি সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও এক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা; ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়; ভূমি প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা,

আইন ও নীতিমালা; দরিদ্র বিরোধী ও রেন্ট-সিকার সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমি আইন; কৃষি-ভূমি-জলা সংশ্লিষ্ট সমবায়; এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এসব আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বন্টনমূলক ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গ; এর নানা সম্ভাবনা, প্রভাব-অভিঘাত এবং সাম্প্রতিক কিছু হিসেবপত্তর। পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক খাস জমি-জলা, শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন ও আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমি, ভূমি মামলায় পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় রোধ; আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সংক্রান্ত নানা সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন অধ্যায়ে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি-উপমার যৌক্তিক ব্যবহার লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়; কখনো রুশো, লেনিন, এঙ্গেলস, এরিস্টটল আবার কোথাও বা রবীন্দ্রনাথ, জোনাথন সুইফট ও কার্ল মার্কস থেকে উদ্ধৃতি-উপমা তার আলোচনাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শেষ অধ্যায়ে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মকথা আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়াও সম্পৃক্ত হয়েছে সারণি, ছক, তত্ত্ব ও তথ্য উৎস। সবশেষে রয়েছে নির্ঘণ্ট।

গ্রন্থের ধারণাগত বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে 'কৃষি-ভূমি' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন এগ্রারিয়ান, ল্যান্ড এবং ওয়াটার; তার দৃষ্টিতে সংস্কার হলো 'রিফর্ম'; তার কাছে রাজনৈতিক অর্থনীতি শুধু ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির আধুনিক যুগের চাহিদা-যোগানের আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়। ভূমি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, কৃষি-অকৃষি জমি, জলা এবং জঙ্গল। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টিকে তিনি শ্রেণী-নিরপেক্ষ মনে করেননি, মনে করেছেন এটি 'শ্রেণী-স্বার্থীয়' বিষয়। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি তিনি দেখেছেন 'প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় অন্তঃস্থিত সামগ্রিক, সমষ্টিক ও সামূহিক অর্থে।'

লেখক বলেন :

> উন্নয়নশাস্ত্রের একাডেমিক সাহিত্য বিশেষত **রাজনৈতিক-অর্থনীতির** একাডেমিক সাহিত্যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার নিয়ে ১৯৭০ দশক অবধি অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। কিন্তু ১৯৭০-এর শেষ আর ১৯৮০-র সূচনালগ্নে বিশ্বায়নের প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়ল, আলোড়ন তুলল বিশ্বব্যাপী। বলা হলো, বিশ্বায়নই একমাত্র ব্যবস্থাপত্র; এদিকে একই সময়ে সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থায় দেখা দিলো ভাঙ্গন। **উত্থাপিত** হলো, পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অনুকূলে, নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনের স্বপক্ষে জোরাল যুক্তি। এর ফলে তখন থেকেই বলা চলে, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি একেবারেই 'ননইস্যু' অথবা গুরুত্বহীন ইস্যুতে পরিণত হলো।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির আলোচনায় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার নিয়ে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। এতে স্বীকার করা হয়েছে, আমাদের মতো দেশগুলোর উন্নয়নে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, অত্যাবশ্যকীয়। লেখকের অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, 'কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রশ্নটি প্রচলিত রাষ্ট্র, সরকার এবং তাদের বশংবদ সরকারী-

আধাসরকারী অর্থনীতিবিদ এবং মেহনতি মানুষের স্বার্থবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক বিজ্ঞানীদের কাছে পছন্দনীয় নয়।' তাঁর মতে, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার অর্থ, "একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রেণী বিশ্লেষণের গুরুত্ব অস্বীকার আর অন্যদিকে উন্নয়ন চিন্তার জগতে এক ধরনের আপোষ যার অন্তর্নিহিত অর্থ 'মহা বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি"।

এ প্রসঙ্গে বারকাতের স্বতঃপ্রবৃত্ত মন্তব্য:

> আমরা ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলাম। আর সে লক্ষ্যে চার স্তম্ভ বিশিষ্ট ১৯৭২ এর সংবিধানে অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের কথা বলেছিলাম যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে অন্যতম করণীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে কৃষি-বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু,আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চক্রান্তে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টো পথে পরিচালিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দুর্বৃত্তায়িত হয় অর্থনীতি, রাজনীতি সবই। গড়ে ওঠে অন্যের সম্পদ জোরদখলকারী, দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া শ্রেণি, মহাদুর্নীতিবাজ, মানুষের উপর অত্যাচারকারী, ফটকাবাজ গোষ্ঠী—এক কথায় যাদের নাম "রেন্ট-সিকার"। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি এরা সবসময় অস্বীকার এবং প্রতিহত করেছে।

লেখকের পর্যবেক্ষণে আরও ধরা পড়ে এক অবিনাশী সংকটের কালো ছায়া। তিনি বলেন:

> আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চক্রান্তে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার মাধ্যমে বিকৃত মুক্তবাজার অর্থনীতির শাখা প্রশাখা ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। সৃষ্টি হয় "রেন্ট-সিকার" গোষ্ঠী। যারা অন্যের সম্পদ জোর দখলকারী, দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি। লুটেরা, ফাও খাওয়া শ্রেণি-স্বার্থের জন্য সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতনকারী। এরা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না। ... এরা অন্যের সম্পদ বেদখল, জোর দখলকারী। রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতি এখন "রেন্ট-সিকার" গোষ্ঠীর অনুগত, অধীন ও দাস সত্তা বলা চলে।

বারকাত দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। গ্রন্থের প্রাক্-কথন পর্ব 'কৃতজ্ঞতা এবং ...'। প্রথম অধ্যায়ে তিনি বলেন:

> ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামের মানুষকে অতি কাছ থেকে দেখেছি। সহজ সরল নির্ভেজাল মানুষ। এরা বেশির ভাগই গরিব মানুষ। গ্রামের এসব মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের জায়গা দিয়েছিল— আগলে রেখেছিল—এসবের আমি প্রত্যক্ষদর্শী-সাক্ষী। এসবই আমার মনে স্থায়ী দাগ কাটে।

বলা যায়, এ থেকেই উৎসারিত তার কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার ভাবনা।

আলোচনায় বলা হয়েছে (২৭ জুলাই ২০১৬): বর্তমানে সারাদেশে খাস জমির পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯৫৭ একর। গ্রন্থকারের গবেষণা অনুযায়ী মোট খাসজমি-জলা ৫০ লক্ষ একর। সরকারী তথ্যে বলা হচ্ছে, চিহ্নিত ১২ লক্ষ একর জমির ৪৪ শতাংশ গরীব, ভূমিহীন ও দুঃস্থ

জনগণের মধ্য বণ্টন করা হয়েছে। প্রকৃত চিত্র হলো, খাস জমির ৮৮ শতাংশ ধনী ও প্রভাবশালীদের অবৈধ দখলে। ভূমিহীন গরীব মানুষ পেয়েছে মাত্র ১২ শতাংশ। এই একটি মাত্র তথ্য বাংলাদেশ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের পক্ষে বারকাতের যুক্তিকে জোরালো করার জন্য যথেষ্ট।

লেখকের দৃষ্টিতে, কৃষি সংস্কার হলো কৃষির সেই কাঠামোগত রূপান্তর যার ফলে উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশে কৃষির উৎপাদন সম্পর্ক পাল্টে যায়। এতে কৃষিতে শ্রেণী-সম্পর্ক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। ভূমি সংস্কার হলো ওই কৃষি সংস্কারের অন্যতম অনুষঙ্গ। প্রচলিত অর্থে, ভূমি সংস্কার হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারী মালিকানার খাস জলা-জমির বণ্টন-বন্দোবস্ত; বর্গাদারসহ অন্যের মালিকানাধীন জমি-জলাতে যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট নানান বিষয়।

কৃষি-জলা সংস্কারের অনুষঙ্গ হলো ভূমি মালিকানার পরিবর্তন, অনুপস্থিত জমি-জলা মালিকানা ব্যবস্থার সুরাহা, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি-জলা দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষিজীবী-জলাজীবীদের মধ্যে বণ্টন, সংশ্লিষ্ট আইন-কানুনের পরিবর্তন, বর্গা/ভাগ-চাষসহ কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের ভোগদখল স্বত্বের (টেন্যুরিয়েল সিস্টেম) পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর, ভূমি-জলাকেন্দ্রিক বিবাদ-মামলাজনিত অপচয় হ্রাস, রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন, প্রশাসন, ভূমি আইন, বাজার, মজুরি, পরিবেশ-বান্ধব কৃষি (টেকসই কৃষি), জমি-জলায় নারীর অধিকার উত্তরাধিকারসহ কৃষিতে নারী-শ্রমের স্বীকৃতি, ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি, প্রযুক্তি এবং উপকরণ খাতসমূহে পরিবর্তন, বিশ্বায়নের আওতায় কৃষিতে সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল। ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার রাজনৈতিক বিষয়। এ সংস্কারে আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর প্রসঙ্গটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিষয়টি আসলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক-বঞ্চিতদের নিরন্তর অন্তর্ভুক্তি কেন্দ্রিক।

প্রসঙ্গক্রমে লেখক গভীর প্রত্যয়ের সাথে বলেন: নারীর ক্ষমতায়ন, জমি-সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের বিষয়টি নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকসহ অন্যান্য যেকোনো মানদণ্ডেই মৌলিক এবং অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু, এ ক্ষমতায়ন ও অধিকারের পরিধি দেশের প্রচলিত আইনে সীমিত এবং বাস্তবে অনুপস্থিত। গ্রন্থকারের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, এ দেশের গ্রামাঞ্চলে মোট জমির মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ জমির কার্যকর মালিক নারী (যা বিভিন্ন ধর্ম ও নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে ২ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ)। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতি এ দেশে নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম অন্তরায়।

লেখক মনে করেন, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উন্নয়ন ও জীবন-সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের পথ। আমাদের দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারই বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হতে পারে। আলোচনায় বলা হয়েছে, যে জন-মানুষ জমি চাষ করেন (কৃষক), সম্পদ সৃষ্টি করেন (ফসল উৎপাদন করেন) তিনি ঐ জমির মালিক নন; যে জন-মানুষ জলায় শ্রম দিয়ে (জেলে) সম্পদ সৃষ্টি করেন (মাছ উৎপাদন করেন) তিনি ঐ জলার মালিক নন; আর যে জন-

মানুষ জঙ্গলে-বনে শ্রম দিয়ে (প্রধানত আদিবাসী মানুষ) সম্পদ সৃষ্টি করেন (বন সৃষ্টি ও সুরক্ষা করেন) তিনি ঐ বনের মালিক নন—এসবই বাংলাদেশের অনুন্নয়নের গোড়ার কথা।

লেখক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের পক্ষে অনেক মৌলিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। তবে কর্মকাণ্ডটি মূলত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও কমিটমেন্ট সংশ্লিষ্ট আর একই সাথে 'স্বদেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের' বিষয়। তাঁর দৃষ্টিতে, কৃষি-ভূমি-জলা উত্থিত এ দারিদ্র্য-বঞ্চনা নিরসনসহ দরিদ্র মানুষের জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সংস্কার অপরিহার্য।

দরিদ্রদের মধ্যে খাস জমি-জলা বণ্টন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষের ভূমি অধিকার খর্ব করা, ভূমির প্রতি নারীদের অধিকার হরণ, জলাতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ, ভূমি মামলায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়, জমি-জলায় বিভিন্ন ধরনের অন্যায্য ভোগদখল স্বত্ব, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক দুর্নীতি, ভূমি আইনের গণবিরোধী রূপ—এসবই এদেশে কৃষি সংস্কারের অন্যতম অমীমাংসিত বিষয়।

গবেষণায় প্রতিভাত হয়েছে, এদেশে বিগত ত্রিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) শ্রেণীকাঠামোর পরিবর্তন ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি করেছে। এ সময়ে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিম্ন-মধ্যবিত্তের স্তরে নেমে আসা। শুধু তাই নয়, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমে দরিদ্র হচ্ছে আর সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণীর মানুষের হাতে। এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার। তবে পুরো বিষয়টি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক।

গত চার দশকে এদেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ। আমাদের দেশে এখন কার্যত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দেশের মোট পরিবারের প্রায় ৬০ শতাংশ হলেও তাদের হাতে আছে মোট জমির মাত্র ৪.২ শতাংশ। গ্রামে ভূমি মালিকানাই নির্ধারণ করে ব্যক্তির অর্থনৈতিক-সামাজিক, মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিপ্রত্তির মাত্রা। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উন্নয়ন ও জীবন-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। এজন্য ভূমি-জলা-জঙ্গলে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের বিশেষ করে, আদিবাসী মানুষের মালিকানা এবং অভিগম্যতা প্রয়োজন।

ভূমি সংস্কার কৃষি সংস্কারের অন্যতম অনুষঙ্গ। ভূমি সংস্কার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারী মালিকানার খাস জলা-জমির বণ্টন-বন্দোবস্ত; বর্গাদারসহ অন্যের মালিকাধীন জমি-জলাতে যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়। আমাদের দেশে কৃষিতে বর্গাবাজার যথেষ্ট বিস্তৃত এবং এর বিস্তৃতি ক্রমশ বাড়ছে। সে কারণে ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ সব ধরনের ভোগদখল স্বত্বকে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রামীণ সমবায় নিয়ে ভাবনা জরুরি। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সম্পর্ক যথেষ্ট গভীর। কেননা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও সচেতন প্রয়োগ এ সংস্কারে এবং উৎপাদন ও আর বাড়াতে যথেষ্ট সহায়ক ও ফলপ্রসূ।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার একটি বহুমাত্রিক বিষয়। নৈতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক যেকোনো অর্থেই কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার প্রয়োজন, সম্ভব এবং জরুরী। পুরো বিষয়টি শ্রেণীস্বার্থ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সংস্কার আমাদের দেশের উন্নয়ন-প্রগতির অন্যতম প্রধান শর্ত।

আলোচ্য গ্রন্থে জনকল্যাণকামী একটি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির গবেষণাভিত্তিক একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি "রেন্ট-সিকার" নিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তবেষ্টিত কাঠমোতে আমাদের দেশে সবচেয়ে জটিল, পরস্পর সম্পর্কিত এবং অমীমাংসিত বিষয়। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে জনকল্যাণকামী কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই।

বাস্তবায়নযোগ্যতার আলোকে এ গ্রন্থে অগ্রাধিকারভিত্তিক কিছু প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়েছে। লেখকের দৃঢ় এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা, জনগণের সম্পৃক্ততায় একটি জাতীয় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে এগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব। তবে বিষয়টির সমাধান সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার, সদিচ্ছা, স্বীকৃতি, যোগ্যতা এবং দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগঠিত কর্মকাণ্ডের উপরেই নির্ভর করছে।

"শেষ কথায়" লেখক যৌক্তিক অর্থেই উচ্চারণ করেছেন:

> জমি, জলা, জঙ্গল আর জনমানুষ-এ চার সম্পদের কার্যকরী সম্মিলনই আসলে উন্নয়ন। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারই পারে এ দেশে দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক একীভূত উন্নয়ন সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে। এ সংস্কার সম্ভব। এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে দুটি বিষয়ের সম্মিলন প্রয়োজন: (১) গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানবকল্যাণকামী সাহসী নেতৃত্ব; এবং (২) সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণ। সমগ্র বিষয়টি মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনায় সমৃদ্ধ রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বিষয়।

এভাবেই, পুরো গ্রন্থে অপার যুক্তিবোধ ও স্বচ্ছ বিবেকের ছোঁয়ায় গড়ে তোলা হয়েছে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের সঠিক পদ্ধতির ভিত্তি। কৃষি-ভূমি-জলার সাথে আজন্মসম্পৃক্ত মানুষ, যেন এক-একটি পৃথিবী; তার অন্ত নেই, সীমা নেই। বারকাত তাদের নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, তুলে ধরেছেন অকৃপণভাবে তার এই অনন্য গবেষণায়। গ্রন্থের মনোরম প্রচ্ছদ বিশেষ ব্যঞ্জনাময়। সব মিলিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি কৃষি-ভূমি-জলার অধিকার বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষকে নিয়ে অসামান্য অন্বেষণসমৃদ্ধ এক দুর্লভ সমাজ-ইতিহাস। এ গ্রন্থ কৌতূহলী পাঠক-মনকে এক অনন্ত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

সুভাস কুমার সেনগুপ্ত*

* সিনিয়র রিসার্চ কনসালটেন্ট, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা